পৌরনীতি

দ্বিতীয় বর্ষ

কোর্স কোড : SSC 2606

সেকেন্ডারি স্কুল সার্টিফিকেট প্রোগ্রাম
(এসএসসি প্রোগ্রাম)

ওপেন স্কুল

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

পৌরনীতি

কোর্স কোড : SSC 2606

সেকেন্ডারি স্কুল সার্টিফিকেট প্রোগ্রাম
(এসএসসি প্রোগ্রাম)

রচনায়

ড. এস. এম. আনোয়ারা বেগম
চেয়ারম্যান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

তারিক হোসেন খান
প্রভাষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ওপেন স্কুল
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর

শারমিনা পারভিন
চেয়ারম্যান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
মোহাম্মদপুর কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, ঢাকা

এম. নজরুল ইসলাম
সহযোগী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
দনিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, দনিয়া, ঢাকা

সম্পাদনা

ড. খুরশীদা বেগম
অধ্যাপক, সরকার ও রাজনীতি বিভাগ
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা

কোর্স সমন্বয়কারী

তারিক হোসেন খান
প্রভাষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ওপেন স্কুল
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর

ওপেন স্কুল

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

পৌরনীতি

দ্বিতীয় বর্ষ
কোর্স কোড : SSC 2606
এসএসসি প্রোগ্রাম

প্রকাশ কাল : মার্চ ২০১১
পুন:মুদ্রণ : আগস্ট ২০১১

প্রকাশনায়
প্রকাশনা, মুদ্রণ ও বিতরণ বিভাগ
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
গাজীপুর-১৭০৫

প্রচ্ছদ
কাজী সাইফুদ্দীন আব্বাস

কভার গ্রাফিকস
আবদুল মালেক

কম্পিউটার কম্পোজ
মোঃ আশরাফুজ্জামান

© বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

ISBN 984-34-3109-X

মুদ্রণ
মৌসুমী অফসেট প্রেস
৩৮ বাংলা বাজার
ঢাকা-১১০০ ।

সূচীপত্র

বিষয়বস্তু **পৃষ্ঠা**

ইউনিট-১ : পৌরনীতির সংজ্ঞা ও বিষয়বস্তু ১

পাঠ-১ : পৌরনীতির সংজ্ঞা, আলোচ্য বিষয় ও পাঠের প্রয়োজনীয়তা ---------- ২

পাঠ-২ : পৌরনীতির সাথে ইতিহাস, অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞান ও নীতিশাস্ত্রের সম্পর্ক --- ৫

ইউনিট-২ : পরিবার ৯

পাঠ-১ : পরিবারের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য ----------১০

পাঠ-২ : পরিবারের প্রকারভেদ----------১২

পাঠ-৩ : পরিবারের কার্যাবলি ও গুরুত্ব----------১৪

ইউনিট-৩ : মানুষ ও পরিবেশ ১৬

পাঠ-১ : পরিবেশের সংজ্ঞা ও বিভিন্ন ধরন----------১৭

পাঠ-২ : মানুষের জীবনে পরিবেশের প্রভাব----------১৯

ইউনিট-৪ : মানুষ ও সমাজ ২০

পাঠ-১ : সমাজের সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য ও উদ্দেশ্য----------২১

পাঠ-২ : ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক----------২৪

পাঠ-৩ : সমাজে বসবাসের কারণ ও সমাজের বিবর্তন ----------২৬

পাঠ-৪ : সামাজিক পরিবর্তন----------২৯

ইউনিট-৫ : রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত মতবাদ ৩২

পাঠ-১ : ঐশ্বরিক মতবাদ ----------৩৩

পাঠ-২ : বল প্রয়োগ মতবাদ----------৩৬

পাঠ-৩ : সামাজিক চুক্তি মতবাদ----------৩৮

পাঠ-৪ : ঐতিহাসিক বা বিবর্তনমূলক মতবাদ----------৪১

ইউনিট-৬ : রাষ্ট্র ৪৪

পাঠ-১ : রাষ্ট্রের সংজ্ঞা ও উপাদান ----------৪৫

পাঠ-২ : রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী ----------৪৭

ইউনিট-৭ : নাগরিকতা ৫০

পাঠ–১ : নাগরিকতা ও নাগরিকতা অর্জনের পদ্ধতি ----------৫১

পাঠ-২ : নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য----------৫৪

পাঠ-৩ : সুনাগরিকের গুণাবলি ----------৫৯

পাঠ-৪ : দ্বৈত নাগরিকতা, নাগরিকতার বিলোপ এবং নাগরিক ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক -------৬১

ইউনিট-৮ : সরকার ৬৪

পাঠ-১ : সরকারের সংজ্ঞা, রাষ্ট্রের সাথে সরকারের সম্পর্ক ও সরকারের শ্রেণীবিভাগ --৬৫

পাঠ-২ : সংসদীয় ও রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার----------৬৮

পাঠ-৩ : এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ----------৭২

পাঠ-৪ : গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্র ----------৭৬

ইউনিট-৯ : সরকারের বিভিন্ন অঙ্গ ৮০
পাঠ-১ : আইন বিভাগ ও এর কার্যাবলি ----------৮১
পাঠ-২ : শাসন বিভাগ ও এর কার্যাবলি ----------৮৪
পাঠ-৩ : বিচার বিভাগের গঠন, কার্যাবলি এবং স্বাধীনতা ----------৮৬

ইউনিট-১০ : আইন, স্বাধীনতা ও সাম্য ৮৯
পাঠ-১ : আইনের সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য ও উৎস----------৯০
পাঠ-২ : আইন ও নৈতিকতা, আইন ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক ----------৯৪
পাঠ-৩ : আইন মান্য করার কারণ----------৯৭
পাঠ-৪ : স্বাধীনতার সংজ্ঞা ও প্রয়োজনীয়তা ----------৯৯
পাঠ-৫ : স্বাধীনতা ও সাম্যের সম্পর্ক ---------- ১০১

ইউনিট-১১ : সংবিধান ১০৩
পাঠ-১ : সংবিধানের সংজ্ঞা ও শ্রেণীবিভাগ---------- ১০৪
পাঠ-২ : সংবিধান প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি---------- ১০৭
পাঠ-৩ : উত্তম সংবিধানের বৈশিষ্ট্য ---------- ১০৯

ইউনিট-১২ : রাজনৈতিক দল ১১১
পাঠ-১ : রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য ---------- ১১২
পাঠ-২ : রাজনৈতিক দলের কার্যাবলী ---------- ১১৪
পাঠ-৩ : গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলের গুরুত্ব---------- ১১৬

ইউনিট-১৩ : জনমত ও নির্বাচন ১১৮
পাঠ ১ : জনমতের সংজ্ঞা ও বাহন ---------- ১১৯
পাঠ ২ : গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনমতের গুরুত্ব---------- ১২২
পাঠ ৩ : নির্বাচন ও এর প্রকারভেদ ---------- ১২৩
পাঠ ৪ : নির্বাচনে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা---------- ১২৫
পাঠ-৫ : সার্বজনীন ভোটাধিকার ও নির্বাচকমণ্ডলী---------- ১২৬

ইউনিট-১৪ : ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব ও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা ১২৮
পাঠ-১ : লাহোর প্রস্তাবের পটভূমি ও প্রস্তাবনা---------- ১২৯
পাঠ-২ : ১৯৪৭ সালের ভারতীয় স্বাধীনতা আইন ও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা---------- ১৩২

ইউনিট-১৫ : পাকিস্তানি শাসন, শোষণ এবং পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধিকার আন্দোলন ১৩৪
পাঠ-১ : পাকিস্তানি অপশাসন ও শোষণের বিভিন্ন পর্যায় এবং প্রক্রিয়া---------- ১৩৫
পাঠ-২ : ভাষা আন্দোলন ও এর তাৎপর্য ---------- ১৩৭
পাঠ-৩ : ১৯৫৪ সালের নির্বাচন, যুক্তফ্রন্ট গঠন ও এর তাৎপর্য ---------- ১৪০
পাঠ-৪ : বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৬ দফা, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ও ১৯৬৯ এর গণ-অভ্যুত্থান
পাঠ-৫ : মার্চের অসহযোগ আন্দোলন এবং একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধ---------- ১৪৮

ইউনিট-১৬ : বাংলাদেশের সংবিধান ১৫২
পাঠ-১ : বাংলাদেশের সংবিধান ও রাষ্ট্রীয় মূলনীতি ---------- ১৫৩
পাঠ-২ : বাংলাদেশ সংবিধানে মৌলিক অধিকার---------- ১৫৭
পাঠ-৩ : বাংলাদেশ সংবিধানে রাষ্ট্রীয় কাঠামো, সরকার ব্যবস্থা ও জাতীয় সংসদ------ ১৫৯
পাঠ-৪ : বাংলাদেশের সংবিধানের সংশোধনসমূহ---------- ১৬১

ইউনিট-১৭ : বাংলাদেশ ও বহির্বিশ্ব ১৬৪
পাঠ-১ : বাংলাদেশ ও সার্ক ---------- ১৬৫
পাঠ-২ : বাংলাদেশ ও মুসলিম বিশ্ব ---------- ১৬৭
পাঠ-৩ : বাংলাদেশ ও পূর্ব এশিয়া ---------- ১৬৯
পাঠ-৪ : বাংলাদেশ ও জাতিসংঘ ---------- ১৭০

ইউনিট-১৮ : বাংলাদেশের জনসংখ্যা সমস্যা ১৭২
পাঠ-১ : বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ ---------- ১৭৩
পাঠ-২ : জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে সৃষ্ট সমস্যা ---------- ১৭৭
পাঠ-৩ : জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের উপায় ---------- ১৮০

ইউনিট-১৯ : শিক্ষা ও মানবসম্পদ উন্নয়ন ১৮৩
পাঠ-১ : মানবসম্পদ : তত্ত্বীয় আলোচনা ---------- ১৮৪
পাঠ-২ : মানবসম্পদ উন্নয়নে শিক্ষার গুরুত্ব ---------- ১৮৭
পাঠ-৩ : বাংলাদেশের শিক্ষা সমস্যা ---------- ১৯০

ইউনিট-২০ : বেকারত্ব ও নিরক্ষরতা ১৯৩
পাঠ-১ : বাংলাদেশে বেকার সমস্যার কারণ ---------- ১৯৪
পাঠ-২ : বাংলাদেশে বেকারত্ব সমস্যা সমাধানের উপায়সমূহ ---------- ১৯৭
পাঠ-৩ : আত্মকর্মসংস্থান ও ক্ষুদ্র শিল্প ---------- ১৯৯
পাঠ-৪ : নিরক্ষরতাসৃষ্ট সমস্যা ---------- ২০২
পাঠ-৫ : নিরক্ষরতার কারণ ও নিরক্ষরতা দূরীকরণের উপায় ---------- ২০৪

ইউনিট-২১ : অপরাধ প্রবণতা : সন্ত্রাস, মাদকাসক্তি, দুর্নীতি ও কিশোর অপরাধ ২০৭
পাঠ-১ : অপরাধ প্রবণতার কারণ ---------- ২০৮
পাঠ-২ : অপরাধ প্রবণতা রোধে নাগরিক ও সরকারের দায়িত্ব ---------- ২১১
পাঠ-৩ : সন্ত্রাসের কারণ ও তা প্রতিকারের উপায় ---------- ২১৪
পাঠ-৪ : বাংলাদেশে মাদকাসক্তি ---------- ২১৭
পাঠ-৫ : বাংলাদেশে দুর্নীতি ---------- ২২০
পাঠ-৬ : বাংলাদেশে কিশোর অপরাধের কারণ ---------- ২২৩
পাঠ-৭ : কিশোর অপরাধ দূরীকরণের উপায় ---------- ২২৮

ইউনিট-২২ : দারিদ্র্য ও কৃষি সমস্যা ২৩১
পাঠ-১ : বাংলাদেশে দারিদ্র্যের কারণ ---------- ২৩২
পাঠ-২ : দারিদ্র্য নিরসনের উপায় ---------- ২৩৫
পাঠ-৩ : বাংলাদেশের কৃষি সমস্যা ---------- ২৩৮
পাঠ-৪ : কৃষির বহুমুখীকরণ ও সরকারি নীতি ---------- ২৪১
পাঠ-৫ : খাদ্যাভাব ও পুষ্টিহীনতা ---------- ২৪৩
পাঠ-৬ : খাদ্যাভাব ও পুষ্টিহীনতা দূর করার উপায় ---------- ২৪৫

ইউনিট ১

পৌরনীতির সংজ্ঞা ও বিষয়বস্তু

ভূমিকা

মানুষ সামাজিক জীব। তাই মানুষ নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করতে পারে না। মানুষের সভ্য জীবনযাপনের প্রয়োজনে গড়ে উঠেছে সমাজ, গোষ্ঠী, উপজাতি, জাতি ও নগররাষ্ট্রের। কালক্রমে নগররাষ্ট্রগুলো বিস্তার লাভ করে জাতীয় রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। ফলে পৌরনীতির আলোচনার ব্যাপকতা বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমান ইউনিটে নিম্নোক্ত পাঠগুলো আলোচনা করা হলো :

পাঠ-১ : পৌরনীতির সংজ্ঞা, আলোচ্য বিষয় ও পাঠের প্রয়োজনীয়তা।
পাঠ-২ : পৌরনীতির সাথে ইতিহাস, অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞান ও নীতিশাস্ত্রের সম্পর্ক।

পাঠ-১ ঃ পৌরনীতির সংজ্ঞা, আলোচ্য বিষয় ও পাঠের প্রয়োজনীয়তা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- পৌরনীতি বলতে কী বুঝায় তা বলতে পারবেন।
- পৌরনীতির বিষয়বস্তু বর্ণনা করতে পারবেন।
- পৌরনীতি কেন পাঠ করতে হবে তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

পৌরনীতির সংজ্ঞা

পৌরনীতি একটি সামাজিক বিজ্ঞান। পৌরনীতির ইংরেজি প্রতিশব্দ সিভিক্স (Civics) ল্যাটিন শব্দ সিভিস (Civis) ও সিভিটাস (Civitas) থেকে এসেছে। এদের অর্থ যথাক্রমে নাগরিক (Citizen) ও নগররাষ্ট্র (City State)। প্রাচীন গ্রিসে নাগরিক ও নগররাষ্ট্রকে কেন্দ্র করে নাগরিক জীবন আবর্তিত হত। তাই, পৌরনীতি বলতে সেই শাস্ত্রকে বোঝায় যা নাগরিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষের আচরণ ও কার্যাবলি নিয়ে আলোচনা করে। প্রখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী অধ্যাপক ই. এম. হোয়াইট (E.M.White) বলেন, "নাগরিকতার সাথে জড়িত সব প্রশ্ন নিয়ে যে শাস্ত্র আলোচনা করে, তাকে পৌরনীতি বলে।" তিনি আরও বলেন, "পৌরনীতি হল জ্ঞানের সেই মূল্যবান শাখা যা নাগরিকতার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এবং স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানবতার সঙ্গে জড়িত সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করে।"

বিশিষ্ট চিন্তাবিদ এফ. আই. গাউড (F. I. Glaud) বলেন, "মানুষ যে সব প্রতিষ্ঠান, অভ্যাস ও কার্যাবলির দ্বারা রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে এবং রাষ্ট্র প্রদত্ত অধিকার ভোগ করে, সে সব প্রতিষ্ঠান অভ্যাস ও কার্যাবলি নিয়ে যে শাস্ত্র আলোচনা করে তাকে পৌরনীতি বলে।" ড. বেনি প্রসাদ (Dr. Beni Prasad) পৌরনীতির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, "সামাজিক সম্পর্ক নির্ধারণ ও রক্ষার ক্ষেত্রে নাগরিকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হয়। এ সব দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারণে জ্ঞানের যে শাখা ভূমিকা পালন করে, তাই পৌরনীতি।"

অতএব নাগরিক, সমাজ ও রাষ্ট্রের আচরণ ও কার্যাবলি নিয়ে ধারাবাহিক আলোচনার মাধ্যমে যে শাস্ত্র আদর্শ নাগরিকতা এবং উন্নত ও অগ্রসর নাগরিক জীবন সম্বন্ধে জ্ঞান দান করে তাকে পৌরনীতি বলে।

পৌরনীতির অর্থ

পৌরনীতি নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান। নাগরিক হিসেবে মানুষের সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্রিয়া-কলাপই পৌরনীতির বিষয়বস্তু। ব্যাপক অর্থে, নাগরিকতার সঙ্গে জড়িত সব বিষয় নিয়ে পৌরনীতি আলোচনা করে। আর সংকীর্ণ অর্থে, নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য নিয়ে আলোচনা করাই পৌরনীতির মূল লক্ষ্য। কালক্রমে সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে পৌরনীতি নাগরিক জীবনকে কেন্দ্র করে বিকশিত হয়েছে। বর্তমান যুগে রাষ্ট্র ও সরকার শুধু শাসনই করে না, বরং সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি ভূমিকা পালন করে। প্রাচীন যুগে মানুষের জীবন ও পরিবার ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল কিন্তু যান্ত্রিক সভ্যতার যুগে মানুষের জীবন পরিবার, রাষ্ট্রের গণ্ডি অতিক্রম করে আন্তর্জাতিক রূপলাভ করেছে। কাজেই বর্তমান যুগে পৌরনীতি রাষ্ট্রের নাগরিক, নাগরিকতা ও আন্তর্জাতিক সংস্থার কার্যাদি সংক্রান্ত বিজ্ঞান।

পৌরনীতির বিষয়বস্তু, আলোচ্য বিষয়, পরিধি

আধুনিক যুগে পৌরনীতিকে রাষ্ট্রের নাগরিক, নাগরিকতা, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার রূপ ও কার্যাদির পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞান হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। কেননা নাগরিক হিসেবে মানুষের জীবন যতদূর বিস্তৃত পৌরনীতির বিষয়বস্তুও ততদূর প্রসারিত ।

নিম্নে পৌরনীতির বিষয়বস্তু আলোচনা করা হল :

- **নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য :** নাগরিকগণ রাষ্ট্র প্রদত্ত যে সব অধিকার ভোগ করে এবং রাষ্ট্র ও সামাজের প্রতি নাগরিকদের যে কর্তব্যবোধ তা আলোচনা ও বিশ্লেষণ করে থাকে পৌরনীতি ।
- **সামাজিক ও রাজনৈতিক মৌলিক প্রতিষ্ঠানাদি সম্পর্কে ধারণা :** বর্তমান যুগে নাগরিকের কর্মকাণ্ড কেবলমাত্র রাজনৈতিক কার্যাবলির মধ্যেই সীমিত নয়, বরং নাগরিক জীবনের সকল বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সর্ম্পকে পূর্ণাঙ্গ ধারণা দান করে ।
- **সমাজ ও রাষ্ট্র সম্পর্কে ধারণা :** যে কোনো নাগরিক স্থানীয় এলাকার সদস্য হিসেবে কতকগুলো সুযোগ-সুবিধা যেমন ভোগ করে তেমনি আবার কর্তব্য পালন করে । কর্তব্য পালনরত যে কোনো নাগরিক রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে বিভিন্ন কাজ-কর্মের গঠনমূলক সমালোচনা করে ।
- **নাগরিকতার স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয় :** নাগরিক জীবন কেবল স্থানীয় সংস্থাগুলোর সাথে জড়িত নয়, বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষে মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার জন্য উন্মুখ । এই ধারা অব্যাহত রাখার জন্য বিশ্বাসী একে অপরের সুখে-দুঃখে পাশে দাঁড়ান এবং এই জাতীয় চেতনায় অনুপ্রাণিত হয়ে বিশ্বশান্তি রক্ষা করেন ।
- **নাগরিকতার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ :** অতীত কার্যকলাপের গঠনমূলক সমালোচনার মাধ্যমে অতীতের সাথে বর্তমানের তুলনা করে, ভবিষ্যৎ নাগরিক জীবনের ইঙ্গিত দান করে । এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক ই. এম. হোয়াইট বলেন, পৌরনীতি মানুষের জ্ঞানভাণ্ডারের সেই মূল্যবোধগত শাখা, যা নাগরিকের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এবং স্থানীয় , জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানবতার ব্যাপক আলোচনায় মুখর ।

অতএব, বিশ্বের দরবারে নাগরিক জীবনের পরিচিতি প্রদানের আলোচনাও পৌরনীতির বিষয়বস্তু । জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত পৌরনীতির বিষয়বস্তু বিস্তৃত ।

পৌরনীতি পাঠের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

পৌরনীতি পাঠ ছাড়া কেউ নাগরিক দায়িত্ব সম্পর্কে যথার্থ অবগত হতে পারে না । দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করতে হলে পৌরনীতি অধ্যয়ন করা অবশ্যই কর্তব্য । নিম্নে পৌরনীতি পাঠের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করা হল :

- **অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ :** পৌারনীতি পাঠের মাধ্যমে নাগরিকগণ তাদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে পারে । পাশাপাশি এ সব অধিকার ভোগের মধ্যে কী কী কর্তব্য পালন করতে হবে সে সম্পর্কেও অবহিত হতে পারে ।
- **উত্তম নাগরিকতা অর্জন :** আদর্শ নাগরিক রাষ্ট্রের মূলধন । জনগণকে সচেতন ও উত্তম নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার ব্যাপারে পৌরনীতি শিক্ষার বিকল্প নেই । আদর্শ রাষ্ট্র গড়ে তুলতে হলে আদর্শ নাগরিক গড়ে তুলতে হবে । রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এরিস্টটল (Aristotle) বলেছেন, "সব ভালো মানুষ ভালো নাগরিক নয় কিন্তু সব ভালো নাগরিকই ভালো মানুষ ।" সুতরাং ভালো নাগরিক গড়ার জন্য পৌরনীতি অধ্যয়ন করা অপরিহার্য ।
- **মৌলিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন :** রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে জ্ঞান না থাকলে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাতে অংশগ্রহণ করা যায় না । রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করে নাগরিকগণ অংশগ্রহণের দায়িত্ব অনুধাবন করতে পারে ।
- **গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের বিকাশ :** পৌরনীতি অধ্যয়নের মাধ্যমে নাগরিকগণ গণতান্ত্রিক রীতিনীতি ও গণতন্ত্রকে অর্থবহ করার শিক্ষালাভ করে । গণতান্ত্রিক সরকারের সফলতা নির্ভর করে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ওপর । গণতন্ত্রের ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য প্রত্যেক নাগরিককে সচেতন থাকা উচিত ।
- **স্থানীয়, জাতীয়, আন্তর্জাতিক নাগরিকতার শিক্ষালাভ :** একজন নাগরিক শুধু তার পরিবারের সদস্যই নয়, সে বিশ্ব পরিমণ্ডলে আন্তর্জাতিক সংস্থারও সদস্য । কাজেই একজন নাগরিক যদি দায়িত্বশীল ভূমিকা

পালন করতে পারে তবে তার ভূমিকা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে প্রতিষ্ঠিত হবে। স্থানীয় সংস্থা থেকে শুরু করে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অংশগ্রহণের মাধ্যমে মানুষ রাষ্ট্র ও বিশ্বকে গড়ে তোলে। কাজেই বিশ্ব গঠনের প্রক্রিয়া পৌরনীতি শিক্ষার মাধ্যমেই অর্জন করা সম্ভব।

- **উদারতা ও সহনশীলতার শিক্ষাদান :** পৌরনীতি সংকীর্ণ মনোভাব দূরীভূত করে উদার মনোভাব পোষণের শিক্ষাদান করে।

অতএব, উত্তম জীবন যাপনের জন্য পৌরনীতি পাঠ করা কর্তব্য। তাই বার্নাডস বলেন, "পৌরনীতির শিক্ষাই সভ্যতার একমাত্র রক্ষকবচ।"

সারসংক্ষেপ

পৌরনীতি নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান । এই শাস্ত্র নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য নিয়ে আলোচনা করে। পৌরনীতি নাগরিকের স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক এবং নাগরিকতার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সবকিছু নিয়ে আলোচনা করে।

পৌরনীতি অধ্যয়নের মাধ্যমে নাগরিকরা সুনাগরিকতার গুণাবলি অর্জন করতে সক্ষম হয়। পৌরনীতি পাঠের মাধ্যমে তারা দেশরক্ষা ও দেশের সার্বভৌমত্বকে সুসংহত করার শিক্ষা অর্জন করে। জাতীয় দায়িত্ব ও আদর্শ সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করতে হলে নাগরিকদের জন্য পৌরনীতি পাঠ জরুরি ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

(ক) নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। পৌরনীতি কী বিষয়ক বিজ্ঞান?

(ক) সমাজ বিষয়ক (খ) নাগরিকতা বিষয়ক

(গ) ধর্ম বিষয়ক (ঘ) সংস্কৃতি বিষয়ক

২। Civis ও Civitas শব্দ দুটি কোন ভাষা থেকে এসেছে?

(ক) গ্রিক (খ) ল্যাটিন

(গ) ইংরেজি (ঘ) আরবি

৩। পৌরনীতি অধ্যয়ন করলে নাগরিকবৃন্দ কী কী গুণাবলি অর্জন করতে পারে?

(ক) সুশিক্ষা (খ) কর্তব্য নিষ্ঠা

(গ) সচেতন দৃষ্টিভঙ্গি (ঘ) উপরোক্ত সবক'টি

৪। নাগরিকতার সাথে জড়িত সব প্রশ্ন নিয়ে যে শাস্ত্র আলোচনা করে, তাকে পৌরনীতি বলে। উক্তিটি কার?

(ক) এরিস্টটল (খ) ই. এম. হোয়াইট

(গ) এফ. আই. গাউড (ঘ) ম্যাকাইভার

(খ) রচনামূলক প্রশ্ন

১। পৌরনীতির সংজ্ঞা দাও। পৌরনীতির বিষয়বস্তু আলোচনা কর।

২। পৌরনীতি বলতে কী বোঝ? পৌরনীতি পাঠের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর।

(ক) উত্তরমালা

১। (খ), ২। (খ) ৩। (ঘ), ৪। (খ)।

পাঠ-২: পৌরনীতির সাথে ইতিহাস, অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞান ও নীতিশাস্ত্রের সম্পর্ক

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- পৌরনীতির সাথে ইতিহাসের সম্পর্ক কী তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- পৌরনীতি ও অর্থনীতির মধ্যকার সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- পৌরনীতি ও সমাজবিজ্ঞানের মধ্যে কী সম্পর্ক আছে তার বিবরণ দিতে পারবেন।
- পৌরনীতির সাথে নীতিশাস্ত্রের সম্পর্ক লিখতে পারবেন।

(ক) পৌরনীতি ও ইতিহাস

ইতিহাস মানব জাতির জীবনব্যবস্থার দর্পণ। কেননা নাগরিকতার অতীত দিকগুলো ইতিহাসের পাতায় উজ্জ্বল অক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকে। পৌরনীতি ও ইতিহাসের সম্পর্ক নিম্নরূপ :

- **পৌরনীতি ইতিহাসের দ্বারা জাগ্রত :** পৌরনীতি ইতিহাসের পাতা থেকে রাজা বাদশাদের শাসন সম্পর্কে অবগত হতে পারে। এ প্রসঙ্গে লর্ড এ্যাকটন (Lord Acton) বলেন, "ইতিহাসের স্রোতধারায় বালুকা রাশির মধ্যে স্বর্ণরেনুর মত রাজনীতি বিজ্ঞান সঞ্চিত হয়ে উঠেছে।"
- **পৌরনীতির আলোচনা ইতিহাস দ্বারা পরিপূর্ণ :** অতীতের তথ্য সংগ্রহ করে পৌরনীতি ভবিষ্যৎ নাগরিক জীবনের ইঙ্গিত দান করে। অগাস্ট কোঁতে বলেন, "জীবিতরা মৃতদের দ্বারাই সবচেয়ে বেশি পরিচালিত।"
- **ইতিহাস পৌরনীতি দ্বারা সমৃদ্ধ :** চলমান ঘটনাবলি দ্বারা ইতিহাস সৃষ্ট হয়। ব্রিটেনের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাস অতীতের পৌরনীতি ছাড়া আর কিছুই নয়। অধ্যাপক সিলি (Selly) বলেন, "ইতিহাস ছাড়া রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভিত্তি নেই, আর রাষ্ট্রবিজ্ঞান ছাড়া ইতিহাসের কোনো মূল্য নেই।"

পৌরনীতি ও ইতিহাসের পার্থক্য আছে। নিম্নে পৌরনীতি ও ইতিহাসের পার্থক্য আলোচনা করা হলো :

- ইতিহাসের বিষয়বস্তু ব্যাপক কিন্তু পৌরনীতির বিষয়বস্তু সংকীর্ণ।
- ইতিহাস অতীত নিয়ে ব্যস্ত কিন্তু পৌরনীতি অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করে।
- ইতিহাস মানুষের সব দিক নিয়ে আলোচনা করে কিন্তু পৌরনীতি মানুষের নাগরিক জীবন বিষয়ে আলোচনা করে।

পৌরনীতি ও ইতিহাসের সম্পর্ক পরস্পরের পরিধি দ্বারা আবদ্ধ।

(খ) পৌরনীতি ও অর্থনীতির সম্পর্ক

পৌরনীতি ও অর্থনীতির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। সুনাগরিক সৃষ্টির মাধ্যমে রাষ্ট্রের কল্যাণ সাধন এর উদ্দেশ্য। রাষ্ট্রীয় সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে নাগরিকদের সেবা প্রদান করাই অর্থনীতির উদ্দেশ্য। পৌরনীতি ও অর্থনীতির সম্পর্ক নিম্নরূপ :

- **উভয়ের উদ্দেশ্য একই :** মানবকল্যাণ সাধন করা উভয় বিষয়ের প্রধান উদ্দেশ্য। সুনাগরিক অর্থনীতি শিক্ষার মাধ্যমে অসীম অভাবকে সসীম সম্পদ দ্বারা পূরণ করে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধনে প্রয়াসী হয়।
- **পারস্পরিক ঘনিষ্ঠতা :** অর্থনৈতিক জ্ঞান ব্যতীত রাজনৈতিক জীবনে পূর্ণতা আসে না। আবার রাজনৈতিক জ্ঞান ছাড়া অর্থনৈতিক জীবন বিকশিত হয় না।
- **সমন্বয় সাধন :** নাগরিকদের অধিকারগুলো অর্থনীতির সঙ্গে জড়িত। তাই ম্যাকাইভার বলেন, "সব শাসন পদ্ধতি তার অনুরূপ সম্পত্তি ব্যবস্থার রূপ পরিগ্রহ করে, একটিকে পরিবর্তন করলে অপরটিরও পরিবর্তন সাধিত হয়।"
- **ইতিহাসের স্রোতধারা :** জমিদারি প্রথার ফলে সৃষ্টি হয় সামন্ততান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা, শিল্প বিপ্লবের ফলে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা, মালিক-শ্রমিকের অর্থনৈতিক বৈষম্যই সৃষ্টি করে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা।

পৌরনীতি ও অর্থনীতির সম্পর্ক থাকলেও এদের মধ্যে পার্থক্য আছে–

- পৌরনীতি নাগরিকতা বিষয়ক সব দিক আলোচনা করে, অর্থনীতি মানবজীবনের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ আলোচনা করে।
- পৌরনীতির অনুশীলন পদ্ধতি ঐতিহাসিক, অর্থনীতির অনুশীলন পদ্ধতি গাণিতিক।
- পৌরনীতির বিষয়বস্তু সুনির্দিষ্ট কিন্তু অর্থনীতির বিষয়বস্তু জাগতিক।
- পৌরনীতি নাগরিককে প্রাধান্য দেয়, অর্থনীতি অর্থকে অধিক গুরুত্ব প্রদান করে।

(গ) পৌরনীতি ও সমাজবিজ্ঞানের সম্পর্ক

পৌরনীতি ও সমাজবিজ্ঞান : পৌরনীতি ও সমাজবিজ্ঞান অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। কেননা পৌরনীতি সমাজে বসবাসকারী নাগরিকদের নিয়ে আলোচনা করে। আর সমাজবিজ্ঞান সমাজের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করে। পৌরনীতি ও সমাজবিজ্ঞানের সম্পর্ক নিম্নরূপ :

- **পৌরনীতি সমাজবিজ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল :** পৌরনীতির মূল বিষয়বস্তু হল নাগরিক। সমাজের উৎপত্তি, বিকাশ ও ক্রমবিবর্তন সম্পর্কে ধারণা না থাকলে পৌরনীতির স্বরূপ উপলব্ধি করা যায় না। সমাজে বসবাসকারী মানুষের অতীত দিকগুলো পরিবর্তনের ফসল হিসেবে আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। ফলে সমাজবিজ্ঞানের সাহায্য ছাড়া পৌরনীতির আলোচনা পরিপূর্ণতা লাভ করে না।
- **পৌরনীতি সমাজবিজ্ঞানের অংশ :** পৌরনীতি সমাজবিজ্ঞানের একটি অংশমাত্র আর সমাজবিজ্ঞান সমাজের সামগ্রিক বিষয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত।
- **সমাজবিজ্ঞান পৌরনীতির দ্বারা প্রভাবিত :** পৌরনীতিকে সমাজবিজ্ঞান থেকে পৃথক করা যায় না। সামাজিক পরিবেশ দ্বারা রাজনৈতিক পরিবেশ বিকশিত ও প্রভাবিত হয়। রাজনৈতিক পরিবেশ বলতে সমাজকেই বোঝায় আর রাজনৈতিক ধ্যান ধারণা সামাজিক পরিবেশের দ্বারাই প্রভাবিত হয়। তাই গিডিংস ও মরগ্যান (Giddings and Morgan) বলেন, সমাজবিজ্ঞানের বিষয়গুলো রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সাহায্য ছাড়া আলোচনা করা সম্ভব নয়।" সামাজিক প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি রাষ্ট্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও প্রভাবিত।

পৌরনীতি ও সমাজবিজ্ঞানের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকলেও পার্থক্য যথেষ্ট রয়েছে। তা নিম্ন আলোচনা করা হলো :

- পৌরনীতির পরিধি সংক্ষিপ্ত কিন্তু সমাজবিজ্ঞানের পরিধি ব্যাপক।
- পৌরনীতি নাগরিকতা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করে, আর সমাজবিজ্ঞান সমাজের সঙ্গে জড়িত সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করে।

- পৌরনীতি মানুষকে রাজনৈতিক জীব হিসেবে ব্যাখ্যা করে আর সমাজবিজ্ঞান মানুষের সামাজিক জীবে পরিণত হওয়া সম্পর্কে আলোচনা করে ।

(ঘ) পৌরনীতির সঙ্গে নীতিশাস্ত্রের সম্পর্ক

পৌরনীতি ও নীতিশাস্ত্রের মধ্যে গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান । পৌরনীতির বিষয়গুলো নীতিবোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত । অন্যদিকে মানুষের আচার-আচরণের, ভাল-মন্দের আলোচনাই হল নীতিশাস্ত্র । উভয় বিষয় সামাজিক ন্যায়-অন্যায়ের মানদণ্ডকে সমর্থন করে । পৌরনীতি ও নীতিশাস্ত্রের সম্পর্ক নিম্নরূপ :

- **পৌরনীতি ও নীতিশাস্ত্রের সম্পর্ক অবিচ্ছিন্ন** : সর্বজন স্বীকৃত নৈতিক আদর্শই রাষ্ট্রীয় সংগঠনের আইনে পরিণত হয় । দেশের প্রচলিত আইন নৈতিকতা বিরোধী হলে তা অকেজো হয়ে যায় । কেননা কোনো রাষ্ট্রীয় আইন জনগণের নৈতিক মানদণ্ডের বিরোধী হলে তার বিরুদ্ধে গণআন্দোলনের আশঙ্কা থাকে । তাই প্লেটো (Plato) তাঁর 'রিপাবলিক' গ্রন্থে বলেছেন, "শাসক যদি ন্যায়বান হন তাহলে আইন নিস্প্রয়োজন আর শাসক যদি দুর্নীতিপরায়ণ হন তাহলে আইন নিরর্থক ।"
- **পৌরনীতি ও নীতিশাস্ত্র পরস্পর পরিপূরক** : পৌরনীতি ও নীতিশাস্ত্রের উদ্দেশ্য হল আদর্শ মানব সমাজ প্রতিষ্ঠা করা । নীতিশাস্ত্র যেমন চিন্তার বিশুদ্ধ ও আচরণের পবিত্রতা বিচার করে তেমনি পৌরনীতি মানুষের বাহ্যিক আচার-আচরণের বিশ্লেষণ করে ন্যায়পথে চলার প্রেরণা যোগায় । নাগরিক জীবনকে সুন্দর ও সুষমামণ্ডিত করার জন্য নীতিশাস্ত্র ভালো কিছু গ্রহণ করার মানসিকতা সৃষ্টি করে উন্নত নাগরিক সৃষ্টি করার শিক্ষা দিয়ে থাকে । কারণ সামাজিক জীবনে বুদ্ধি, বিবেক, আত্মসংযম লোপ পেলে অন্যায় ও দুঃশাসনে দেশ ভরে যাবে ।

পৌরনীতি ও নীতি শাস্ত্রের গভীর মিল থাকলেও পার্থক্য রয়েছে । নিম্নে তা আলোচনা করা হলো :

- পৌরনীতি মানুষের বাহ্যিক আচরণ নিয়ে আলোচনা করে আর নীতিশাস্ত্র বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উভয় দিকের আচরণ নিয়ে আলোচনা করে ।
- পৌরনীতির পরিধি সংকীর্ণ কিন্তু নীতিশাস্ত্রের পরিধি ব্যাপক ।
- পৌরনীতি মানুষকে রাজনৈতিক জীব ও নাগরিক হিসেবে বিবেচনা করে কিন্তু নীতিশাস্ত্র মানুষকে মানুষ হিসেবেই বিবেচনা করে ।
- পৌরনীতির নীতিসমূহ মান্য করা বাধ্যতামূলক কিন্তু নীতিশাস্ত্রের নির্দেশ অবশ্যই পালনীয় নয় ।

তবে উভয় বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও এই দুই শাস্ত্র পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ।

সারসংক্ষেপ

ইতিহাস মানুষের অতীতের সামগ্রিক জীবন দর্পণ । আর পৌরনীতি রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে মানুষকে বিশ্লেষণ করে ইতিহাসের সহায়তায় । পৌরনীতি একজন নাগরিককে সুনাগরিকের গুণাবলি অর্জনের মাধ্যমে উন্নত রাষ্ট্রীয় জীবনযাপনের পথ নির্দেশনা দেয় । আর অর্থনীতি নাগরিককে আয়-ব্যয়ের সঠিক পদ্ধতি শিক্ষা দিয়ে উন্নত জীবন যাপনে সহায়তা করে ।

পৌরনীতি সমাজবিজ্ঞানের একটি অংশমাত্র । সমাজবিজ্ঞান সামাজিক জীব হিসেবে মানুষকে বিশ্লেষণ করে । কিন্তু রাজনৈতিক সংগঠন ব্যতীত মানুষের পূর্ণতা লাভ হয় না ।

পৌরনীতি আলোচনা করে মানুষের বাহ্যিক দিক আর নীতিশাস্ত্র আলোচনা করে মানুষের নৈতিক দিক । তবে উভয় শাস্ত্রের মূল লক্ষ্য মানুষকে ন্যায়নীতি ভিত্তিক সামাজিক জীবনের দিক নির্দেশনা দেয়া ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

(ক) নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। ইতিহাস কী বিষয় নিয়ে আলোচনা করে?

(ক) রাষ্ট্র ও নাগরিক (খ) নাগরিকদের ভবিষ্যৎ

(গ) মানুষের অতীত কর্মকাণ্ড (ঘ) মানুষের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ

২। পৌরনীতি ও অর্থনীতি উভয়েই কোন বিজ্ঞানের অংশ?

(ক) সামাজিক বিজ্ঞান (খ) জীববিজ্ঞান

(গ) সমরবিজ্ঞান (ঘ) উপরের সবকটি

৩। এরিস্টটল মানুষের সম্পর্কে কী মন্তব্য করেছেন?

(ক) মানুষ সামাজিক জীব (খ) মানুষ সামাজিক ও রাজনৈতিক জীব

(গ) মানুষ রাজনৈতিক জীব (ঘ) মানুষ অর্থনৈতিক জীব

৪। নীতিশাস্ত্রের মূল বিষয় কী?

(ক) অর্থনৈতিক বিষয় (খ) রাজনৈতিক বিষয়

(গ) সামাজিক বিষয় (ঘ) মূল্যবোধ ও ন্যায়নীতি সংক্রান্ত বিষয়

(খ) রচনামূলক প্রশ্ন

১। পৌরনীতির সাথে ইতিহাস ও অর্থনীতির সম্পর্ক আলোচনা করুন।

২। পৌরনীতির সাথে সমাজবিজ্ঞান ও নীতিশাস্ত্রের সম্পর্ক আলোচনা করুন।

(ক) উত্তরমালা

১। (গ), ২। (ক), ৩। (খ), ৪। (ঘ)।

ইউনিট ২

পরিবার

ভূমিকা

পরিবার হল আদিম সামাজিক প্রতিষ্ঠান। সমাজের এ প্রতিষ্ঠানের মূল ভিত্তি হল বৈবাহিক বন্ধন ও রক্তের সম্পর্ক। পরিবার গঠনপূর্বক নারী-পুরুষ সন্তান-সন্ততি জন্মদান করে। স্নেহ, মায়া-মমতার বেড়াজাল পরিবারেই সৃষ্টি হয়। বর্তমান ইউনিটে নিম্নোক্ত পাঠগুলো আলোচনা করা হলো :

পাঠ-১ : পরিবারের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য।
পাঠ-২ : পরিবারের প্রকারভেদ।
পাঠ-৩ : পরিবারের কার্যাবলি ও গুরুত্ব।

পাঠ-১ : পরিবারের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- পরিবার কী সে সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন ।
- পরিবারের বৈশিষ্ট্যসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন ।

পরিবারের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য

পরিবার বলতে মানুষের সেই সংগঠনকে বোঝায় যেখানে বৈবাহিক সম্পর্কের ভিত্তিতে এক বা একাধিক পুরুষ ও মহিলা তাদের সন্তানাদি, পিতা-মাতা ও অন্যান্য পরিজনদের নিয়ে একত্রে বসবাস করে । ম্যাকাইভার বলেন, "দৈহিক সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করে সন্তান-সন্ততির জন্মদান ও লালন-পালনের উদ্দেশ্যে যে সংগঠন গড়ে ওঠে তাই পরিবার ।" রডম্যান বলেন, "পরিবার সমাজের সেই ক্ষুদ্র একক যা বিবাহ প্রথার মাধ্যমে নারী পুরুষকে একত্রিত করে ও সন্তান-সন্ততির জন্মদান ও লালন-পালনের মাধ্যমে তাদের ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথ নির্দেশ প্রদান করে ।" এই প্রসঙ্গে নিমকফ বলেন, "পরিবার হল স্বামী-স্ত্রীর একটি স্থায়ী সংগঠন যেখানে সন্তান-সন্ততি থাকতেও পারে, নাও পারে ।"

সুতরাং পরিবার হল স্নেহ, মায়া, মমতার বন্ধনে আবদ্ধ একটি চিরন্তন প্রতিষ্ঠান ।

পরিবারের বৈশিষ্ট্য

অধ্যাপক ম্যাকাইভারের সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে আমরা পরিবারের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য দেখতে পাই :

- **পরিবার একটি ক্ষুদ্র বর্গ :** বিবাহের মাধ্যমে নারী-পুরুষ পরিবারের সৃষ্টি করে ।
- **জৈবিক সম্পর্ক :** নারী-পুরুষ সম্পর্ক বৈবাহিক বন্ধনের উপর প্রতিষ্ঠিত ।
- **রক্ত ও আত্মীয়তার সম্পর্ক :** রক্তের বন্ধন দ্বারা পরিবারের ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয় ।
- **নৈতিক মূল্যবোধ :** স্নেহ, মায়া, মমতা শ্রদ্ধার বন্ধনে আবদ্ধ মানুষের সঙ্গ প্রিয়তার অভিব্যক্তিই হল পরিবার ।
- **বয়োজ্যেষ্ঠের প্রাধান্য :** পরিবারে উপার্জনক্ষম বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তির প্রাধান্য থাকে ।
- **নামকরণ :** পরিবার একটি পদবি দ্বারা পরিচিত । যেমন- কাজী, পাল, ঘোষ ।
- **সামাজিক একক :** পরিবার বিস্তার লাভ করে সামাজিক সংগঠনের জন্ম দিয়েছে ।
- **চিরন্তন :** আবহমান কাল থেকে পরিবার চলে আসছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে ।
- **মানব সভ্যতার আলোকবর্তিকা :** পরিবারে সদস্যদের আচার-আচরণ, শৃঙ্খলাবোধ, রুচিবোধ, সুস্থ চিন্তার মানসিকতা সৃষ্টিতে সহায়তা করে মানবসভ্যতার ভিত্তিকে মজবুত করে ।
- **মায়া-মমতা ও অনুরাগের আশ্রয়স্থল :** মানবিক উপাদানসমূহ যেমন- ভালোবাসা, অনুরাগ ইত্যাদি মানুষ এ উপাদানের ছোঁয়া পরিবার থেকে পেতে পারে ।

সারসংক্ষেপ

পরিবার ক্ষুদ্রতম সামাজিক প্রতিষ্ঠান বা বিবাহ প্রথার উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। স্বামী-স্ত্রী ও তাদের সন্তান সন্ততিরাই মূলত পরিবারের সদস্য। রক্তের সম্পর্ক পরিবারের ভিত্তি। রক্তের বন্ধনের কারণেই পরিবারের সদস্যরা একে অপরের প্রয়োজনে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। উর্পাজনকারী বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি পরিবারের কর্তা। তার নির্দেশ পরিবারের সকল সদস্য মান্য করে চলে। পরিবার তার প্রতিটি সদস্যকে পারিবারিক আদর্শ, নৈতিকতা, মূল্যবোধ, সহযোগিতা, সহমর্মিতা প্রভৃতি শিক্ষা দেয়। পরিবার শাশ্বত ও চিরন্তন প্রতিষ্ঠান। আদি যুগ থেকে পরিবার টিকে আছে ও থাকবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

(ক) শূন্যস্থান পূরণ করুন

১। পরিবার ক্ষুদ্রতম –– একক।

২। –– প্রথার উপর ভিত্তি করে পরিবার গড়ে উঠেছে।

৩। পরিবারের মূল্য ভিত্তি ––– সম্পর্ক।

৪। পরিবার তার সদস্যদের ––– ও –– শিক্ষা দিয়ে থাকে।

৫। পরিবার তার সদস্যদের চিহ্নিত করে ভিন্ন ভিন্ন –– দিয়ে।

(খ) সংক্ষেপে উত্তর দিন

১। পরিবার কি?

২। পরিবার তার সদস্যদের কি কি বিষয় শিক্ষা দেয়?

৩। পরিবারের সদস্য কারা?

৪। পরিবার মানব সভ্যতার সূতিকাগার– কথাটির অর্থ কি?

(গ) রচনামূলক প্রশ্ন

১। পরিবার কী ? পরিবারের বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করুন।

উত্তরমালা

(ক) ১। সামাজিক, ২। বিবাহ, ৩। রক্ত, ৪। সহযোগিতা, সহমর্মিতা, ৫। নাম।

পাঠ-২ : পরিবারের প্রকারভেদ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- পরিবারের প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারবেন ।
- পিতৃতান্ত্রিক পরিবার ও মাতৃতান্ত্রিক পরিবার কী তা বলতে পারবেন ।
- একপত্নীক, বহুপত্নীক ও বহুপতি পরিবারের ব্যাপারে বিবরণ দিতে পারবেন ।
- একক পরিবার ও যৌথ পরিবার সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন ।

পরিবারের প্রকারভেদ

তিনটি মূলসূত্রের ওপর ভিত্তি করে পরিবারের শ্রেণীবিভাগ করা হয় । যথা : ১. বংশ পরিচয় । ২. বৈবাহিক প্রথা । ৩. পারিবারিক কাঠামো প্রথা ।

নিম্নে ছকের সাহায্যে পরিবারের শ্রেণীবিভাগ দেখানো হল :

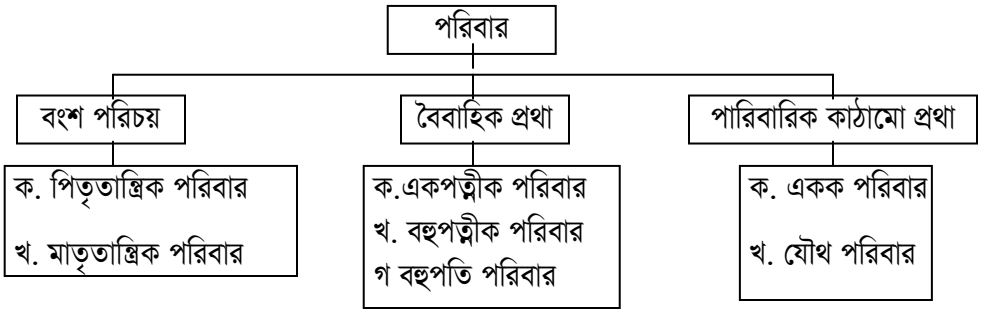

১) **বংশ পরিচয় :** প্রাচীন যুগে বংশ পরিচয়ের ভিত্তিতে পরিবারকে দুই ভাগে ভাগ করা হয় । যথা–

(ক) **পিতৃতান্ত্রিক পরিবার :** যে পরিবারে পিতা প্রধান থাকে তাকে পিতৃতান্ত্রিক পরিবার বলে । তাই হেনরী মেইনের মতে, "পিতৃতান্ত্রিক পরিবারই আদিম পরিবার ।"

(খ) **মাতৃতান্ত্রিক পরিবার :** যে পরিবারে মাতা প্রধান থাকেন বা মাতার দিক থেকে বংশ পরিচয় দেওয়া হয় তখন তাকে মাতৃতান্ত্রিক পরিবার বলে ।

২) **বৈবাহিক প্রথা :** বিবাহ প্রথার ওপর ভিত্তি করে পরিবারকে তিন ভাগে ভাগ করা হয় । যথা :

(ক) **একপত্নীক পরিবার** : যদি একজন পুরুষ একজন স্ত্রী গ্রহণ করে পরিবার গঠন করে, তবে তাকে একপত্নীক পরিবার বলে ।

(খ) **বহুপত্নীক পরিবার** : যখন একজন পুরুষ একাধিক স্ত্রী বিবাহ করে পরিবার গঠন করে, তখন তাকে বহুপত্নীক পরিবার বলে ।

(গ) **বহুপতি পরিবার** : যখন একজন স্ত্রী একের অধিক স্বামী গ্রহণ করে পরিবার গঠন করে তখন তাকে বহুপতি পরিবার বলে ।

৩) **পারিবারিক কাঠামো প্রথা :** পারিবারিক কাঠামোর ওপর ভিত্তি করে পরিবারকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয় । যথা:–

(ক) **একক পরিবার :** যখন একজন স্বামী ও একজন স্ত্রী তাদের ওপর নির্ভরশীল- সন্তান-সন্ততি নিয়ে পরিবার গঠন করে তখন তাকে একক পরিবার বলে একক পরিবার ছোট পরিবার ।

(খ) **যৌথ পরিবার :** যে পরিবারে দাদা-দাদি, বাবা-মা, চাচা-চাচি, ভাই-বোন, ছেলে-মেয়ে ও অন্যান্যরা একসঙ্গে বসবাস করে, তাকে যৌথ পরিবার বলে ।

সারসংক্ষেপ

তিনটি সূত্রকে কেন্দ্রকরে পরিবারের শ্রেণীবিভাগ করা হয় । বংশ পরিচয়, বিবাহ প্রথা, পারিবারিক কাঠামোকে ভিত্তি করে পরিবারকে ভাগ করা হয়েছে । পরিবারের নিয়ন্ত্রণ কার হাতে থাকবে এই প্রশ্নকে সামনে রেখে পিতৃতান্ত্রিক ও মাতৃতান্ত্রিক পরিবার গঠিত হয়েছে । সদস্য সংখ্যাকে কেন্দ্র করে পরিবারকে একক ও যৌথ পরিবার এই দুভাগে ভাগ করা হয়েছে । যে ধরনের পরিবারই হোকনা কেন, পরিবার আদিম ও শাশ্বত প্রতিষ্ঠান । পরিবারের কাজের ধরন প্রতিটি ক্ষেত্রে একই ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

(ক) নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১ । কয়টি সূত্রকে কেন্দ্র করে পরিবারের শ্রেণীবিভাগ করা হয়?

(ক) চারটি (খ) পাঁচটি (গ) তিনটি (ঘ) ছয়টি

২ । পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের নিয়ন্ত্রণ থাকে কার হাতে?

(ক) বয়োজ্যৈষ্ঠ ব্যক্তির (খ) বয়োজ্যেষ্ঠ মহিলার (গ) পিতার (ঘ) মাতার

৩ । একক ও যৌথ পরিবারের শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে কোন বিষয়কে কেন্দ্র করে?

(ক) বিবাহ প্রথা (খ) স্বামী বা স্ত্রীর সংখ্যা (গ) আকৃতি ও কাঠামো (ঘ) ক্ষমতা ও কর্তৃত্বকে কেন্দ্র করে

(খ) সংক্ষেপে উত্তর দিন ।

১ । পিতৃতান্ত্রিক ও মাতৃতান্ত্রিক পরিবার কি?

২ । একপত্নীক পরিবার, বহুপত্নীক পরিবার ও বহুপতিপরিবার বলতে কি বোঝায়?

৩ । একক ও যৌথ পরিবার কিভাবে গঠিত হয়?

(ক) উত্তর মালা

১ । (গ), ২ । (গ), ৩ । (গ)

পাঠ-৩ : পরিবারের কার্যাবলি ও গুরুত্ব

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- পরিবারের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন ।
- পরিবারের কাজ কী তা বর্ণনা করতে পারবেন ।
- পরিবারের বিলুপ্তির সম্ভাবনা কতটুকু তা বলতে পারবেন ।

পরিবারের কার্যাবলি ও গুরুত্ব

পরিবারের কার্যাবলি : মানুষের বহুমুখী মৌলিক প্রয়োজন মিটিয়ে সুখী ও নিরাপদ জীবন ব্যবস্থা গঠনের জন্য পরিবারকে বহুবিধ কাজ করতে হয় । পরিবারের কাজগুলো নিম্নরূপ :

১ । **জৈবিক কার্যাবলি :** নারী-পুরুষ সম্পর্কের শৃঙ্খলাপূর্ণ ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনে মানব সমাজে পরিবার প্রথার উদ্ভব ঘটেছে । সন্তান-সন্ততির জন্মদান ও লালন-পালন করাই জৈবিক কার্যাবলির অন্তর্ভুক্ত ।

২ । **শিক্ষামূলক কার্যাবলি :** সন্তান-সন্ততি প্রথমে যে পরিবার থেকে শিক্ষাগ্রহণ করে তার ওপরই তার জীবন সৌধ গড়ে ওঠে । কেননা একটা শিশুকে যেভাবে নাচানো হয় তেমনি নাচে । এই প্রসঙ্গে মেকেনজি বলেন, "পরিবার নাগরিকের বৃহত্তর জীবনের আদর্শ শিক্ষাকেন্দ্র ।" তাই বলা যায়, পরিবারই হল সভ্যতার দোলনা ও সামাজিক গুণাবলির কেন্দ্র ।

৩ । **অর্থনৈতিক কার্যাবলি :** অতীত সমাজব্যস্থায় পরিবারই ছিল অর্থনৈতিক আয়ের প্রধান উৎস । কিন্তু যান্ত্রিক সভ্যতার অগ্রগতির ফলে সীমিত আয় দ্বারা আর্থিক ব্যয় নির্বাহ করা সম্ভব হয় না । তাই বর্তমানে পরিবারকে স্বচ্ছলভাবে পরিচালনার জন্য পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা রীতিসিদ্ধভাবে যে যে ভাবে পারে সে ভাবেই অর্থ উপার্জন করে থাকে ।

৪ । **রাজনৈতিক কার্যাবলি :** শিশুরা পারিবারিক ঐতিহ্য ও অভ্যাস হতে নিয়মানুবর্তিতার শিক্ষালাভ করে । নাগরিক জীবনে রাষ্ট্র ও আইনের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের ক্ষেত্রে এর প্রতিফলন ঘটে ।

৫ । **অবকাশমূলক কার্যাবলি :** সারাদিন সাংসারিক প্রয়োজনের তাগিদে কাজ করে মানুষ ঘরে ফিরে পরিবারের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করে ।

৬ । **মনস্তাত্ত্বিক কার্যাবলি :** পরিবারই জীবন যন্ত্রণা উপশমের অন্যতম প্রধান কেন্দ্রস্থল । এখানে পরিবারের সকল সদস্য স্নেহ, প্রেম-প্রীতি, ভালোবাসা, সুখ-দুঃখ ইত্যাদির বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে একে অপরের পাশে দাঁড়ায় । সভ্যতার বিকাশে পরিবারের কার্যাবলি কমে গেলেও গুরুত্ব কমেনি । মানব ইতিহাসে সভ্যতা যতদিন থাকবে ততদিন পর্যন্ত পরিবার আপন মহিমায় ভাস্কর হয়ে থাকবে ।

পরিবারের গুরুত্ব

পরিবার একটি চিরন্তন ও আদিম সামাজিক প্রতিষ্ঠান । বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রসারের ফলে পরিবারের কর্মক্ষেত্রের ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে । ফলে যৌথ পরিবার ভেঙ্গে একক পরিবারে পরিণত হচ্ছে । তাই বলে পরিবার ভেঙ্গে পড়ছে না ।

স্নেহ, মায়া-মমতা, ভালোবাসা, সহানুভূতির বেড়াজাল প্রভৃতি মানসিক বৃত্তিগুলো পরিবারকে টিকিয়ে রেখেছে । বাস্তবে মানুষের মৌলিক প্রয়োজনের তাগিদে (অন্ন, বস্ত্র, খাদ্য, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা) পরিবারের সৃষ্টি হয়েছে ।

এসব মৌলিক প্রয়োজন যেমন কোনো দিনই শেষ হবে না, তেমনি পরিবারের কোনো দিন বিলুপ্তি হবে না ।

সারসংক্ষেপ

পরিবার তার সদস্যদের সুখী ও সুন্দর জীবন গড়ে তোলার লক্ষে বিভিন্ন ধরনের কার্য সম্পাদন করে থাকে । বর্তমান যান্ত্রিক সভ্যতার যুগে পরিবারের কাজ কমে গেলেও ব্যক্তির জীবন গঠনে পরিবারের ভূমিকা অপরিসীম । স্নেহ, মায়া-মমতা, ভালোবাসা, প্রেম-প্রীতি, উদারতা, সহনশীলতা– এসব মানবিক ও সুকুমার বৃত্তিগুলো পরিবারই তার সদস্যদের শিক্ষা দিয়ে থাকে । বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রযাত্রায় শংকিত হয়ে আশঙ্কা করছেন যে, পরিবার হয়ত বিলুপ্তির পথে । কিন্তু মানুষের রুচিবোধ, শৃঙ্খলাবোধ ও আবেগ যতদিন থাকবে ততদিন পরিবার থাকবে ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

(ক) শূন্যস্থান পূরণ করুন

১ । পরিবার ––– ধরনের কাজ করে থাকে ।

২ । মানুষ পরিবারে ––– করে, লালিত হয় এবং ––– করে ।

৩ । পরিবারকে সন্তান ––– ও ––– প্রতিষ্ঠান বলা হয় ।

৪ । পরিবার তার সদস্যদের ––– ও ––– স্থল ।

৫ । –– ও ––– রাজনীতির প্রথম পাঠ শিশু শিক্ষা লাভ করে পরিবারেই ।

(খ) সংক্ষেপে উত্তর দিন

১ । পরিবারের সামাজিক ও রাজনৈতিক কাজগুলো কি কি?

২ । পরিবারের অবকাশযাপন ও চিত্তবিনোদনমূলক কাজ এবং আস্তাত্বিক কাজগুলো আলোচনা করুন ।

৩ । পরিবারের গুরুত্ব বর্ণনা করুন ।

(গ) রচনামূলক প্রশ্ন

১ । পরিবারের কার্যাবলিসমূহ আলোচনা করুন ।

(ক) উত্তরমালা

১ । ছয় ২ । জন্মগ্রহণ, মৃত্যুবরণ, ৩ । উৎপাদক, লালনকারী, ৪ । খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয়, ৫ । নির্দেশ, আনুগত্য ।

ইউনিট ৩

মানুষ ও পরিবেশ

ভূমিকা

পরিবেশ প্রকৃতির দান, যা মানবসভ্যতা বিকাশে সহায়তা করে। যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানবজীবন লালিত-পালিত ও বিকশিত হয় তাকে পরিবেশ বলে। মানুষের জীবনযাত্রা ও আচার-আচরণ পরিবেশের দ্বারা প্রভাবিত হয়। তবে স্থান, কাল, পাত্রভেদে মানব জীবনে পরিবেশের প্রভাব বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। বর্তমান ইউনিটে নিম্নোক্ত পাঠগুলো আলোচনা করা হলো :

পাঠ-১ : পরিবেশের সংজ্ঞা ও বিভিন্ন ধরন।
পাঠ-২ : মানুষের জীবনে পরিবেশের প্রভাব।

পাঠ-১ : পরিবেশের সংজ্ঞা ও বিভিন্ন ধরন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- পরিবেশ কী বলতে পারবেন ।
- বিভিন্ন ধরনের পরিবেশ সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন ।

পরিবেশের সংজ্ঞা : পরিবেশ বলতে পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে বোঝায় । আমাদের চারপাশে যা আমরা দেখি এবং যার প্রভাবে প্রভাবিত হই তাকে পরিবেশ বলে । তাই ম্যাকাইভার বলেন, "জীবন ও পরিবেশ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত ।" মার্সটিন বেটস পরিবেশের সংজ্ঞা দিয়ে বলেন, "পরিবেশ হলো সে সব বাহ্যিক অবস্থার সমষ্টি যা জীবনের বিকাশকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে ।" বস্তুত মানুষের জীবন বিকাশের জন্য যা কিছু প্রয়োজন তার সমুদয়ের একটি বাহ্যিক পারস্পরিক রূপ ও অবস্থাকে পরিবেশ বলে ।

পরিবেশের প্রকারভেদ : সভ্যতা ও সামাজিক ব্যবস্থার বিভিন্নতায় পরিবেশ বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে । নিম্নে ছকের মাধ্যমে পরিবেশের প্রকারভেদ দেখান হলো :

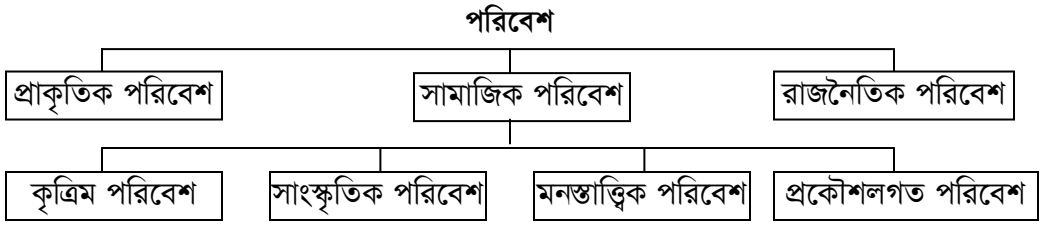

১. **প্রাকৃতিক বা ভৌগোলিক পরিবেশ :** প্রাকৃতিক পরিবেশ বলতে আমাদের চারপার্শের ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ু, পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী, সাগর- মহাসাগর, বন বা জঙ্গল, বৃষ্টিপাত ইত্যাদি সবকিছুর মিলিত বাহ্যিক, রূপকে বোঝায় । প্রাকৃতিক পরিবেশ প্রকৃতির দান । এটা মানুষের সৃষ্টি নয় । প্রাকৃতিক পরিবেশের ওপর মানুষের কোনো হাত নেই ।

২. **সামাজিক পরিবেশ :** মানুষ জীবন বিকাশের তাগিদে রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক , ধর্মীয়, যোগাযোগ, অর্থনৈতিক ইত্যাদি বিষয়ে মানুষ যে পারিপার্শ্বিক সম্পর্ক ও সংগঠন রচনা করে থাকে তাকে সামাজিক পরিবেশ বলে । যেমন- ক্লাব, সমিতি, রাস্তাঘাট, ঘরবাড়ি । সামাজিক পরিবেশকে চার ভাগে ভাগ করা যায় । যথা–

ক) কৃত্রিম পরিবেশ : মানুষ ব্যক্তিগত ও যৌথ প্রচেষ্টার দ্বারা যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সৃষ্টি করে তাকে কৃত্রিম পরিবেশ বলে । যেমন- পার্ক, নদীর ওপর সেতু, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ ইত্যাদি ।

খ) সাংস্কৃতিক পরিবেশ : সাংস্কৃতিক পবিবেশ বলতে মানুষের বিশ্বাস, আচার-অনুষ্ঠান, সাহিত্যচর্চা ও মানবিক বিকাশের যে পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিরাজ করে তাকে বোঝায় । যেমন– নাচ, গান, নাটক, সিনেমা ইত্যাদি ।

গ) মনস্তাত্ত্বিক পরিবেশ : মানুষের দৈহিক ও মানসিক প্রবণতাকে কাম্যপথে পরিচালনার জন্য পূর্ব অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের মাধ্যমে মানুষ যে পরিবেশ সৃষ্টি করে তাকে মনস্তাত্ত্বিক পরিবেশ বলে । মনস্তাত্ত্বিক পরিবেশ যে কোনো সমস্যা সমাধানে মানুষকে অতীতের ঘটনাবলির প্রতি আকৃষ্ট করে তোলে ও লালিত বিশ্বাস দ্বারা ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণে উৎসাহিত করে । যেমন– মানসিক রোগীর জন্য হাসপাতাল, শিশুদের জন্য কিন্ডারগার্ডেন ইত্যাদি ।

ঘ) প্রকৌশলগত পরিবেশ : প্রকৌশলগত পরিবেশ বলতে যান্ত্রিক সভ্যতার পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে বোঝায়। যান্ত্রিক সভ্যতার উন্নতির ফলে, শিল্প বিপ্লবের ব্যাপক প্রসার, প্রভৃতির কারণে বড় বড় শিল্প কারখানা স্থাপিত হওয়ার দরুন শিল্পনগরী গড়ে উঠেছে। ফলে গ্রামের মানুষ অর্থ উপার্জনের জন্য শহরের দিকে ধাবিত হচ্ছে। শহরের প্রান্তে গড়ে উঠেছে বস্তি এলাকা।

৩. **রাজনৈতিক পরিবেশ :** শাসনব্যবস্থার কেন্দ্রীয় স্তর থেকে দেশের তৃণমূল পর্যন্ত যে প্রশাসনিক কাঠামো বিদ্যমান তার সাথে নাগরিকবৃন্দের সম্পর্কের ব্যবস্থাকে রাজনৈতিক পরিবেশ বলা হয়। রাজনৈতিক পরিবেশ হলো রাষ্ট্রীয় জীবন ব্যবস্থার ধরন ও অংশগ্রহণের মাত্রার সামগ্রিক অবস্থা। যেমন– রাজতন্ত্র, স্বৈরতন্ত্র ও গণতন্ত্র।

বস্তুত রাষ্ট্রীয় পরিমণ্ডলে বিভিন্ন পরিবেশের মধ্যে যতই পার্থক্য থাকুক না কেন, প্রকৃতপক্ষে পরিবেশের প্রভাব মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবন প্রবাহিত করে।

পরিবেশের গুরুত্ব

মানবজীবনে পরিবেশের গুরুত্ব অপরিসীম। মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যুপর্যন্ত প্রতিটি দিককে প্রভাবিত করে তার পরিবেশ। সামাজিক অনুকূল পরিবেশে মানুষ তার মনমানসিকতা, আচার-আচরণ, চিন্তা-চেতনার বিকাশ ঘটায়। অসুস্থ পারিবারিক পরিবেশ ব্যক্তিকে নেতিবাচক মনমানসিকতা তৈরিতে সহায়তা করে।

সুতরাং একজন মানুষকে পরিশ্রমী, সংযমী, দায়িত্বশীল, সহানুভূতিশীল করে গড়ে তুলতে পারে তার পরিবেশ।

সারসংক্ষেপ

একজন মানুষ ভবিষ্যতে কেমন হবে তা নির্ভর করে তার পরিবেশের ওপর। প্রাকৃতিক পরিবেশের ওপর মানুষের কোন হাত নেই। তবে সামাজিক পরিবেশকে মানুষ মেধা ও সৃজনশীল আদরে পরিবর্তন করতে পারে। সুস্থ পরিবেশ যে কোন ব্যক্তিকে সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

(ক) নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। পরিবেশ প্রভাবিত করে ব্যক্তির কোন দিকটি?

(ক) মন-মানসিকতা (খ) অভিলাষ-উচ্চাকাঙ্ক্ষা (গ) কর্মপ্রচেষ্টা ও উদ্যম (ঘ) উপরোক্ত সবকটি

২। উন্নত পরিবেশ মানুষকে কি দেয়?

(ক) উন্নত জীবনবোধ (খ) অসুস্থ জীবন (গ) হতাশা (ঘ) উপরোক্ত সবকটি

৩। পরিবেশ কত ধরনের হয়?

(ক) এক ধরনের (খ) দুই ধরনের (গ) তিন ধরনের (ঘ) চার ধরনের

৪। নিজ প্রয়োজনে মানুষ কোন পরিবেশ সৃষ্টি করে?

(ক) মনস্তাত্ত্বিক (খ) সাংস্কৃতিক (গ) কৃত্রিম (ঘ) প্রাকৃতিক।

(খ) রচনামূলক প্রশ্ন

১। পরিবেশের সংজ্ঞা দিন। মানবজীবনে পরিবেশের গুরুত্ব বর্ণনা করুন।

২। পরিবেশ কত ধরনের ও কি কি? বিভিন্ন ধরনের পরিবেশ সম্পর্কে আলোচনা করুন।

(ক) উত্তরমালা

১।(ঘ) ২।(ক) ৩।(খ) ৪।(গ)

পাঠ-২ ঃ মানুষের জীবনে পরিবেশের প্রভাব

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- মানুষের জীবনে পরিবেশের প্রভাব সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন ।

মানবজীবনে পরিবেশের প্রভাব

মানবজীবন পরিবেশের মধ্যে বিকাশিত হয় ও পরিবেশের ওপর ভিত্তি করেই পূর্ণতা লাভ করে । এজন্য ব্যক্তি জীবনের ওপর পরিবেশের প্রভাব গভীর ও সুদূর প্রসারী । পরিবেশ ব্যক্তির গুণাবলি বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে । পিতা-মাতা, পাড়া-প্রতিবেশী ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে মায়া-মমতা, ভালোবাসা, ব্যক্তিত্ব ইত্যাদি মানবিক গুণাবলি ব্যক্তি লাভ করে থাকে যা স্বাভাবিক জীবনের জন্য অপরিহার্য । যে ব্যক্তি উন্নত পরিবেশে বসবাস করে তার মানসিকতাও উন্নত । মানুষ নোংরা ও কলুষিত পরিবেশে বসবাস করলে হীন-মন্যতায় ভোগে । উপযুক্ত পরিবেশ ব্যতীত উপযুক্ত শিক্ষা সম্ভব নয় । শিক্ষা মানুষকে বিকাশিত ও প্রস্ফুটিত করে প্রকৃত মানুষে পরিণত করে । মানবিক গুণাবলিসম্পন্ন মানুষ তৈরি করতে পারলে জনকল্যাণকর রাষ্ট্র গড়ে তোলা সম্ভব । তাড়াছা সুস্থ দেহ ও মনের অধিকারী নাগরিকরাই জাতির প্রকৃত সম্পদ । কলুষিত পরিবেশ দেহ ও মনের বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করে । সমাজে নিরাপত্তার অভাবে মানুষ কল্যাণমূলক কোনো কাজে আত্মনিয়োগ করতে পারে না বলে সমাজে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা বিরাজ করে । নিরাপত্তার নিশ্চয়তা মানুষের জীবনে বয়ে আনে অনাবিল শান্তি ।

কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে সভ্যতা যাচাইয়ের মাপকাঠি হিসেবে বিবেচনা করা হয় । সুস্থ পরিবেশ ব্যতীত সাংস্কৃতিক প্রগতি ও উৎকর্ষসাধন মোটেই সম্ভব নয় । পরিবেশের সবকিছুর ছাপই ব্যক্তির চরিত্রে প্রভাব ফেলে । তাই উষ্ণ অঞ্চলের লোকজন রুক্ষ হয় ও শীতপ্রধান অঞ্চলের লোকজন কর্মঠ হয়ে থাকে । এই প্রসঙ্গে মন্টেসকু বলেন, "গণতন্ত্রের বিকাশের জন্য উপযোগী স্থান নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল ।"

উন্নত ও নির্মল পরিবেশ চরিত্রবান ও আদর্শ মানুষ তৈরি করে । মানুষের জীবন প্রণালী, দৈহিক গঠন, ব্যক্তির আচার-আচরণ ইত্যাদি পরিবেশের প্রত্যক্ষ প্রভাবের ফল ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

(ক) নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১ । মানব জীবনে পরিবেশের প্রভাব কতটুকু?
(ক) অত্যন্ত বেশি (খ) বেশি (গ) কম (ঘ) অত্যন্ত কম

২ । সভ্যতার বিকাশে ভৌগোলিক পরিবেশের অবদানের কথা কে বলেছেন?
(ক) মন্টেসকু (খ) হিরোডোটাস (গ) এরিস্টটল (ঘ) জে. বি. ওয়াটসন

৩ । গণতন্ত্রের বিকাশের জন্যে উপযোগী এলাকা কোনটি?
(ক) শীত প্রধান অঞ্চল (খ) পার্বত্য অঞ্চল (গ) নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল (ঘ) উষ্ণ অঞ্চল

৪ । সামাজিক পরিবেশ কিভাবে মানব গোষ্ঠীকে সাহায্য করে?
(ক) সুখী ও সমৃদ্ধ পরিবার গঠনে সহায়তা করে (খ) শিক্ষা ক্ষেত্রের প্রসার ঘটিয়ে
(গ) জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন করে (ঘ) উপরের সবকটির মাধ্যমে

(খ) রচনামূলক প্রশ্ন

১ । মানুষের জীবনে পরিবেশের প্রভাব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করুন ।

(ক) উত্তরমালা

১ । (ক) ২ । (খ) ৩ । (গ) ৪ । (ঘ) ।

ইউনিট ৪

মানুষ ও সমাজ

ভূমিকা

মানুষ সামাজিক জীব। একাকী সে বাস করতে পারে না। সমাসবদ্ধ হয়ে বাস করা তার জন্মগত স্বভাব। মানুরে সমাজবদ্ধতার বড় কারণ পারস্পরিক সহযোগিতা। এককভাবে কোন মানুষই তার সমস্ত চাহিদা পূরণ করতে পারে না। বিভিন্নমুখী চাহিদার জন্য মানুষ একে অপরের উপর নির্ভরশীল। সহযোগিতা ছাড়াও মানুষ তার সুকুমার বৃত্তিগুলোর বিকাশের জন্যও সমাজে বসবাস করে। এরিস্টটল বলেছেন, "মানুষ স্বভাবতই সামাজিক জীব। যে সমাজে বাস করে না, সে হয় পশু না হয় দেবতা।" ব্যক্তিকে আপন মহিমায় বিকশিত হতে সমাজের কোন বিকল্প নেই। বর্তমান ইউনিটে নিম্নোক্ত পাঠগুলো আলোচনা করা হলো :

পাঠ-১ : সমাজের সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য ও উদ্দেশ্য।
পাঠ-২ : ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক।
পাঠ-৩ : সমাজে বসবাসের কারণ ও সমাজের বিবর্তন।
পাঠ-৪ : সামাজিক পরিবর্তন।

পাঠ-১ : সমাজের সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য ও উদ্দেশ্য

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- সমাজ বলতে কি বুঝায় তা বলতে পারবেন ।
- সমাজের বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করতে পারবেন ।
- সমাজ গঠনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন ।

সমাজের সংজ্ঞা

একদল মানুষ যখন কোনো সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য একত্রিত ও সংঘবদ্ধ হয়ে বসবাস করে তখন তাকে সমাজ বলে । অন্যভাবে বলা যায়, পরস্পর নির্ভরশীল হয়ে গড়ে ওঠা জনসমষ্টিকে সমাজ (Society) বলে ।

সমাজবিজ্ঞানী গিডিংস (Giddings) বলেন, 'সমাজ বলতে আমরা সেই জনসাধারণকে বুঝি যারা সংঘবদ্ধভাবে কোনো সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মিলিত হয়েছে ।' (Society is a number of like-minded individuals who know and enjoy their like-mindedness and are therefore able to work together for common ends.)

অধ্যাপক আর.এম. ম্যাকাইভার (Maciver) বলেন, 'আমাদের সামাজিক সম্পর্কে জটিল জালই সমাজ ।' (Society is the system of social relationships in and through which we live).

সমাজবিজ্ঞানী কিম্বল ইয়ং (Kimbal Young) এর মতে, 'সমাজ হলো সামাজিক সম্পর্কের নিয়ন্ত্রণে ব্যক্তিবর্গের সাধারণ পরিচিত । (Society is the general term for persons living in social relations.)

অতএব, যখন কতিপয় লোক তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, ধ্যান-ধারণা বাস্তবায়ন ও নিজের প্রয়োজন মেটানোর তাগিদে একত্রিত হয় ও একটি সংঘবদ্ধ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সুস্পষ্ট আবাসস্থল গড়ে তোলে তখন তাকে সমাজ বলে ।

সমাজের বৈশিষ্ট্য

সমাজের সংজ্ঞা ব্যাখ্যা করলে সমাজের নিম্নলিখিত সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলো লক্ষ্য করা যায় –

(১) ঐক্য– ঐক্য সমাজের প্রধান বৈশিষ্ট্য । অভ্যাস, মনোভাব, চাওয়া-পাওয়া ও আদর্শগত ঐক্যের ভিত্তিতে সমাজ গড়ে ওঠে ।

(২) স্থায়িত্ব– সমাজ একটি স্থায়ী বর্গ । তার অর্থ এই নয় যে, সমাজের পরিবর্তন হবে না । সমাজের চিন্তা-ভাবনা, অগ্রগতি, শিক্ষাদীক্ষা ও বিজ্ঞানের অবদানের কারণে সমাজের পরিবর্তন ঘটে । সমাজের পরিবর্তন ঘটলেও সমাজের স্থিতিশীলতা নষ্ট হয় না ।

(৩) সাধারণ উদ্দেশ্য– অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা, নিরাপত্তা, বাসস্থানের নিশ্চয়তা প্রভৃতি সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মানুষ সমাজবদ্ধ হয় ।

(৪) ভৌগোলিক সীমারেখা– সমাজের সাথে ভূখণ্ডের সম্পর্ক না থাকলেও একটি সমাজকে আর একটি সমাজ থেকে ভৌগোলিক সীমারেখার দ্বারাই পৃথক করা যায় । তবে কোন কোন সমাজ সারা পৃথিবী জুড়ে বিরাজমান ।

(৫) গ্রুপের সমষ্টি– সমাজ কতকগুলো দল বা গ্রুপের সমষ্টি এবং এই গ্রুপগুলো জনসাধারণের মৌলিক সামাজিক চাহিদা পূরণ করে। যেমন– কৃষক, শ্রমিক, ব্যবসায়ী প্রভৃতি।

(৬) বৈচিত্র্য– সমাজ বিচিত্র রূপের একটি মানবিক সংগঠন। সমাজে হাসি-কান্না, ঐক্য-অনৈক্য, বিরোধিতা-সহযোগিতা, অবহেলা-সহমর্মিতা সবকিছুই বিদ্যমান। ব্যাপক মানবিক সম্পর্কের বৈচিত্র্যময় রূপ হলো সমাজ।

(৭) নৈতিক মূল্যবোধ– সমাজের ভিত্তি হচ্ছে নৈতিক মূল্যবোধ। সমাজ কতকগুলো নীতিমালা মেনে চলে এবং নীতিগুলো সমাজকে ধরে রাখে। যেমন– নিষ্ঠা, সততা, সহমর্মিতা, সহযোগিতা প্রভৃতি।

সমাজ গঠনের উদ্দেশ্য

সমাজ বহুবিধ উদ্দেশ্য সাধন করে। মানুষের সামগ্রিক কল্যাণই হলো সমাজের উদ্দেশ্য। নিচে সমাজের উদ্দেশ্যগুলো আলোচনা করা হলো :

(১) মৌলিক চাহিদা পূরণ করা– সমাজ অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা ও বাসস্থানের নিশ্চয়তা বিধান করে। সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে গড়ে উঠা ব্যাপক ও বিপুল কর্মক্ষেত্রে কাজ করে মানুষ তাদের মৌলিক চাহিদা পূরণ করে।

(২) নিরাপত্তা প্রদান করা– নিরাপত্তা লাভের জন্যই মানুষ সমাজবদ্ধ হয়। সমাজবদ্ধ হয়ে মানুষ পরাক্রমশালীদের আক্রমণ প্রতিহত করে নিজেদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে।

(৩) ব্যক্তিত্বের বিকাশ– সমাজ মানুষের অন্তর্নিহিত গুণাবলির বিকাশ সাধনের প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণ করে ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটায়।

(৪) মানবিক গুণাবলির বিকাশ সাধন– মানুষের সুকুমার বৃত্তিগুলো সমাজের মধ্যে লালিত ও অনুশীলত হয়। দয়া, মায়া, স্নেহ, ভালোবাসা, শ্রদ্ধা, সমঝোতা, সহনশীলতা ও একে অপরকে বিপদে সাহায্য করা প্রভৃতি মানবিক গুণাবলি সমাজবদ্ধ জীবনেই বিকশিত হয়। অন্যদিকে এসব গুণাবলিই সমাজের ভিত্তি।

(৫) মনের সংকীর্ণতা দূর করে– সমাজ মানুষকে ব্যক্তিস্বার্থের সাথে সামগ্রিক সমন্বয় সাধন করতে শেখায়। সমাজের স্বার্থে ব্যক্তিস্বার্থকে বর্জন করার শিক্ষা মানুষ সমাজ থেকেই লাভ করে। এরূপে মনের সংকীর্ণতা দূর হয়।

(৬) শিক্ষা দান করে– সামাজিক জ্ঞান ও নৈতিকতার শিক্ষা ব্যক্তি সমাজ থেকেই লাভ করে। ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলা ও অন্যের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করার শিক্ষাও মানুষ সমাজ থেকেই অর্জন করে। সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও সমাজ পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মানুষের মৌলিক জ্ঞান বিস্তার করে।

সারসংক্ষেপ

নির্দিষ্ট কিছু সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মানুষ যখন একত্রিত ও সংঘবদ্ধ হয়ে বসবাস করে তখন তাকে সমাজ বলে। মৌলিক চাহিদার নিশ্চয়তার জন্য মানুষ সমাজবদ্ধ হয়। ব্যক্তিত্ব ও মানবিক গুণাবলির বিকাশের জন্যও সমাজ জরুরি। সমাজ ছাড়া মানুষের জীবন কল্পনা করা যায় না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

(ক) সত্য-মিথ্যা নির্ণয় : সত্য হলে 'স' মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন

১। মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য সমাজ জরুরি নয়।

২। ব্যক্তিত্বের বিকাশের জন্য সমাজ দরকার।

৩। নৈতিকতার শিক্ষা ব্যক্তি সমাজ থেকে লাভ করে।

(খ) রচনামূলক প্রশ্ন

১। সমাজের সংজ্ঞা দিন? সমাজের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলো লিখুন।

২। সমাজ বলতে কি বুঝেন? সমাজের উদ্দেশ্যসমূহ আলোচনা করুন।

(ক) উত্তরমালা

১। মি, ২। স, ৩। স

পাঠ-২ : ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মানুষ সামাজিক জীব। ব্যক্তিজীবনের ব্যাপক সম্পর্কের রূপই সমাজ। ব্যক্তির সমষ্টিতেই সমাজ গড়ে ওঠে। নিচে ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে বিরাজমান সম্পর্কসমূহ উপস্থাপিত হলো :

১। **ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য** : সমাজ পারস্পরিক লেনদেন ও সহযোগিতার দ্বারা ব্যক্তিজীবনের মৌলিক চাহিদা পূরণে সাহায্য করে এবং সুন্দর ও উন্নত ব্যক্তি জীবন নিশ্চিত করে। সমাজ ব্যতীত ব্যক্তিকে কল্পনা করা যায় না।

২। **ব্যক্তি ও সমাজ পরস্পর নির্ভরশীল** : জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষ জীবনের প্রতি পদক্ষেপে এবং প্রতি বাঁকে সমাজের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। আধুনিককালে জীবনে জটিলতা বৃদ্ধি পাবার ফলে মানুষ অধিকতর সমাজবদ্ধ জীবনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছে। জীবনযাত্রা প্রবাহের সাথে তাল মিলিয়ে সমাজবদ্ধ জীবনের গভীরতা তীব্র থেকে তীব্রতরভাবে অনুভূত হয়।

৩। **আদর্শ সমাজ জীবন গঠনে সম্পর্ক** : ব্যক্তিজীবনের সুকুমার বৃত্তি ও সৎগুণ সমাজের মধ্যেই পালিত ও অনুশীলিত হয়। সমাজ নৈতিক গুণাবলি দ্বারা মানুষের মন হতে কুপ্রবৃত্তিগুলো দূর করে আদর্শ জীবনব্যবস্থা গড়ে তোলে।

৪। **ব্যক্তির চিন্তাধারা দ্বারা সমাজ প্রভাবিত** : মানবসমাজের অগ্রগতির ইতিহাস পাঠ করলে দেখা যায় যে ব্যক্তির চিন্তাধারা সর্বযুগেই সমাজকে প্রভাবিত করে আসছে। জ্ঞানী, গুণী ও মহৎ আদর্শ ব্যক্তিদের চিন্ত াচেতনা সামাজিক কাঠামো ও মূল্যবোধের পরিবর্তন ঘটাতে সাহায্য করে।

৫। **ব্যক্তিজীবনের নিরাপত্তা বিধান** : সামাজিক বিধিনিষেধ ও নিয়মকানুন দ্বারা একদিকে যেমন সমাজ নিয়ন্ত্রিত হয় অপরদিকে ব্যক্তিজীবনের নিরাপত্তা বিধান করে।

৬। **ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশে সাহায্য** : সমাজ ব্যক্তিজীবনের সামগ্রিক চাহিদা পূরণে সাহায্য করে। সভ্য ও সুন্দর জীবন গঠনে সমাজ সাহায্য করে বলেই ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ ঘটে।

৭। **ব্যক্তি স্বাধীনতা নিশ্চিত করে** : নীতিহীনতা ও নীতিবিরোধিতা সমাজে অন্যায় বলে পরিগণিত হয়। ফলে সমাজের বিধিনিষেধ ব্যক্তির অধিকার খর্ব না করে বরং সমাজের আর দশজনের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা বিধান করে।

৮। **ব্যক্তি ও সমাজরে গুরুত্বের তারতম্য** : অতীতে সমাজকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হতো। সমাজপতিগণ জনসাধারণের ওপর কঠোর শাসন চালাতো এবং ব্যক্তির ওপর সমাজের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন। কিন্তু এখন সামাজিক পরিবর্তনের ফলে ব্যক্তির ওপর সমাজের প্রভাব কিছুটা হ্রাস পেয়েছে।

৯। **আধুনিককালে ব্যক্তির প্রাধান্য বৃদ্ধি পায়** : আধুনিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের ফলে সমাজের চেয়ে ব্যক্তির প্রাধান্য বৃদ্ধি পেয়েছে। অধ্যাপক হ্যারল্ড লাস্কি (Laski) বলেন, "I am unique, I am separate, I am myself."

১০। **একে অপরের পরিপূরক :** উন্নত সামাজিক পরিবেশ ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য যেমন উপযোগী, তেমনি সৃজনশীল ব্যক্তিগণ সমাজ উন্নয়নের মাধ্যম হিসেবে একে অপরকে প্রভাবিত করে উন্নয়ন ও পরিবর্তনের ধারাকে অব্যাহত রেখেছে।

ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান। পানি ছাড়া যেমন মাছ বাঁচতে পারে না, ঠিক তেমনি সমাজ ছাড়া ব্যক্তিজীবন চলতে পারে না। আবার ব্যক্তি ছাড়া সমাজ অবাস্তব। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এরিস্টটল (Aristotle) তাই যথার্থই বলেছেন, "মানুষ সামাজিক ও রাজনৈতিক জীব। যে সমাজে বাস করে না সে হয় পশু না হয় দেবতা।"

সারসংক্ষেপ

মানুষের সঙ্ঘবদ্ধ জীবনের অভিব্যক্তিই সমাজ। সমাজের মধ্যে ব্যক্তির জীবন অবর্তিত হয়। সামাজিক নিয়ম-কানুন মেনেই ব্যক্তি বিকশিত হয়। আদর্শ জীবন গঠনে সমাজের কোন বিকল্প নেই। ব্যক্তি জীবনের নিরাপত্তার জন্যও চাই সামাজিক দলবদ্ধতা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

(ক) নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। আদর্শ জীবন গঠনের জন্য চাই –

(ক) ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবাদ (খ) সমাজ

(গ) একক পরিবার (ঘ) যৌথ পরিবার

২। নিম্নের কোনটি ব্যক্তির চিন্তাধারা দ্বারা প্রভাবিত হয়?

(ক) পরিবার (খ) গ্রাম

(গ) সমাজ (ঘ) ক্লাব

(খ) রচনামূলক প্রশ্ন

১। ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক আলোচনা করুন।

২। 'মানুষ সামাজিক জীব' – উক্তিটি আলোচনা করুন।

(ক) উত্তরমালা

১। (খ), ২। (গ)

পাঠ-৩ : সমাজে বসবাসের কারণ ও সমাজের বিবর্তন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- মানুষ কেন সমাজে বসবাস করে তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- সমাজের বিবর্তন সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

সমাজে বসবাসের কারণ

মানুষ সামাজিক জীব হলেও শুধু সমাজে বাস করে না। বরং একাধিক কারণে তারা সমাজে বাস করে। নিম্নে কারণগুলো আলোচনা করা হলো :

১. **স্বাভাবিক প্রবৃত্তি :** স্বাভাবিক প্রবৃত্তির কারণেই মানুষ সমাজে বাস করতে বাধ্য হয়। কোন মানুষই নিঃসঙ্গ জীবন-যাপন করতে চায় না, পারেও না। আশা-নিরাশা ও সুখ-দুঃখের বার্তা একজন আর একজনকে জানিয়ে আত্মতৃপ্তি ও সান্ত্বনা পেতে চায়। সমাজ ছাড়া মানুষের জীবনের পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি ঘটে না কিংবা মানুষের সুকুমার বৃত্তিগুলো বিকশিত হয় না। এরিস্টটল যথার্থই বলেছেন, "মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। যে সমাজে বাস করে না সে হয় পশু না হয় দেবতা।"

২. **নিরাপত্তা লাভ :** নিরাপত্তার তাগিদে মানুষ সমাজে বাস করে। এককভাবে বাস করলে জীবন ঝুঁকিপূর্ণ হয়। পরাক্রমশালীদের আক্রমণের শিকার হতে হয়। সমাজবদ্ধ মানুষ যৌথভাবে এসব আক্রমণ প্রতিহত করে নিরাপত্তার মধ্যে নিশ্চিত জীবন যাপন করে। অতি প্রাচীনকাল থেকেই নিরাপত্তা লাভের জন্য মানুষ সমাজবদ্ধভাবে বসবাস করে আসছে। টমাস হবসের মতে, "নিরাপত্তা লাভের আকাঙ্ক্ষা থেকেই মানুষ সমাজ তথা রাষ্ট্রীয় জীবন গড়ে তুলেছে।" তাছাড়া নিরাপত্তার সাথে সাথে শান্তির কামনাও মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করেছে।

৩. **মানবিক ও গুণাবলির বিকাশ সাধন :** সমাজে বাস করার অন্যতম কারণ সমাজ মানবিক গুণাবলির বিকাশ সাধন করে। সমাজে বাস করেই মানুষ দয়া, মায়া, প্রেম-প্রীতি, ভালোবাসা, সহযোগিতা, সহমর্মিতা প্রভৃতি মানবিক গুণাবলি অর্জন করে। পরিবারের বৃদ্ধির ফলেই সমাজের সৃষ্টি হয়েছে। পরিবার থেকে লব্ধ ও বিকশিত মানবিক গুণাবলি সমাজে পরিব্যাপ্ত হয়ে পরিপূর্ণতা লাভ করে।

৪. **মৌলিক চাহিদা পূরণ :** সমাজে বাস করে বলেই মানুষ তার মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণ করতে পারে। দৈনন্দিন জীবনে যত দ্রব্যসামগ্রীর প্রয়োজন হয় তা পূরণের জন্য সে অন্যের উপর নির্ভরশীল। কেউ খাদ্যের জন্য অন্যের উপর নির্ভরশীল। আবার যে খাদ্য উৎপন্ন করে সে হয়ত বস্ত্রের জন্য অন্যের উপর নির্ভর করে। এভাবে সমাজবদ্ধ মানুষ একে অপরের চাহিদা পূরণ করে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে সহজেই বুঝা যায় যে, মানুষ একা বাস করতে পারে ন। মানবিক গুণাবলির বিকাশ, চাহিদা পূরণ ও নিরাপত্তা লাভের অন্তর্নিহিত তাগিদে মানুষ সমাজে বাস করে।

সমাজের বিবর্তন

সমাজ কখন কিভাবে গঠিত ও বিকশিত হয়েছে সমাজবিজ্ঞানীরা সে ব্যাপারে একমত নন। এ ব্যাপারে তেমন কোন প্রামাণ্য দলিলও পাওয়া যায় না। তবে সমাজবিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, জৈবিক চাহিদার কারণেই নারী-পুরুষ একত্রিত হয়, সন্তান-সন্ততির জন্মদান করে এবং পরিবার গঠন করে। পরিবার সম্প্রসারিত হয়ে গোষ্ঠী ও গোষ্ঠী বৃদ্ধি পেয়ে উপজাতিতে পরিণত হয়। পরবর্তীতে ধর্মের বন্ধন, অর্থনৈতিক

ও রাজনৈতিক চেতনার সমন্বিত অবদানের ফলে সমাজ সৃষ্টি হয়। নিচে সমাজ বিকাশের ধারায় বিভিন্ন উপাদানের অবদান ও গুরুত্ব আলোচনা করা হলো :

১. **পরিবার :** পরিবারকে কেন্দ্র করে সমাজের ভিত্তি রচিত হয়। অবশ্য পরিবার ব্যবস্থা গড়ে উঠার পূর্বেই মানুষ সমাজবদ্ধ হয়েছিল। অবাধ জীবনকালেও মানুষ কোন না কোন ভাবে ঐক্যবদ্ধ ছিল। তবে পরিবার ব্যবস্থা সুসভ্য সমাজের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। রক্তের সম্পর্কের ভিত্তিতে পরিবার গড়ে উঠে। রক্তের বন্ধনের কারণেই পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সহযোগিতা ও মায়া-মমতার সুদৃঢ় বন্ধন রচিত হয়। তাই পরিবার সমাজ ব্যবস্থার ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।

২. **গোষ্ঠী :** পরিবার বৃদ্ধি পেয়ে গোষ্ঠীতে পরিণত হয়। পরিবারের মত না হলেও রক্তের বন্ধনই জনগোষ্ঠীকে ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করে। একই জনগোষ্ঠীর মধ্যে রক্তের সম্পর্কগত ঐক্যানুভূতি, গোষ্ঠীপতির প্রতি আনুগত্য, গোষ্ঠী হিসেবে পরিচিত হওয়ার কামনা ও অন্য গোষ্ঠী হতে শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা সুদৃঢ় বন্ধন হিসেবে কাজ করে। অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় কারণে গোষ্ঠীবদ্ধ জনগোষ্ঠী সমাজ চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়।

৩. **উপজাতি :** গোষ্ঠী সম্প্রসারিত হয়ে একাধিক গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয় এবং একাধিক জনগোষ্ঠী উপজাতিতে পরিণত হয়। রক্তের বন্ধন অপেক্ষা সাধারণ স্বার্থ ও একই সাথে ধর্ম পালনের যৌথ কামনা তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করে।

৪. **ধর্মের বন্ধন :** উপজাতির সম্প্রসারণের ফলে আত্মীয়তার সম্পর্ক শিথিল হয়ে পড়ে। এই পর্যায়ে ধর্মই ঐক্যের বন্ধন রচনা করে। উপজাতির শাসকই আবার ধর্মগুরু। তাই একই ধর্মবিশ্বাসী উপজাতিগুলো একতাবদ্ধ ও সংগঠিত হয়ে ব্যাপক সামাজিক সম্পর্ক গড়ে তোলে।

৫. **অর্থনৈতিক চেতনা :** উৎপাদন, বণ্টন, বিনিময় ও ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিবর্তন ও প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে উপজাতির অভ্যন্তরীণ জনগোষ্ঠী ও বিভিন্ন উপজাতির জনগোষ্ঠীর মধ্যে সম্পর্কের বিস্তার ঘটে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে মানুষের মনে সঞ্চয়ের কামনা দেখা দেয়। সেই সাথে সম্পাদকে সংরক্ষণ ও নিরাপদ করার তাগিদে সে আইনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে। তাই অর্থনৈতিক কারণেও মানুষ সমাজবদ্ধ থাকার চেতনা লাভ করে।

৬. **রাজনৈতিক চেতনা :** অর্থনৈতিক চেতনার সাথে রাজনৈতিক চেতনা যুক্ত হয়ে সমাজ বন্ধনকে সুদৃঢ় করে। অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষার জন্য আইন-কানুন ও কর্তৃত্ব প্রয়োগ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। কর্তৃত্ব ও আনুগত্যের বন্ধন সুসংগঠিত সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলে এবং সমাজবদ্ধ মানুষকে বিশেষ ধরনের রাজনৈতিক চেতনা দান করে যা পরবর্তীতে সুসংবদ্ধ সমাজের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।

বস্তুত সমাজ কোন আকস্মিক ঘটনার ফল নয়। বরং পরিবার, গোষ্ঠী, উপজাতি, ধর্মের বন্ধন, অর্থনৈতিক চেতনা ও রাজনৈতিক চেতনার সমন্বিত অবদানের ফলে সমাজের ক্রমবিকাশ ঘটেছে। পরিবর্তনশীলতার মধ্য দিয়েই সমাজ অগ্রসর হচ্ছে।

সারসংক্ষেপে

সমাজে বসবাস করে মানুষ তার নিজস্ব প্রয়োজনে। বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস করলে জীবনের নিরাপত্তা থাকে না। সমাজ থেকেই ব্যক্তি মানবিক গুণাবলির বিকাশ সাধন করে। মৌলিক চাহিদার পূরণের জন্যও মানুষ সমাজের কাছে ঋণী।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

(ক) শূন্যস্থান পূরণ করুন

১। পরিবার বৃদ্ধির ফলেই —— সৃষ্টি।

২। নিরাপত্তার —— মানুষ সমাজে বাস করে।

৩। যে সমাজে বাস করে না সে পশু অথবা ——।

৪। সমাজ কোন —— ঘটনার ফল নয়।

(খ) রচনামূলক প্রশ্ন

১। মানুষ কেন সমাজে বসবাস করে তা আলোচনা করুন।

২। ব্যক্তি জীবনে সমাজের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করুন।

৩। সমাজের বিবর্তন সম্পর্কে বর্ণনা করুন।

(ক) উত্তরমালা

১। সমাজের, ২। জন্য, ৩। দেবতা ৪। আকস্মিক।

পাঠ-৪ : সামাজিক পরিবর্তন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- সামাজিক পরিবর্তন বলতে কি বুঝায় তা আলোচনা করতে পারবেন।
- সামাজিক পরিবর্তনের কারণসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

ভূমিকা

সমাজ গতিশীল মানবিক সংগঠন। মানুষের চিন্তা-চেতনার পরিবর্তনের সাথে সাথে প্রতিনিয়ত সমাজজীবনে পরিবর্তন এবং পরিবর্ধন সাধিত হচ্ছে। পূর্বে সমাজজীবনে যেসব রীতিনীতি প্রচলিত ছিল আজ তাদের অনেকগুলোই নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। তাদের স্থলে জন্মলাভ করেছে হাজারো নতুন রীতিনীতি ও প্রথা। পরিবর্তনের ধারায় নতুনের আবির্ভাব হচ্ছে এবং পুরাতন বিলুপ্ত হচ্ছে।

সামাজিক পরিবর্তনের সংজ্ঞা

সামাজিক পরিবর্তন হলো সামাজিক কাঠামোর পুনর্গঠন বা রূপান্তর। অর্থাৎ একটি বিশেষ সামাজিক রূপ থেকে অন্যরূপ ধারণ করাকেই সামাজিক পরিবর্তন বলে।

সামাজিক পরিবর্তন বলতে মূলত সমাজের কাঠামো, সংগঠন, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা, রীতিনীতি প্রথাসহ ব্যক্তির ভূমিকা ও আত্মমর্যাদাবোধের পরিবর্তন ও পরিবর্ধনকে বোঝায়।

গার্থ ও মিলস (Gerth and Mills)-এর মতে, 'কালের গতিতে রীতিনীতি বা প্রতিষ্ঠান এবং সামাজিক ব্যবস্থার যে পরিবর্তন ঘটে থাকে তাকে সামাজিক পরিবর্তন বলে।'

ম্যাকাইভার (Maciver) বলেন, 'সামাজিক পরিবর্তন হচ্ছে সামাজিক সম্পর্কের পরিবর্তন।'

স্যামুয়েল কোয়েনিগ (Samuel Kuanig)-এর মতে, 'সামাজিক পরিবর্তন দ্বারা কোনো জাতির জীবনযাপন পদ্ধতির রূপান্তর, সংশোধন ও পরিবর্তনকে বোঝায়।'

উইলিয়াম এফ অগবার্ন (William F. Ogburn) বলেন, 'সমাজে বসবাসরত মানুষের কৃষ্টিগত ও সংস্কৃতিগত পরিবর্তনের নামই সামাজিক পরিবর্তন।'

অতএব, সামাজিক পরিবর্তন বলতে বোঝায় সমাজের মানুষের আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি, মূল্যবোধ, সংস্কৃতি, শিল্পক্ষেত্র, দর্শন, কলা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় অথবা তথা জীবনাদর্শসহ সর্ববিষয়ের পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও বিবর্তন।

সামাজিক পরিবর্তনের কারণ

বিভিন্ন কারণে সামাজিক পরিবর্তন হয়ে থাকে। নিম্নে সামাজিক পরিবর্তনের কারণসমূহ আলোচনা করা হলো :

১। **প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব** : কোনো অঞ্চলের আবহাওয়া, জলবায়ু ও ভূমির গঠনে পরিবর্তন হলে সেখানকার জনগোষ্ঠীকে নতুন অবস্থার সাথে খাপ খাওয়াতে হয়। এতে সামাজিক জীবনে বিরাট পরিবর্তন সাধিত হয়।

২। **রাজনৈতিক প্রভাব** : অনেক সময় রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের সাথে সাথে দেশের সামাজিক কাঠামো ও আদর্শের পরিবর্তন সূচিত হয়। পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শ ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক পরিবর্তনের ধারক ও বাহক।

৩। **অর্থনৈতিক প্রভাব :** উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটলে সামাজিক কাঠামো, ধ্যান-ধারণা ও আদর্শের ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। ফলে মানুষের চাল-চলন, আচার-ব্যবহার ও চিন্তাধারার ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে।

৪। **ধর্মীয় মূল্যবোধের পরিবর্তন :** কোনো নতুন ধর্মের আবির্ভাব ধর্মীয় মূল্যবোধের পরিবর্তন ঘটায়। ধর্মীয় মূল্যবোধের পরিবর্তন ঘটলে একটি জনসমষ্টি অথবা জাতির আচার-আচারণ ও জীবনাদর্শের ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন ঘটে।

৫। **সাংস্কৃতিক পরিবর্তন :** সমাজবিজ্ঞানীগণ সাংস্কৃতিক পরিবর্তনকে সামাজিক পরিবর্তনের অন্যতম কারণ বলে উল্লেখ করেছেন। অগবার্ন (Ogburn) বলেন, 'সামাজিক রিবর্তনের মূলে রয়েছে সমাজে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর মানসিকতা, রীতিনীতি, উৎপাদন পদ্ধতি ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন।

৬। **বিজ্ঞানের নব নব উদ্ভাবন :** বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে মানুষের কর্মপদ্ধতি ও চিন্তাধারার আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সমাজ ও সামাজিক জীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করেছে।

৭। **তথ্য-প্রযুক্তির উন্নয়ন :** বিজ্ঞানের নতুন নতুন প্রযুক্তি সমাজজীবনে গভীর পরিবর্তন এনেছে। কৃষি, শিল্প, বাণিজ্যসহ সর্বত্রই বিজ্ঞান প্রভূত পরিবর্তন এনেছে।

৮। **সংস্কার ও বিপ্লব :** সংস্কার ও বিপ্লব সমাজের কাঠামো, মূল্যবোধ ও চিন্তাধারাকে সম্পূর্ণ ধারায় প্রবাহিত করে। যেমন– জাপানের মেইজি সংস্কার আন্দোলন জাপানকে কৃষি থেকে শিল্পসমৃদ্ধ রাষ্ট্রের পরিণত করেছে।

৯। **বিবর্তনবাদ :** সামাজিক পরিবর্তনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে বিবর্তনবাদ। এ বিবর্তনবাদের অব্যাহত কর্মধারা সমাজের বিদ্যমান। যা সমাজসংস্কারে কার্যত মুখ্য ভূমিকা পালন করে।

১০। **দ্বান্দ্বিকতা :** কার্ল মার্কস (Karl Marx) বলেছেন, 'শোষণ-বৈষম্য ও শোসণহীনতা এবং সাম্য দুয়ের মধ্যে দ্বান্দ্বিক সম্পর্কই সমাজ পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করেছে।' সুতরাং সমাজ পরিবর্তনের পেছনে দ্বান্দ্বিকতা একটি অপরিহার্য কারণ।

১১। **উদ্বৃত্ত মূল্য :** Surplu value বা মূল্যের উদ্বৃত্ত তত্ত্ব সমাজ পরিবর্তনের আরও একটি কারণ। এ উদ্বৃত্ত বিষয়টি সমাজের মধ্যে সচেতনতা আনে এবং সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ডে মানুষ কর্তৃক গৃহীত হয়। ফলে সামাজিক পরিবর্তন আসে।

১২। **শ্রেণীসংগ্রাম :** মার্কস (Marx) বলেছেন, 'সমাজ পরিবর্তিত হয় কেবল শ্রেণীসংগ্রামের কারণে।' এ শ্রেণীসংগ্রাম ধনী এবং দরিদ্র বিষয়টিকে সমাজ হতে দূরীভূত করে। আর সমাজ পরিবর্তনের ধারা অব্যাহত রাখে।

১৩। **বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তার প্রভাব :** সামাজিক পরিবর্তনের মূলে মানুষের চিন্তা ও বুদ্ধির প্রভাব অপরিসীম। চিন্তা ও বুদ্ধিবৃত্তি সামাজিক পরিবর্তনের উৎস।

১৪। **ব্যক্তিত্বের প্রভাব :** সামাজিক পরিবর্তনে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের ভূমিকা অনস্বীকার্য। গার্থ ও মিলস (Gerth and Mills) বলেন, 'সামাজিক পরিবর্তন সাধিত হয় ক্ষণজন্মা ব্যক্তির নির্দিষ্ট ভূমিকা, যান্ত্রিক আবিষ্কার ও ধ্যান-ধারণার মাধ্যমে।'

১৫। **মরিস জিলবার্গ প্রদত্ত গবেষণালব্ধ কারণ :** সমাজবিজ্ঞানী মরিস জিনসবার্গ (Morris Ginsburg) সামাজিক কারণ অনুসন্ধান সংক্রান্ত গবেষণায় দেখিয়েছেন ব্যক্তিসমষ্টির সচেতনতা, সাংগঠনিক পরিবর্তন, বহিরাগত প্রভাব, প্রতিভাবান ক্ষণজন্মা ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের আবির্ভাব, বিভিন্ন কারণে সংমিশ্রণ, সাধারণ লক্ষ্য।

সারসংক্ষেপ

সমাজবদ্ধ মানুষের আচার-আচরণ, রীতিনীতি, সংস্কৃতি প্রভৃতি পরিবর্তিত হলেই মূলত সামাজিক পরিবর্তন সাধিত হয়। আর এ পরিবর্তন নির্ভর করে সমাজবদ্ধ মানুষের চিন্তা-চেতনার ওপর। বিভিন্ন পরিবেশ ও পরিস্থিতি মানুষের চিন্তা-চেতনার পরিবর্তন ঘটায়। ফলে কোনো নির্দিষ্ট কারণ সামাজিক পরিবর্তন ঘটায় না। বহুবিধ কারণের সংমিশ্রণেই সামাজিক পরিবর্তন সাধিত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

(ক) নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। সামাজিক পরিবর্তন হচ্ছে সামাজিক সম্পর্কের পরিবর্তন – উক্তিটি কার?

(ক) ম্যাকাইভার (খ) অগবার্ন

(গ) গার্থ (ঘ) মিলস

২। প্রযুক্তি সমাজ জীবনের কোন ক্ষেত্রে পরিবর্তন এনেছে?

(ক) শিক্ষা (খ) কৃষি

(গ) শিল্প (ঘ) উপরের সবকটি

(খ) রচনামূল্যক প্রশ্ন

১। সামাজিক পরিবর্তন কাকে বলে? সামাজিক পরিবর্তনের কারণসমূহ আলোচনা করুন।

(ক) উত্তরমালা

১। (ক), ২। (খ)

ইউনিট ৫

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত মতবাদ

ভূমিকা

রাষ্ট্র একটি সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠন। রাষ্ট্রের উৎপত্তির ইতিহাস নিয়ে বিতর্ক আছে। মূলত মানুষের বিবর্তনের এক পর্যায়ে প্রথমে গঠিত হয় পরিবার, তারপর সমাজ। সমাজ জীবনের এক পর্যায়ে মানুষ শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা এবং ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্য রাষ্ট্র গঠন করে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানীগণ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত মতবাদ আলোচনা করেছেন। রাষ্ট্রের গঠন, প্রকৃতি, উদ্দেশ্য ও কার্যাবলি সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জনের জন্য এর উৎপত্তি সংক্রান্ত মতবাদ জানা জরুরি। একই সঙ্গে রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা এবং যে বিবর্তনের পথ ধরে রাষ্ট্র বর্তমান স্তরে এসে পৌঁছেছে সেটা বিশ্লেষণের জন্যও এর উৎপত্তি জানা দরকার। রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত বিভিন্ন মতবাদ চালু আছে, তার মধ্যে– ঐশ্বরিক মতবাদ, বল প্রয়োগ মতবাদ, পিতৃতান্ত্রিক মতবাদ, সামাজিক চুক্তি মতবাদ, ঐতিহাসিক মতবাদ প্রভৃতি প্রধান। বর্তমান ইউনিটে নিম্নোক্ত পাঠগুলো আলোচনা করা হলো :

পাঠ-১ : ঐশ্বরিক মতবাদ।
পাঠ-২ : বল প্রয়োগ মতবাদ।
পাঠ-৩ : সামাজিক চুক্তি মতবাদ।
পাঠ-৪ : ঐতিহাসিক বা বিবর্তনমূলক মতবাদ।

পাঠ-১ : ঐশ্বরিক মতবাদ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত ঐশ্বরিক বা বিধাতার সৃষ্টি মতবাদ আলোচনা করতে পারবেন।
- ঐশ্বরিক মতবাদের তাৎপর্য ও প্রভাব বর্ণনা করতে পারবেন।
- ঐশ্বরিক বা বিধাতার সৃষ্টি মতবাদের সমালোচনা করতে পারবেন।

ঐশ্বরিক মতবাদ

ঐশ্বরিক বা বিধাতার সৃষ্টি মতবাদ রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত মতবাদের মধ্যে সবচেয়ে পুরাতন। এ মতবাদের মূল কথা হলো, রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছে ঈশ্বর বা বিধাতার ইচ্ছানুযায়ী। রাষ্ট্র সৃষ্টিতে ব্যক্তির ইচ্ছা-অনিচ্ছার গুরুত্ব নেই। সমগ্র পৃথিবীর শাসনকর্তা সত্যিকার অর্থে সৃষ্টিকর্তা। তবে সৃষ্টিকর্তা নিজে রাষ্ট্র শাসন করেন না। তিনি প্রতিনিধির মাধ্যমে রাষ্ট্র শাসন করেন। শাসক বা রাজা হলো ঈশ্বরের প্রতিনিধি। সৃষ্টিকর্তাকে যেমন অমান্য করা যায় না, তদ্রূপ তাঁর প্রতিনিধি রাজাকেও অমান্য বা তুচ্ছ করা যায় না। মূলত রাজা বা শাসকের আদেশ–সৃষ্টিকর্তারই নির্দেশ। রাজাকে অবমাননা করা মানেই সৃষ্টিকর্তাকে অবমাননা করা। শাসন করার ক্ষেত্রে রাজা ঈশ্বর ছাড়া আর কারো কাছে দায়বদ্ধ নয়। এ কারণে রাজার স্থায়ীত্ব জনগণের ওপর নির্ভরশীল নয়। শাসকগণ একইসঙ্গে রাষ্ট্রপ্রধান এবং ধর্মীয় প্রধান।

মধ্যযুগের রাষ্ট্রচিন্তাবিদ সেন্ট অগাস্টিন মূলত এই চিন্তার প্রবক্তা। জন অব সেলিস বেরী, সেন্ট টমাস একুইনাস, সেন্ট গ্রেগরী, ফরাসি সম্রাট চতুর্দশ লুই এই মতবাদ বিশ্বাস করতেন। বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থেও এই মতবাদের স্বীকৃতি মেলে। ইহুদিদের ধর্মগ্রন্থ ওল্ড টেস্টামেন্ট-এ বলা হয়েছে, 'রাষ্ট্র বিধাতারই সৃষ্টি।' খ্রিস্টানদের ধর্মগ্রন্থ বাইবেল এবং হিন্দুদের অন্যতম ধর্মগ্রন্থ মহাভারতে ঐশ্বরিক মতবাদের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। বিভিন্ন আদিবাসী গোষ্ঠীতে পুরোহিত ও যাজকদের ক্ষমতাচর্চার ক্ষেত্রেও এই মতবাদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

ঐশ্বরিক মতবাদের সমালোচনা

আধুনিক জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের উপস্থিতিতে রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত ঐশ্বরিক বা বিধাতার সৃষ্টি মতবাদ গ্রহণযোগ্য নয়। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এ মতবাদ সমালোচিত হয়েছে –

- এ মতবাদে শাসককে স্বেচ্ছাচারী করা হয়। শাসক ক্ষমতা প্রয়োগে সৃষ্টিকর্তা ছাড়া আর কারো কাছে দায়বদ্ধ নয় – এ কথার অর্থ শাসক সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। শাসকের এ ধরনের ক্ষমতা জনগণের জীবনকে দুর্বিসহ করে তুলতে পারে।
- সৃষ্টিকর্তার নিকট সকল ব্যক্তি সমান। এ কারণে তিনি কেবল একজন স্বৈরাচারী শাসককে সমর্থন করতে পারেন না। সঙ্গত কারণেই এ মতবাদ গ্রহণযোগ্য নয়।
- এ মতবাদের মাধ্যমে ধর্মীয় গোঁড়ামি তথা সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিস্তার ঘটতে পারে। এ মতবাদ অনিবার্যভাবে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জীবন বিপদগ্রস্ত করে তুলতে পারে। ধর্ম আর রাজনীতিকে গুলিয়ে ফেলার অর্থ উভয়ের পবিত্রতা নষ্ট করা।
- ঐশ্বরিক মতবাদ সত্য হলে এখনো যত্রতত্র রাষ্ট্র সৃষ্টি হতো। ঈশ্বর তার প্রতিনিধি হিসেবে রাজাকে প্রেরণ বা নির্বাচিত করতেন। কিন্তু এমনটা আধুনিক কালে দেখা যায় না।

- ধর্মীয় প্রধানগণও এ মতবাদকে সমালোচনা করেছেন। ধর্মযাজকরা স্পষ্টভাবে মন্তব্য করেছেন– 'পার্থিব বা নশ্বর বিষয়ে বিধাতাকে সম্পৃক্ত করা যায় না, এসব ব্যাপারে প্রাধান্য দিতে হয় বিবেক ও যুক্তিকে।' ইসলাম ধর্মে এ মতবাদের কোন স্বীকৃতি নেই। এমনকি খ্রিস্ট ধর্মেও বলা হয়েছে – 'বিধাতার প্রাপ্য বিধানকে দাও, আর সিজারের যা প্রাপ্য তা সিজারকে দাও।' এ কথার অর্থ সিজার (রোমান সম্রাট) বিধাতার প্রতিনিধি নয়। কাজেই ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকেও এ মতবাদ বর্জনীয়।

গুরুত্ব ও প্রভাব

বর্তমান যুগে ঐশ্বরিক মতবাদ অচল মনে হলেও প্রাচীনকালে ও মধ্যযুগে রাষ্ট্রকে শক্তিশালী ও সুসংগঠিত করতে এ মতবাদের তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। কেননা রাজা বা শাসনকর্তাকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসেবে ঘোষণা করায় রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব মজবুত হয়। রাজাকে কেন্দ্র করে সমস্ত জনগণ সংঘবদ্ধ হতে পারে। যা একদিকে অন্য রাষ্ট্রের আক্রমণকে প্রতিহত করে, অন্যদিকে নিজ রাষ্ট্রের বিস্তারকে সম্ভব করে তোলে। উপরন্তু এই মতবাদের মাধ্যমে পোপ ও ধর্মীয় গুরুরাও রাজার অধীন চলে আসে। ফলত এ মতবাদ অনুযায়ী রাষ্ট্রে দু'টো ক্ষমতা কেন্দ্র তৈরি হয় না।

এই মতবাদ অনুসারে রাষ্ট্র পরিচালনায় শাসক জনগণের কাছে দায়বদ্ধ না হলেও পরকালে ঈশ্বরের কাছে দায়বদ্ধ। পরকালে ঈশ্বরের কাছে রাজার জবাবদিহিতা তার ক্ষমতাকে সংযত ও সীমিত করে। রাজা স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠতে পারে না। কেননা তার মধ্যে এক ধরনের ভয় কাজ করে। আর এ ভয় থেকে রাজা জনগণের কল্যাণে কাজ করেন।

সারসংক্ষেপ

রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত মতবাদ ব্যাখ্যা করেছেন। এ কারণে রাষ্ট্রের উৎপত্তির ব্যাপারে বেশ কয়েকটি মতবাদের জন্ম হয়েছে। ঐশ্বরিক সৃষ্টি মতবাদ রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত মতবাদগুলোর মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন। এ মতবাদের মূল কথা হলো– বিধাতাই রাষ্ট্রের সৃষ্টিকর্তা। রাজা বা শাসক, সৃষ্টি কর্তার প্রতিনিধি হিসেবে রাষ্ট্র পরিচালনা করেন। শাসক রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে জনগণের কাছে দায়বদ্ধ নয়। শাসকের মনোনয়ন কিংবা বিনাশ জনগণের ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর নির্ভরশীল নয়। তবে শাসক ঈশ্বরের কাছে দায়বদ্ধ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

(ক) নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত সবচেয়ে পুরনো মতবাদ কোনটি?

(ক) মাতৃতান্ত্রিক মতবাদ (খ) পিতৃতান্ত্রিক মতবাদ

(গ) ঐশ্বরিক মতবাদ (গ) কোনটি নয়

২। ঐশ্বরিক মতবাদের তাত্ত্বিক কে?

(ক) এরিস্টটল (খ) টমাস হবস

(গ) জ্যাঁ জ্যাক রুশো (ঘ) সেন্ট অগাস্টিন

৩। ঐশ্বরিক মতবাদ অনুযায়ী ঈশ্বরের প্রতিনিধি কে?

(ক) শাসনকর্তা (খ) যাজকগণ

(গ) জনগণ (ঘ) কোনটি নয়

(খ) এক কথায় উত্তর দিন

১। বিধাতার সৃষ্টি মতবাদের মূল কথা কি?

২। রাজা বা শাসক কার প্রতিনিধি?

৩। শাসক রাষ্ট্র পরিচালনায় কার কাছে দায়বদ্ধ?

৪। কোন কোন ধর্মগ্রন্থে ঐশ্বরিক মতবাদের ইঙ্গিত পাওয়া যায়?

৫। ঐশ্বরিক মতবাদে রাজাকে স্বৈরাচারী বলা হয় কেন?

(ক) উত্তরমালা

১। (গ), ২। (ঘ), ৩। (ক)

পাঠ-২ : বল প্রয়োগ মতবাদ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- বল প্রয়োগ সংক্রান্ত মতবাদ আলোচনা করতে পারবেন।
- রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত মতবাদের ক্ষেত্রে বল প্রয়োগ মতবাদের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।
- বল প্রয়োগ মতবাদের সমালোচনা করতে পারবেন।

বল প্রয়োগ মতবাদ

বল প্রয়োগ মতবাদের সারকথা হলো– রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে। এই মতবাদে বিশ্বাসীদের মতে, আদিম সমাজে যারা দৈহিক শক্তির অধিকারী ছিল তারা বল প্রয়োগ করে নিজ গোত্র বা গোষ্ঠীর ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করত। কালক্রমে খাদ্য ও বাসস্থানের চাহিদার কারণে শক্তিশালী গোত্র আবার অপেক্ষাকৃত কম শক্তিশালী গোত্রের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করত। আর এভাবে সবলরা অপেক্ষাকৃত দুর্বলদের ওপর শক্তি প্রয়োগ করে আইন-কানুন চাপিয়ে দিয়ে রাষ্ট্র গঠন করেছে। অর্থাৎ বৃহত্তর সমাজ শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হয়েছে। এই মতবাদ অনুযায়ী শক্তি হলো রাষ্ট্রের মূল ভিত্তি (Force is the basis of state)। শক্তিশালী গাত্র শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে দুর্বল গোত্রকে পরাজিত করে প্রাধান্য বিস্তার করত। এই তত্ত্ব অনুসারে যুদ্ধ-বিগ্রহ, সহিংসতা, রক্তপাত, দ্বন্দ্ব-সংঘাত এর মাধ্যমে রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছে। এই মতবাদে ঈশ্বরের প্রতিনিধিত্বের কিংবা জনগণের সম্মতির কোন স্থান নেই। যুদ্ধের মাধ্যমে এক গোত্র আরেক গোত্রের পদানত হয়। অনেকক্ষেত্রে পরাজিত গোষ্ঠী 'দাস সমাজে' রূপান্তরিত হয়েছে। এই মতবাদের সঙ্গে দাসদের উদ্ভবের বিষয়টি অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত।

ডেভিড হিউমকে এই মতবাদের প্রবক্তা বলা হলেও রাষ্ট্রবিজ্ঞানী জেংকস, জেলীনক, অধ্যাপক লিকক, বার্নহার্ডী, জেরমী টেলর প্রমুখ এ মতবাদ নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী জেংকস বলেন, ঐতিহাসিক দিক থেকে বিচার করলে সহজেই প্রমাণ করা যায়, রাষ্ট্রসহ আধুনিক সকল সংগঠন সার্থক যুদ্ধের ফলশ্রুতি। তার স্পষ্ট অভিমত 'আধুনিক রাষ্ট্রসমূহের জন্ম হয়েছে সফল যুদ্ধের মাধ্যমে।'

বল প্রয়োগ মতবাদের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

রাষ্ট্রের উৎপত্তির ক্ষেত্রে 'বল প্রয়োগ' একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। মিশরীয়, ব্যাবলনীয়, চৈনিক, রোমান কিংবা মায়া সভ্যতার ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে স্পষ্টই বুঝা যায়, এসব সভ্যতার সৃষ্টিতে কাজ করছে 'শক্তি প্রয়োগ' নীতি। শুধু রাষ্ট্রের উদ্ভব নয়; রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব রক্ষার ক্ষেত্রেও বল প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা আছে।

যুদ্ধ-বিগ্রহের মাধ্যমে বিশ্বে অনেক রাষ্ট্রেরই জন্ম হয়েছে। বাংলাদেশসহ আফ্রিকা-এশিয়া-ল্যাটিন আমেরিকার অসংখ্য উন্নয়নশীল রাষ্ট্র যুদ্ধ-বিগ্রহ তথা স্বাধীনতা যুদ্ধের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করেছে। বর্তমান কালে দেশে দেশে যুদ্ধ ও সামরিক শক্তি বৃদ্ধি এ মতবাদকে অনিবার্যতা দান করছে। তাই বল প্রয়োগ নৈতিক বিচারে সমর্থন-যোগ্য না হলেও, রাষ্ট্র সৃষ্টির ব্যাপারে এ মতবাদের অবদানের কথা স্বীকার করতে হবে।

বল প্রয়োগ মতবাদের সমালোচনা

১. এ মতবাদ নৈতিকভাবে সমর্থনযোগ্য নয়। কেননা 'জোর যার মুল্লুক তার' এ মতবাদ সমাজ ও রাষ্ট্রে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে পারে।

২. রাষ্ট্র সৃষ্টির ক্ষেত্রে অনেকগুলো উপাদান কাজ করে। বল প্রয়োগ তার মধ্যে একটি। কিন্তু এ মতবাদে বল প্রয়োগকেই একমাত্র উপাদান হিসেবে ঘোষণা করা হয়, যা বাস্তবে গ্রহণযোগ্য নয়।

৩. শক্তির সঙ্গে পাশবিকতার সম্পর্ক রয়েছে। রাষ্ট্র একটি সামাজিক সংগঠন তাই পাশবিক শক্তি প্রয়োগের নীতি রাষ্ট্রে গ্রহণযোগ্য নয়।

৪. শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে জনগণের সম্মতি আদায় করা যায় না। এ কারণে জনগণকে সংঘবদ্ধ বা একত্রিত করা সম্ভব নয়। কিছু সময়ের জন্য বল প্রয়োগের মাধ্যমে জনগণকে অবদমিত করা গেলেও একটি সময় জনগণ আক্রোশে ফুঁসে ওঠে। ফলত রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ে।

৫. বল প্রয়োগ মতবাদ বিশ্ব শান্তির জন্য হুমকির স্বরূপ। কেননা বল প্রয়োগকে বৈধতা দেয়া হলে বৃহৎ ও শক্তিশালী রাষ্ট্র ক্রমাগতভাবে দুর্বল ও ক্ষুদ্র রাষ্ট্রকে আক্রমণ করবে। যা বিশ্ব শান্তিকে বিপর্যস্ত করে তুলবে।

৬. রাষ্ট্র সৃষ্টির ক্ষেত্রে বল প্রয়োগ মতবাদ মানব সমাজে যুদ্ধকে উস্কে দিতে পারে। যুদ্ধ হলো মানব সমাজের জন্য সবচেয়ে ক্ষতিকর। যুদ্ধে মানবিকতা নির্বাসিত হয়। ব্যক্তি তার মানবীয় গুণাবলি পরিহার করে সহিংস হয়ে ওঠে। যা ব্যক্তির বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করে।

৭. আধুনিক জাতীয় রাষ্ট্র সৃষ্টির মূল উপাদান হলো– জাতীয়তাবাদ ও জনগণের সম্মতি। রাষ্ট্রীয় সংহতি রক্ষা করে মূলত জাতীয়তাবাদ। জাতীয়তাবাদ হলো এক বিশেষ ধরনের মনস্তাত্ত্বিক চেতনাজ্ঞাত মূল্যবোধ। শক্তি দিয়ে এ মূল্যবোধ সৃষ্টি করতে গেলে তা বিনষ্ট হতে পারে। ফলত আধুনিক রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বিপন্ন হতে পারে এ মতবাদ অনুসরণ করলে। টি এইচ গ্রিন সেজন্য বলেছেন, 'শক্তি নয়, ইচ্ছাই রাষ্ট্রের ভিত্তি।'

সারসংক্ষেপ

বল প্রয়োগ মতবাদের মূল কথা হলো, শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমেই রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছে। অধিক শক্তিশালী গোত্র যুদ্ধের মাধ্যমে অপেক্ষাকৃত দুর্বল গোত্রকে পরাজিত করে। পরবর্তীতে পরাজিত গোত্রের ওপর আইন কানুন চাপিয়ে আনুগত্য আদায়ের মাধ্যমে রাষ্ট্র গঠন করা হয়। এই মতবাদ অনুযায়ী শক্তিই হলো রাষ্ট্রের মূল ভিত্তি। এ মতবাদ আংশিক সত্য হলেও পুরোপুরি গ্রহণযোগ্য নয়। অবশ্য যত সমালোচনাই থাক, রাষ্ট্রের সংহতি রক্ষার জন্য এ মতবাদের প্রয়োজন আছে। পুরাকাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত বহু রাষ্ট্র এ মতবাদের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

(ক) নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বল প্রয়োগ মতবাদের রাষ্ট্রের ভিত্তি কি?
(ক) ঈশ্বরের অনুকম্পা (খ) শক্তি প্রয়োগ
(গ) জনগণের সম্মতি (ঘ) বিবর্তন

২। বল প্রয়োগ মতবাদের তাত্ত্বিক কারা?
(ক) হবস, লক, রুশো (খ) প্লেটো, এরিস্টটল
(গ) হিউম, জেংকস, জেলীনক (ঘ) সেন্ট অগাস্টিন, একুইনাস

৩। "শক্তি নয়, ইচ্ছাই রাষ্ট্রের ভিত্তি" - উক্তিটি কার?
(ক) ফাইনার (খ) ম্যাক্স ওয়েবার
(গ) টি. এইচ. গ্রিন (ঘ) টমাস হবস

(খ) এক কথায় উত্তর দিন-

১। বল প্রয়োগ মতবাদের মূল কথা কি?

২। বল প্রয়োগ মতবাদ কিসের জন্য হুমকিস্বরূপ?

৩। কোন কোন সভ্যতা বল প্রয়োগের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিলো?

৪। বল প্রয়োগ মতবাদের তাত্ত্বিক কারা?

(ক) উত্তরমালা

১। (খ), ২। (গ), ৩। (গ)

পাঠ-৩ : সামাজিক চুক্তি মতবাদ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- সামাজিক চুক্তি মতবাদ সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।
- সামাজিক চুক্তি মতবাদের গুরুত্ব ও তাৎপর্য বর্ণনা করতে পারবেন।
- সামাজিক চুক্তি মতবাদের সমালোচনা করতে পারবেন।

সামাজিক চুক্তি মতবাদ

সামাজিক চুক্তি মতবাদ রাষ্ট্রের উৎপত্তির ক্ষেত্রে একটি কাল্পনিক মতবাদ। এই মতবাদের মূল কথা হলো - সৃষ্টির শুরুতে বা আদিম সমাজে মানুষ প্রকৃতির রাজ্যে বাস করত। প্রকৃতির রাজ্যের মানুষ প্রাকৃতিক আইন মেনে চলতো এবং তারা কিছু প্রাকৃতিক অধিকার ভোগ করত। কিন্তু প্রাকৃতিক আইন ও অধিকার সম্পর্কে বিভিন্ন ব্যাখ্যার ফলে প্রকৃতির রাজ্যে মানুষের বসবাস দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য প্রকৃতির রাজ্যের অধিবাসীরা নিজেদের মধ্যে চুক্তি করে রাষ্ট্র গঠন করে। একই সঙ্গে একজন ব্যক্তি অথবা একটি কর্তৃপক্ষকে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বভার অর্পণ করে। যেহেতু রাষ্ট্র চুক্তির মাধ্যমে গড়ে উঠেছে সেহেতু এ মতবাদকে সামাজিক চুক্তি মতবাদ (Social contract theory) বলে।

সপ্তদশ শতাব্দীতে টমাস হবস তার বিখ্যাত 'লেভিয়াথান' গ্রন্থে এ বিষয়ে আলোচনা করেন। পরবর্তীতে আধুনিক গণতন্ত্রের জনক জন লক 'টু ট্রিটিজেস অন সিভিল গভর্নমেন্ট' গ্রন্থে এবং অস্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসি দার্শনিক জ্যাঁ জ্যাক রুশো 'সোসাল কন্ট্রাক্ট' গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। মূলত এ তিনজনকেই সামাজিক চুক্তি মতবাদের তাত্ত্বিক বলা হয়। প্রাচীন গ্রিসের সোফিস্টগণ এ মতবাদে বিশ্বাস করতেন। প্লোটো, এরিস্টটলের লেখায়ও এ বিষয়ের ইঙ্গিত আছে।

হবসের সামাজিক চুক্তি মতবাদ

লেভীয়াথান গ্রন্থে ব্রিটিশ সমাজবিজ্ঞানী টমাস হবস সামাজিক চুক্তি মতবাদের ব্যাখ্যা দেন। হবস তাঁর ব্যাখ্যায় মানব চরিত্রের হতাশাবাদী ও স্বার্থপর চিত্র অঙ্কন করেন। হবসের মতে, মানুষ জড় পদার্থের বেশি কিছু নয়। স্বার্থপরতা দ্বারা সে পরিচালিত হয়। আকাঙ্ক্ষা ও বিতৃষ্ণা মানুষের সমস্ত কর্মকাণ্ডের মূল। মানুষ মাত্রই লোভী এবং আত্মকেন্দ্রিক। প্রকৃতির রাজ্য সম্পর্কে তার অভিমত, প্রকৃতির রাজ্যে সর্বক্ষণ যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করত। প্রকৃতির রাজ্যে মানুষের জীবন ছিল– নিঃসঙ্গ, হতভাগ্য, জঘন্য, পাশবিক ও সংক্ষিপ্ত। আদিম নৃশংসতা ছাড়া প্রকৃতির রাজ্যে কোন আইন ও ন্যায়বিচার ছিল না। এই অবস্থা থেকে মুক্তির জন্য প্রকৃতি রাজ্যের মানুষেরা নিজেদের অধিকার পরিত্যাগ করে শাসক কর্তৃপক্ষের কাছে (রাজার কাছে) তা হস্তান্তর করে। চুক্তি হয় জনগণের মধ্যে। রাজা বা শাসক চুক্তির অংশ নয়। যে কারণে চুক্তি ভঙ্গের অভিযোগ রাজার বিরুদ্ধে করা যাবে না। এভাবে হবসের সামাজিক চুক্তি মতবাদ সর্বাত্মকবাদী রাষ্ট্রের জন্ম দেয়। যেখানে রাজা বা শাসকের একচ্ছত্র ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়। কেননা চুক্তির ফলে জনগণের কোন অধিকার থাকে না রাজাকে নিয়ন্ত্রণ বা জবাবদিহি করার। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মতে, হবসের সামাজিক চুক্তি মতবাদ অনৈতিহাসিক, অযৌক্তিক এবং সর্বাত্মকবাদী রাষ্ট্রের নীল নকশা।

লকের সামাজিক চুক্তি মতবাদ

ব্রিটিশ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও আধুনিক গণতন্ত্রের জনক জন লক 'টু ট্রিটিজেস অন সিভিল গভর্নমেন্ট' গ্রন্থে সামাজিক চুক্তি মতবাদ বিশ্লেষণ করেছেন। হবসের মতো লকও প্রকৃতির রাজ্যের বর্ণনা দিয়েছেন। তবে লকের মতে, প্রকৃতির রাজ্যে প্রাকৃতিক আইন ছিল। মানুষ প্রাকৃতিক আইন মেনে চলত, তার মতে প্রকৃতির রাজ্য ছিল শান্তিময় ও সম্পদে পরিপূর্ণ। কিন্তু কালক্রমে প্রকৃতির রাজ্যে কিছুটা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। মানুষেরা নিজের ইচ্ছামত প্রকৃতির

আইন ব্যাখ্যা করতে থাকে। কেননা আইনের ব্যাখ্যা কিংবা প্রয়োগের জন্য কোন সাধারণ কর্তৃপক্ষ ছিল না। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য প্রকৃতির রাজ্যের অধিবাসীরা দুটি চুক্তি করে। প্রথম চুক্তি সম্পাদিত হয় আদিবাসীদের মধ্যে। তারা একটি সাধারণ কর্তৃপক্ষের কাছে ক্ষমতা ও অধিকার পরিত্যাগে সম্মত হয়। দ্বিতীয় চুক্তি করা হয় সমাজ পরিচালনার নিমিত্তে। সমাজ বা সম্প্রদায় শর্তসাপেক্ষে সরকারকে কিছু ক্ষমতা দান করে। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী সরকার জনগণের জীবন, সম্পদ ও স্বাধীনতা রক্ষা করবে। এসব শর্ত পূরণে সরকার ব্যর্থ হলে জনগণের অধিকার আছে সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার। এভাবে লক সামাজিক চুক্তির মাধ্যমে জনগণের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করেন।

রুশোর সামাজিক চুক্তি মতবাদ

ফরাসী দার্শনিক জ্যাঁ জ্যাক রুশো তার বিখ্যাত 'সোসাল কনট্রাক্ট' গ্রন্থে সামাজিক চুক্তি মতবাদ বর্ণনা করেছেন। রুশো একইসঙ্গে প্রকৃতির রাজ্যে এবং মানব প্রকৃতির বর্ণনা দিয়ে সামাজিক চুক্তি মতবাদ বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর মতে রাষ্ট্রপূর্ব অবস্থায় প্রকৃতির রাজ্য ছিল শান্তিময়। মানুষ সেখানে অবাধ সুখ ও শান্তিতে বসবাস করত। কিন্তু কালক্রমে সমাজে সম্পত্তির ধারণা বিস্তার লাভ করায় এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে বিবাদ দেখা দেয়। তার মতে, প্রকৃতির রাজ্যে মানুষ স্বাধীনভাবেই জন্ম নিত, কিন্তু সর্বত্র তাকে শৃঙ্খলিত দেখা যায়। এ অবস্থা থেকে মুক্তির জন্য মানুষ চুক্তির মাধ্যমে 'সাধারণ ইচ্ছার' কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের মাধ্যমে রাষ্ট্র সৃষ্টি করে। রুশোর মতে, সাধারণ ইচ্ছা সকলের ইচ্ছা নয়, তা হলো ন্যায়পূর্ণ ও কল্যাণময়ী ইচ্ছা।

সামাজিক চুক্তি মতবাদের গুরুত্ব ও প্রভাব

এ মতবাদের গুরুত্ব ও প্রভাব অনস্বীকার্য। প্রথমত, এ মতবাদ দ্বারাই রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত মধ্যযুগীয় ঐশ্বরিক মতবাদ ও বল প্রয়োগের মতবাদের প্রভাব হতে জনগণ মুক্তি লাভ করে। দ্বিতীয়ত, 'জনগণের চুক্তির ফল রাষ্ট্র'– এ মতবাদ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে হবস লক রুশো জনগণের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। তৃতীয়ত, এ মতবাদ রাজা বা শাসককে স্বৈরাচারী হতে দেয় না। কারণ শাসক জননিরাপত্তা দানে ব্যর্থ হলে, সকলের কল্যাণে আত্মনিয়োগ না করলে জনগণের অধিকার আছে শাসককে ক্ষমতাচ্যুত করার। চতুর্থত, এ মতবাদ সৃষ্টির শুরুতে আদিম সমাজ তথা প্রকৃতির রাজ্য যেমন ছিল তা বর্ণনা করে, যা মানুষের বিবর্তনকে বুঝতে সহায়তা করে। পঞ্চমত, সামাজিক চুক্তি মতবাদ ব্যক্তির সম্মত্তি প্রাপ্তির অধিকার ও স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দিয়েছে। যা বর্তমান কালেও খুবই প্রাসঙ্গিক। ষষ্ঠত, এ মতবাদ মধ্যযুগে ব্যক্তির চিন্তা-চেতনায় ব্যাপক প্রভাব ফেলে। এ কারণে ইংল্যান্ডে একচ্ছত্র রাজতন্ত্রের বদলে নিয়মতান্ত্রিক বা নামমাত্র রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ফ্রান্সে রাজতন্ত্রের পরিপূর্ণ বিলুপ্তি ঘটে প্রতিষ্ঠিত হয় আধুনিক গণতান্ত্রিক শাসন। শুধু অতীতকালে নয়, বর্তমানেও অনেক দেশের নিপীড়িত জনতার মুক্তির সংগ্রাম লক-রুশোর বাণী দ্বারা উজ্জিবিত।

সমালোচনা

সত্যিকার অর্থে, রাষ্ট্রের উৎপত্তির ক্ষেত্রে সামাজিক চুক্তি মতবাদ একটি কাল্পনিক ও মনগড়া মতবাদ। এর কোন বাস্তবিক ভিত্তি নেই। হেনরি মেইন এ মতবাদকে অসার, গ্রিন একে উপন্যাস, বেন্থাম প্রমোদধ্বনি, ভলটেয়ার বন্য এবং জুলেসলী মেইট্রি একে ভয়ংকর বলে আখ্যায়িত করেছেন। সঙ্গতকারণেই বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে একে সমালোচনা করা যায়। প্রথমত, এ মতবাদ ইতিহাস সম্পর্কিত নয়। প্রকৃতির রাজ্য ও তা থেকে উত্তরণের কোন সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক প্রমাণ চুক্তিবাদী তাত্ত্বিকরা উপস্থাপন করতে পারেননি। দ্বিতীয়ত, প্রকৃতির রাজ্যের প্রতারক, নৃশংস, স্বার্থপর মানুষ চুক্তি বলে রাতারাতি আইন মান্যকারী সুশৃঙ্খল মানুষে পরিণত হবে তা যুক্তিসঙ্গত নয়। তৃতীয়ত, হবস-লক-রুশো বর্ণিত প্রাকৃতিক অধিকার সত্যিকার অর্থে কোন অধিকার নয়, কেননা আইন-কানুন ও কর্তব্য বোধ ছাড়া অধিকার ভোগ করা সম্ভব নয়। চতুর্থত, চুক্তিবাদী দার্শনিকরাই চুক্তি মতবাদ সম্পর্কে পুরোপুরি একমত নয়। তাদের মধ্যে মতবাদ নিয়ে ভিন্নতা রয়েছে। কেননা চুক্তির দ্বারা হবস রাজার কাছে, লক জিম্মাদার এর কাছে আর রুশো সাধারণ ইচ্ছার কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। পঞ্চমত, সত্যিকার অর্থে সামাজিক চুক্তি মতবাদ শাসকের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করে। হবস সরাসরি তা বর্ণনা করেছেন রুশো 'সাধারণ ইচ্ছার' সার্বভৌত্বের কথা বলে প্রকারান্তে শাসকের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন। ষষ্ঠত, এ মতবাদ ভয়ঙ্কর ও রাষ্ট্রের জন্য হুমকি স্বরূপ। কেননা যারা চুক্তি দ্বারা রাষ্ট্রগঠন করতে পারে, তারা আবার আপন স্বার্থে রাষ্ট্রকে ভেঙ্গেও

দিতে পারেন। সপ্তমত, পরবর্তী প্রজন্ম সম্পর্কে এ মতবাদ স্পষ্ট করে কিছু বলেন। পরবর্তী প্রজন্ম যেহেতু চুক্তির অংশীদার নয়, সেহেতু তারা চুক্তি মানতে বাধ্য কিনা কিংবা তারা চুক্তির সুবিধা ভোগ করবে কিনা তা স্পষ্ট করে বলা হয়নি।

সারসংক্ষেপ

সামাজিক চুক্তি মতবাদ একটি কাল্পনিক মতবাদ। এ মতবাদের মূলকথা হলো- প্রকৃতির রাজ্যে মানুষ পরম শান্তিতে বসবাস করত। তারা প্রাকৃতিক আইন মেনে চলত। কিন্তু কালক্রমে সমাজে সম্মত্তির ধারণা বিস্তার লাভ করায় প্রাকৃতিক আইন নিয়ে মতভেদের কারণে সমাজ জীবনে বিশৃঙ্খলা ও যুদ্ধাবস্থা দেখা দেয়। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য মানুষ সামাজিক চুক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্র ও শাসক কর্তৃপক্ষ সৃষ্টি করে। টমাস হবস, জন লক ও জ্যাঁ জ্যাঁক রুশো সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে এ মতবাদ বর্ণনা করেন। মূলত, সামাজিক চুক্তি মতবাদের মধ্য দিয়েই রাষ্ট্র পরিচালনায় জনগণের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রসারিত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

(ক) নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। সামাজিক চুক্তি মতবাদের দার্শনিক কারা?
- (ক) বেন্থাম, লক, রুশো
- (খ) হবস, লক, রুশো
- (গ) গ্রিন, ভলটেয়ার, রুশো
- (ঘ) হবস, লক, ভলটেয়ার

২। 'সোসাল কন্ট্রাক্ট' গ্রন্থের লেখক কে?
- (ক) টমাস হবস
- (খ) জন লক
- (গ) জ্যাঁ জ্যাক রুশো
- (ঘ) হেনরি মেইন

৩। প্রকৃতির রাজ্য ছিল ভয়াবহ – এ কথা কে বলেছেন?
- (ক) টমাস হবস
- (খ) জ্যাঁ জ্যাক রুশো
- (গ) জন লক
- (ঘ) জেরেমী বেন্থাম

৪। জন লক কয়টি চুক্তির কথা বলেছেন?
- (ক) একটি
- (খ) দুটি
- (গ) তিনটি
- (ঘ) কোনটি নয়

৫। টমাস হবসের গ্রন্থের নাম–
- (ক) সোসাল কনট্রাক্ট
- (খ) লেভীয়াথান
- (গ) টু ট্রিটিক অন সিভিল গভর্নমেন্ট
- (ঘ) ডেমোক্রেসী

(খ) এক কথায় উত্তর দিন

১। সামাজিক চুক্তি মতবাদের তাত্ত্বিক কারা?
২। জন লকের গ্রন্থের নাম কি?
৩। রাজার সার্বভৌমত্বের কথা বলেছেন কে?
৪। জনগণের সার্বভৌমত্বের তত্ত্ব কে দিয়েছেন?
৫। সাধারণ ইচ্ছার ধারণা কার তত্ত্বে পাওয়া যায়?
৬। কেন সামাজিক চুক্তি করতে হলো?
৭। প্রকৃতির রাজ্য কেমন ছিল?

(ক) উত্তরমালা

১। (খ), ২। (গ), ৩। (ক), ৪। (খ), ৫। (গ)

পাঠ-৪ : ঐতিহাসিক বা বিবর্তনমূলক মতবাদ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- রাষ্ট্রের উৎপত্তির ক্ষেত্রে বিবর্তনবাদের মূল কথা আলোচনা করতে পারবেন
- এই মতবাদ যে রাষ্ট্রের উদ্ভবের ক্ষেত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ তা আলোচনা করতে পারবেন
- রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও বিকাশে বিভিন্ন প্রভাবক যেমন- রক্তের সম্পর্ক, ধর্মের বন্ধন, ব্যক্তিগত সম্পত্তি রাজনৈতিক চেতনার গুরুত্ব আলোচনা করতে পারবেন

ঐতিহাসিক বা বিবর্তনমূলক মতবাদ

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত মতবাদগুলোর মধ্যে এ মতবাদ সবচেয়ে আধুনিক, যুক্তিযুক্ত ও গ্রহণযোগ্য মতবাদ। বিবর্তনমূলক মতবাদের মাধ্যমেই রাষ্ট্রের উৎপত্তির সবচে সঠিক বর্ণনা পাওয়া যায়। এ মতবাদের মূল কথা হলো, রাষ্ট্র কোন একটি বিশেষ কারণে হঠাৎ করে সৃষ্টি হয়নি। বহু যুগের বিবর্তনের ফল রাষ্ট্র। পরিবার কিংবা সমাজ থেকে রাষ্ট্রের বিবর্তনে কতকগুলো উপাদান কাজ করেছে। অধ্যাপক গার্নার, বার্জেস, গেটেলসহ প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রাষ্ট্রের উদ্ভবের ক্ষেত্রে এ মতবাদকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে রায় দিয়েছেন। রাষ্ট্রের উৎপত্তির ব্যাপারে যে সকল উপাদান কাজ করেছে নিম্নে তা আলোচনা করা হলো :

(ক) **রক্তের সম্পর্ক :** রাষ্ট্র গঠনে অন্যতম প্রাচীন গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো রক্তের সম্পর্ক। কেননা পরিবারের ভিত্তি হলো রক্তের সম্পর্ক। পরিবার হতে গঠিত হয় গোষ্ঠী, অতঃপর গোত্র। আবার বিভিন্ন গোত্র মিলে গঠিত হয় উপজাতি। মানব বিকাশের এক পর্যায়ে উপজাতিই রূপান্তরিত হয় জাতিতে। সবশেষে জাতি থেকে সৃষ্টি হয় রাষ্ট্রের। রক্তের তথা গোষ্ঠী সম্পর্কই রাষ্ট্রের প্রতি ব্যক্তির আনুগত্য নিশ্চিত করে। রক্তের বন্ধন রাষ্ট্রে ঐক্যের বন্ধনের সূচনা করে।

(খ) **ধর্মের বন্ধন :** রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে ধর্মের বিশেষ প্রভাব রয়েছে। বৃহত্তর সমাজে গোষ্ঠী ও উপজাতির সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে রক্তের সম্পর্ক শিথিল হয়ে পড়ে। তখন ধর্ম সমাজে ঐক্য আনয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। আদিম সমাজে ধর্মীয় বিধানকে সবাই আইনের মতো মান্য করত। ধর্ম পালন ও ধর্মীয় প্রধানের শাসন ও আধিপত্য মেনে জনগণ একত্রিত হয়ে গঠন করত ধর্মীয় সমাজ বা সম্প্রদায়। পরবর্তীতে বিবর্তনের পথ ধরে বৃহত্তর ধর্মীয় সম্প্রদায় বা সমাজ রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হয়।

(গ) **যুদ্ধ-বিগ্রহ :** অপেক্ষাকৃত দুর্বল জাতির উপর আক্রমণ করে সবল জাতি প্রাধান্য বিস্তার করত। পরাজিত গোত্র বা উপজাতি বিজয়ীর প্রাধান্য মেনে নিত। আবার অনেক ক্ষেত্রে বিভিন্ন গোষ্ঠী একত্রিত হয়ে জোটবদ্ধভাবে বসবাস করত। তাদের জোটবদ্ধতার মূলে কাজ করত বৃহত্তর বা ক্ষমতাশালী গোত্রের আক্রমণের ভীতি। এভাবে যুদ্ধবিগ্রহের মাধ্যমে বিভিন্ন এলাকা ও উপজাতিদের দখল করে সবল জাতি তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে রাষ্ট্রের জন্ম দিয়েছে। আবার আক্রমণের ভীতিতে সন্ত্রস্তরা জোটবদ্ধ হলে সমাজ বিবর্তনের এক পর্যায়ে তা রাষ্ট্রে রূপ লাভ করেছে।

(ঘ) **অর্থনৈতিক প্রয়োজন :** আদিম সমাজের প্রাথমিক অবস্থায় মানুষ যাযাবর জীবন যাপন করত। জঙ্গলের ফল-মূল আর পশু-পাখি ছিল জীবিকা নির্বাহের প্রধান উপাদান। পরবর্তীতে পরিবার ও কৃষি ব্যবস্থার প্রবর্তনের পর ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণা বিকাশ লাভ করে। ব্যক্তিগত সম্পত্তি রক্ষার প্রয়োজন আইন কানুন তৈরি করা হয়। আপোষ-মীমাংসার জন্য গড়ে ওঠে বিচারালয়। ধীরে ধীরে অর্থনৈতিক কার্যকলাপের

নিমিত্তে গড়ে ওঠে রাষ্ট্র। মানুষই নিজেদের সুবিধার জন্য অর্থনৈতিক কারণকে সামনে রেখে রাষ্ট্র নামক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে। এ ব্যাপারে এরিস্টটল মন্তব্য করেছেন–মূলত অর্থনৈতিক প্রয়োজনের তাগিদে পরিবারগুলোর বৃদ্ধি ও বিকাশের স্বার্থে স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে রাষ্ট্র জন্মলাভ করেছে।

(ঙ) **রাজনৈতিক সচেতনতা :** মৌলিক চাহিদার নিশ্চয়তা আর জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তার সন্ধানে ব্যক্তির মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ ঘটে। ব্যক্তি উপলব্ধি করে, বৃহত্তর সমাজে সর্বজন গ্রাহ্য আইন-কানুন ছাড়া সামাজিক শান্তি রক্ষা করা সম্ভব নয়। জনগণের এই চেতনাবোধ তাদেরকে সুশৃঙ্খল ও ঐক্যবদ্ধ করে। যার চূড়ান্ত পরিণতি হিসেবে রাষ্ট্রের উদ্ভব। আবার বিভিন্ন পরাধীন জাতি নিজস্ব জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ হয়ে সম্মিলিত আন্দোলনের মাধ্যমে স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম দিয়েছে। এক্ষেত্রেও তাদের রাজনৈতিক সচেতনতা ও দেশপ্রেম মূল প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে।

সারসংক্ষেপ

রাষ্ট্রের উৎপত্তি কোন আকস্মিক ঘটনা নয়। ঐতিহাসিক বিবর্তনের পথে নানা উপাদানের প্রভাবে রাষ্ট্রের উৎপত্তি ঘটেছে। রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত বিবর্তনবাদ বা ঐতিহাসিক মতবাদের মূল কথা হলো– কোন একটি বিশেষ কারণে রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়নি। রক্তের সম্পর্ক, ধর্মের বন্ধন, যুদ্ধ-বিগ্রহ, অর্থনৈতিক প্রয়োজন, রাজনৈতিক সচেতনতার সংমিশ্রণে রাষ্ট্র নামক সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠনের জন্ম। বিবর্তনবাদকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত মতবাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, যুক্তিযুক্ত ও সর্বজন গ্রাহ্য বলে বর্ণনা করেছেন। সুতরাং রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত মতবাদগুলোর মধ্যে ঐতিহাসিক বা বিবর্তনমূলক মতবাদই বৈজ্ঞানিক ও যৌক্তিক মতবাদ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

(ক) নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত মতবাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কোনটি?
(ক) সামাজিক চুক্তি মতবাদ (খ) বল প্রয়োগ মতবাদ
(গ) ঐশ্বরিক মতবাদ (ঘ) ঐতিহাসিক মতবাদ

২। ঐতিহাসিক মতবাদকে শ্রেষ্ঠ বলেছেন কে?
(ক) জ্যাঁ জ্যাক রুশো (খ) অধ্যাপক গার্নার
(গ) অধ্যাপক লাস্কি (ঘ) টমাস হবস

৩। রাষ্ট্রের উৎপত্তির ক্ষেত্রে রক্তের সম্পর্কের কথা কোন মতবাদে বলা হয়েছে?
(ক) সামাজিক চুক্তি মতবাদ (খ) বল প্রয়োগ মতবাদ
(গ) ঐতিহাসিক মতবাদ (ঘ) ঐশ্বরিক মতবাদ

(খ) এক কথায় উত্তর দিন

১। ঐতিহাসিক বা বিবর্তনমূলক মতবাদের সার কথা কি?
২। এই মতবাদ কোন ধরনের মতবাদ?
৩। কোন কোন উপাদান বিবর্তনমূলক মতবাদের অন্তর্ভুক্ত?
৪। এই মতবাদকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলেছেন কোন কোন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী?

(ক) উত্তরমালা

১। (ঘ), ২। (খ), ৩। (গ)

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. বিধাতার সৃষ্টি মতবাদের মূল কথা কি?
২. সমালোচনাসহ বিধাতার সৃষ্টি মতবাদের গুরুত্ব বর্ণনা করুন।
৩. বল প্রয়োগ মতবাদের মূল কথা সংক্ষেপে লিখুন।
৪. সামাজিক চুক্তি মতবাদের সার কথা কি?
৫. রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত সঠিক মতবাদ কোনটি?
৬. ঐতিহাসিক মতবাদ বলতে কি বুঝায়?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত বিধাতার সৃষ্টি মতবাদ আলোচনা করুন।
২. গুরুত্ব, প্রভাব ও সমালোচনাসহ বল প্রয়োগ মতবাদ বর্ণনা করুন।
৩. সামাজিক চুক্তি মতবাদটি সমালোচনাসহ আলোচনা করুন।
৪. রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত ঐতিহাসিক মতবাদের গুরুত্ব ও প্রভাব আলোচনা করুন।

ইউনিট ৬

রাষ্ট্র

ভূমিকা

প্রতিটি নাগরিকের কাছে রাষ্ট্র একটি পরিচিত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। রাষ্ট্র শুধুমাত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান নয়, ভৌগোলিক প্রতিষ্ঠানও বটে। মানুষ কোন না কোন রাষ্ট্রের নাগরিক। রাষ্ট্র বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। রাষ্ট্র হচ্ছে নাগরিক জীবনের সর্বোচ্চ ও শক্তিশালী রাজনৈতিক একক। মানুষকে বলা হয় সমাজিক ও রাজনৈতিক জীব। রাষ্ট্রের মুখপাত্র হিসেবে সরকার রাষ্ট্র পরিচালনা করে। অতীতে রাষ্ট্র এবং সরকারের মাধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করা হত না। ধীরে ধীরে শব্দটি পৃথক অর্থ ধারণ করেছে এবং পূর্ণাঙ্গ রূপ পেয়েছে। অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্য নিয়েই মানুষ রাষ্ট্র নামক সংগঠনের সৃষ্টি করেছে। বর্তমান ইউনিটে নিম্নোক্ত পাঠগুলো আলোচনা করা হলে :

পাঠ-১ : রাষ্ট্রের সংজ্ঞা ও উপাদান।

পাঠ-২ : রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও কার্যাবলি।

পাঠ-১ : রাষ্ট্রের সংজ্ঞা ও উপাদান

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- রাষ্ট্রের সংজ্ঞা বলতে পারবেন ।
- রাষ্ট্রের উপাদানগুলো ব্যাখ্যা দিতে পারবেন ।
- রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও কার্যাবলির বর্ণনা করতে পারবেন ।

রাষ্ট্রের সংজ্ঞা

বিভিন্ন লেখক ও রাষ্ট্রচিন্তাবিদগণ বিভিন্নভাবে রাষ্ট্রের সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন । রাষ্ট্রের সভ্য হিসেবেই নাগরিক জীবনের শুরু । এরিস্টটলের মতে, "রাষ্ট্র হচ্ছে কয়েকটি পরিবার ও গ্রামের সমষ্টি, যার উদ্দেশ্য স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবন ।" এরিস্টটলের সংজ্ঞা নগররাষ্ট্র ভিত্তিক । বর্তমানকালে নগররাষ্ট্রের অস্তিত্ব নেই । আধুনিক রাষ্ট্র প্রধানত: জাতী রাষ্ট্র । তাই আধুনিক যুগে রাষ্ট্র সম্পর্কিত সংজ্ঞার পরিধি বিস্তৃত হয়েছে ।

ব্লুন্টসলির মতে, "কোন নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে রাজনৈতিক ভাবে সংগঠিত জনসমাজই হলো রাষ্ট্র ।"

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সাবেক প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন বলেন, "কোন নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংগঠিত জনগোষ্ঠীকে রাষ্ট্র বলে ।"

অধ্যাপক বার্জেস– এর মতে, "রাষ্ট্র হচ্ছে মানবজাতির সেই সংঘবদ্ধ অংশ, যা ঐক্যবদ্ধভাবে সংগঠিত ।" লাস ওয়েল ও কাপান এর মতে, "সার্বভৌম ভূখণ্ডভিত্তিক গোষ্ঠীই হচ্ছে রাষ্ট্র ।" অধ্যাপক জে.এন.গার্নার এর মতে, "রাষ্ট্র হচ্ছে এমন এক জনসমাজ যা সংখ্যায় অল্পাধিক বা বিপুল এবং কোন নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে স্থায়ীভাবে বসাবাস করে, যা বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণ থেকে স্বাধীন বা প্রায় স্বাধীন এবং যার একটি সংগঠিত সরকার রয়েছে, যার প্রতি অধিকাংশ অধিবাসী স্বাভাবিকভাবে অনুগত ।

সুতরাং রাষ্ট্র বলতে সেই জনসমষ্টিকে বোঝায়, যারা কোনো নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমানায় বসবাস করে, যাদের একটি সরকার আছে সর্বোপরি যারা বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণ হতে সর্বোতভাবে মুক্ত থাকে ।

রাষ্ট্রের উপাদান

রাষ্ট্রের সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে রাষ্ট্রের ৪টি উপাদান পাওয়া যায় । যথা–

(ক) জনসমষ্টি (খ) নির্দিষ্ট ভূখণ্ড (গ) সরকার (ঘ) সার্বভৌমত্ব ।

ক. স্থায়ী জনসমষ্টি : জনসমষ্টি রাষ্ট্রের প্রথম ও প্রধান উপাদান । জনসমষ্টি ছাড়া রাষ্ট্রের কথা ভাবা যায় না । আবার তেমনি জনসমষ্টির জন্যই রাষ্ট্র নামক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানটির সৃষ্টি হয়েছে । মানুষ তার নিজস্ব প্রয়োজনেই রাষ্ট্র গঠন করেছে । জনমানবহীন রাষ্ট্র কল্পনা করা যায় না । কোন ভূখণ্ডে নাগরিকগণ স্থায়ীভাবে বসবাস করলে সেই জনসমষ্টিকে নিয়ে রাষ্ট্র গঠিত হতে পারে । জনসংখ্যা কম বা বেশি হতে পারে । তবে রাষ্ট্রের জনসংখ্যা কম হলেও রাষ্ট্রের অস্তিত্বের কোন সমস্যা হয় না । যেমন চীনের জনসংখ্যা প্রায় একশ' তিরিশ কোটি আবার বাংলাদেশের জনসংখ্যা প্রায় ১৬ কোটি । আবার কোন রাষ্ট্রে এক নৃ-তাত্ত্বিক জনসমষ্টি থাকতে হবে এমন কথাও নয় । একটি রাষ্ট্রের জনসংখ্যা রাষ্ট্রের প্রয়োজন ও সম্পদের সংগে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া উচিত । রাষ্ট্রের প্রশাসন ও উন্নয়নমূলক কাজ পরিচালনার জন্য চলনসই জনসমষ্টি থাকলেই রাষ্ট্র গঠিত হতে পারে ।

খ. নির্দিষ্ট ভূখণ্ড : রাষ্ট্রের দ্বিতীয় উপাদান নির্দিষ্ট ভূখণ্ড । নির্দিষ্ট ভূখণ্ড বলতে শুধু স্থলভাগকে বোঝায় না । নির্দিষ্ট ভূখণ্ড বলতে নির্দিষ্ট কোন ভৌগোলিক সীমানার স্থলভাগ, নদ-নদী, আন্তর্জাতিক স্বীকৃত সাগর ও মহাসাগরের সীমানা এর উপরিভাগের বায়ুমণ্ডলকে বোঝায় ।

ভূখণ্ড ছাড়া রাষ্ট্র কল্পনা করা যায় না । যাযাবর জাতি শুধুমাত্র নিদিষ্ট ভূখণ্ডের অভাবে রাষ্ট্র গঠন করতে সমর্থ হয়নি । জনসমষ্টির মত ভৌগোলিক সীমারেখার ক্ষেত্রেও কোন বাঁধা ধরা নিয়ম নেই । রাষ্ট্র ছোট বা বড় দুই-ই হতে পারে । যেমন– নেদারল্যাণ্ডের আয়তন মাত্র সাড়ে বার হাজার বর্গমাইল, কিন্তু ভারতের আয়তন প্রায় সাড়ে বার লাখ বর্গমাইল । সুতরাং আয়তন যাই হোক না কেন, রাষ্ট্রের অবশ্যই নির্দিষ্ট ভূখণ্ড থাকতে হবে ।

গ. সরকার : সরকার জনগণের মুখপাত্র। সরকার রাষ্ট্র পরিচালনা করে। রাষ্ট্র গঠনের জন্য একটি সুসংগঠিত সরকার প্রয়োজন যার মাধ্যমে জনগণ এবং রাষ্ট্রের ইচ্ছা-অনিচ্ছা প্রকাশিত ও কার্যকর হবে। নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বসবাস করা বৃহৎ জনগোষ্ঠীর একটি ক্ষুদ্র অংশ নিয়ে সরকার গঠিত হবে। সরকার গঠিত হয় আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগকে নিয়ে। তবে সরকারের রূপ বা প্রকৃতি সকল রাষ্ট্রে একরূপ নয়, ফলে বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিভিন্ন ধরনের সরকার দেখা যায়। যেমন : সংসদীয় সরকার, রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ইত্যাদি।

ঘ. সার্বভৌমত্ব : রাষ্ট্র গঠনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো সার্বভৌমত্ব। সার্বভৌমত্ব বলতে রাষ্ট্রের চূড়ান্ত ক্ষমতাকে বোঝায়। শুধু স্থায়ী জনসমষ্টি, নির্দিষ্ট ভূখণ্ড এবং সরকার থাকলে রাষ্ট্র হয় না। এ তিনটি নির্দিষ্ট উপাদানের ভিত্তিতে ২৬ মার্চ, ১৯৭১ এর আগে আমরা বাংলাদেশ রাষ্ট্র গঠন করতে পারিনি। যখন পূর্ববাংলার জনগণের পক্ষে ঐতিহাসিকভাবে গণসমর্থনে প্রাপ্ত পরম রাজনৈতিক কর্তৃত্বে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা তথা সার্বভৌমত্ব ঘোষণা করেন তখন এই চতুর্থ উপাদানের সংযোগে বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। সার্বভৌম ক্ষমতা না থাকার জন্য কোন রাষ্ট্রের অন্তর্গত প্রদেশ রাষ্ট্র নয়। আন্তর্জাতিক সংঘ বা প্রতিষ্ঠানগুলো রাষ্ট্র নয়। এমনকি জাতিসংঘও রাষ্ট্র নয়।

সার্বভৌম ক্ষমতার দুটি দিক রয়েছে–

১। সার্বভৌম ক্ষমতা রাষ্ট্র অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করে।

২। সার্বভৌম ক্ষমতা দেশকে বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণ হতে মুক্ত রাখতে পারে।

সারসংক্ষেপ

রাষ্ট্র একটি রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক প্রতিষ্ঠান। রাষ্ট্রের মাধ্যমে মানুষ নাগরিক জীবন শুরু করে। কারণ মানুষ সামাজিক ও রাজনৈতিক জীব। প্রত্যেকটি মানুষ কোন না কোন রাষ্ট্রের সদস্য। রাষ্ট্র হচ্ছে নাগরিক জীবনের অন্যতম একটি সংঘ। সভ্যতার বিকাশে মানুষ যত রকম সংঘ গঠন করছে তার মধ্যে সর্বোচ্চ এবং শক্তিশালী সংঘ হচ্ছে রাষ্ট্র। রাষ্ট্রের ৪টি উপাদান রয়েছে– (১) জনসমষ্টি (২) নির্দিষ্ট ভূখণ্ড (৩) সরকার ও (৪) সার্বভৌমত্ব। এই চারটি উপাদান রাষ্ট্রের জন্য অপরিহার্য। এর কোন একটি না থাকলে রাষ্ট্র গঠিত হতে পারে না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

(ক) নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। রাষ্ট্র কোন ধরনের প্রতিষ্ঠান?

(ক) ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান (খ) সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান (গ) রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান (ঘ) অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান।

২। রাষ্ট্রের উপাদান কোনটি?

(ক) নির্দিষ্ট ভূখণ্ড (খ) বনভূমি (গ) নদীনালা (ঘ) কোনটি নয়

৩। রাষ্ট্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান কোনটি?

(ক) নির্দিষ্ট ভূখণ্ড (খ) জনসমষ্টি (গ) সার্বভৌমত্ব (ঘ) সরকার

(খ) এক কাথায় উত্তর দিন

১। রাষ্ট্র কোন ধরনের প্রতিষ্ঠান?

২। রাষ্ট্রের সবচেয়ে সুন্দর ও গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা দিয়েছেন কে?

৩। রাষ্ট্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান কোনটি?

৪। বাংলাদেশের জনসংখ্যা কত?

৫। চীনের জনসংখ্যা কত?

(ক) উত্তরমালা : ১। (গ), ২। (ক), ৩। (গ)

(খ) ১। রাজনৈতিক, ২। গার্নার, ৩। সার্বভৌমত্ব, ৪। ১৬ কোটি, ৫। ১৩০ কোটি

পাঠ-২ : রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও কার্যাবলি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য কি তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন ।
- রাষ্ট্রের অপরিহার্য কাজগুলো বর্ণনা করতে পারবেন ।
- রাষ্ট্রের ঐচ্ছিক কাজগুলো সম্পর্কে বলতে পারবেন ।

রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য

রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও কার্যাবলি নিয়ে বিভিন্ন চিন্তাবিদগণ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করেছেন । কারো মতে, রাষ্ট্রের মাধ্যমেই ব্যক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটান সম্ভব । কারণ রাষ্ট্র ছাড়া ব্যক্তিকে কল্পনা করা যায় না । আদর্শবাদী দার্শনিকগণ রাষ্ট্রকে চরম লক্ষ্য হিসেবে দেখিয়েছেন । আবার কারো কারো মতে, রাষ্ট্র সব কিছুর মূল । অধ্যাপক লাস্কী বলেন, "রাষ্ট্র এমন একটি সংগঠন যা জনগণকে সামাজিক কল্যাণের জ্ঞান দান করে ।" অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্য নিয়েই মানুষ রাষ্ট্র নামক সংগঠনের সৃষ্টি করেছে ।

রাষ্ট্রের কার্যাবলি

রাষ্ট্রের কার্যাবলি নিচে আলোচনা করা হলো :

অধ্যাপক গেটেল ও উইলোবী রাষ্ট্রের অপরিহার্য কার্যাবলি ও ঐচ্ছিক বা গৌণ কার্যাবলির কথা বলেছেন ।

(ক) অপরিহার্য কাজ : যেসব কার্য নাগরিকদের জীবন, সম্পত্তি অধিকার, স্বাধীনতা সাথে জড়িত থাকে সেগুলোকে অপরিহার্য কার্যাবলি বলে । রাষ্ট্রের অপরিহার্য কাজগুলো হলো :

১ । **দেশ রক্ষা :** দেশকে রক্ষা করার জন্য রাষ্ট্রের শক্তিশালী প্রতিরক্ষা বাহিনী থাকে । যেমন : সামরিক বাহিনী, বিমান বাহিনী, নৌ-বাহিনী, পুলিশবাহিনী । এসব বাহিনীর সমন্বয়ে প্রতিরক্ষা বাহিনী গড়ে তোলে এবং প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও সাহায্য সহযোগিতা করে ।

২ । **প্রশাসন সংক্রান্ত কার্যাবলি :** রাষ্ট্রের স্থায়ী প্রশাসনিক কর্মচারী ও কর্মকর্তা থাকে । এরা রাষ্ট্রের দৈনন্দিন কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে থাকে । এসব কর্মচারীদের নিয়োগ ও পরিচালনা করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব । রাষ্ট্র খাজনা ও কর আদায় করে এবং মুদ্রা ব্যবস্থা পরিচালনা করে ।

৩ । **অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা :** অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা রক্ষা করা রাষ্ট্রের অবশ্য কর্তব্য । রাষ্ট্রে চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, কোন্দল, জনগণের জান-মালের নিরাপত্তা বিধান করা রাষ্ট্রের অন্যতম কর্তব্য । এর জন্য রাষ্ট্র পুলিশ ও অন্যান্য বাহিনী গঠন ও পরিচালনা করে ।

৪ । **আর্থিক কার্যাবলি :** খাজনা ও কর নির্ধারণ এবং আদায় ও ব্যয় করা রাষ্ট্রের কর্তব্য । রাষ্ট্র বার্ষিক আয়-ব্যয়ের বাজেট প্রণয়ন, মুদ্রা প্রবর্তন ও মুদ্রা বিনিয়োগের ব্যবস্থা করে থাকে ।

৫ । **আইন সংক্রান্ত কার্যাবলি :** রাষ্ট্র আইন প্রণয়ন, আইনের প্রয়োগ, আইনের ব্যাখ্যা প্রভৃতি কার্য সম্পাদন করে । রাষ্ট্রকে এ কার্য সম্পাদন করতে হলে জনপ্রতিনিধি নির্বাচন, বিচারক নিয়োগ, সিভিল ও পুলিশ কর্মচারীদের ব্যবস্থা করতে হয় । প্রয়োজনে রাষ্ট্র সংবিধান সংরক্ষণ, কার্য প্রণয়ন এবং আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পরিবর্তন করে ।

৬ । **বিচার সংক্রান্ত :** শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার জন্য রাষ্ট্র আদালত গঠন ও পরিচালনা করে ।

৭। **পররাষ্ট্র সংক্রান্ত কার্যাবলি :** আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নির্ধারণ ও সংরক্ষণ রাষ্ট্রের কাজ। রাষ্ট্র বিদেশে কূটনৈতিক প্রতিনিধি প্রেরণ করে। তাছাড়া বিদেশ থেকে আগত কূটনৈতিক প্রতিনিধি গ্রহণ করে থাকে। এছাড়া আন্তর্জাতিক শক্তি সংহতি ও প্রগতি বজায় রাখার জন্য সব রাষ্ট্রের সাথে রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, বাণিজ্যিক ও সামরিক চুক্তি সম্পাদন ও বাস্তবায়ন করে থাকে।

তা'ছাড়া অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্যও রাষ্ট্র কতকগুলো কাজ অপরিহার্যভাবে করে। যেমন কর ও শুল্ক ধার্য এবং আদায়ের ব্যবস্থা, সরকারি কর্মচারীদের বেতনাদির ব্যবস্থা ইত্যাদি। এছাড়া মুদ্রানীতি সংক্রান্ত কাজও রাষ্ট্রের অপরিহার্য কাজ বলে গণ্য হয়।

৮। **ঐচ্ছিক কাজ :** স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে নাগরিকদের জীবনের বহুমুখী উন্নয়ন সাধনের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র যে কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকে সেগুলোকে রাষ্ট্রের ঐচ্ছিক কাজ হিসেবে ধরা যায়। ঐচ্ছিক কাজগুলো নিম্নে আলোচনা করা হলো :

(১) **শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যাবলি :** শিক্ষা বিস্তার করা রাষ্ট্রের ঐচ্ছিক কাজ, এজন্য সরকার স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, মাদ্রাসা বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে। এছাড়া নারী শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষার ব্যবস্থা করে নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি ও প্রকল্প গ্রহণ করে থাকে। শিক্ষাকে সুলভ, শিক্ষা ব্যয় হ্রাস, শিক্ষা ব্যবস্থাকে জীবনের উপযোগী করে তোলার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

(২) **স্বাস্থ্য সংরক্ষণ :** আধুনিক কল্যাণমূলক রাষ্ট্র জনস্বার্থ রক্ষার জন্য হাসপাতাল, দাতব্য চিকিৎসালয়, শিশু সদন, পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র, মাতৃমঙ্গল কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনা করে থাকে। রাষ্ট্র মহামারী রোগের প্রতিষেধক টিকা, ইনজেকশন, বিশুদ্ধ পানীয়জলের কূপ, নলকূপ নির্মাণ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালায়। কারণ সুস্থ দেহ ও মন ছাড়া একটি সুস্থ জাতি আশা করা যায় না।

(৩) **দরিদ্র কল্যাণ সংক্রান্ত :** লেখাপড়ার জন্য রাষ্ট্র বিভিন্নভাবে কাজ করে থাকে। বিনামূল্যে দারিদ্র্যদের বই-পুস্তক প্রদান, অর্থ প্রদান, বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ করে থাকে।

(৪) **শিল্প ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত :** রাষ্ট্র শিল্প বিকাশের উদ্দেশ্যে শিল্পোদ্যোক্তাদের উৎসাহ প্রদান, শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিচালনার দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করে থাকে। বৈদেশিক বাণিজ্য ও সম্প্রসারন রাষ্ট্রীয় কার্যের আওতাধীন। এছাড়া জনসাধারণের সুবিধার জন্য ব্যাংক, বীমা প্রতিষ্ঠা করে এবং পুঁজি বিনিয়োগের উৎসাহ যোগায়।

(৫) **উন্নয়নমূলক কার্যাবলি :** জনগণের কল্যাণের জন্য রাষ্ট্র অনেক ধরনের সমাজকল্যাণমূলক ও জনহিতকর কাজ করে থাকে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, সাহায্য ও পুনর্বাসন, দুর্ভিক্ষ ও মহামারি প্রতিরোধের জন্য রাষ্ট্র সময়োপযোগী ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে।

(৬) **সামাজিক নিরাপত্তা :** আধুনিক জনকল্যাণকর রাষ্ট্র অবসরপ্রাপ্তদের পেনসন, কল্যাণ ভাতা, যৌথ বীমা, বৃদ্ধদের জন্য ভাতা, বেকারদের জন্য ভাতা, এতিম ও দু:স্থদের সাহায্য, গৃহহীনদের জন্য আশ্রয় প্রদান করে থাকে।

(৭) **অসহায় নারীদের সাহায্য প্রদান :** দুঃস্থ, বৃদ্ধ ও মহিলাদের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানের নিশ্চয়তা বিধান করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব।

(৮) **শ্রমিক কল্যাণ :** আধুনিক কল্যাণকর রাষ্ট্র শ্রমিকদের কাজের সময়, মেয়াদ ও মজুরী নির্ধারণ করে থাকে। এছাড়া শ্রমিক বিরোধ নিস্পত্তির জন্য মজুরি বোর্ড ও শ্রম আদালত স্থাপন করে থাকে।

তাছাড়া জনগণের কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য রাষ্ট্র বিভিন্ন কাজ করে থাকে। যেমন– রাস্তাঘাট নির্মাণ, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, ডাক, তার, পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস প্রভৃতির ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। এছাড়া চিত্তবিনোদনের

জন্য ব্যায়ামাগার, খেলার মাঠ, কমিউনিটি সেন্টার, গ্রন্থাগার নির্মাণ এবং রেডিও-টেলিভিশনে আনন্দদায়ক ও শিক্ষণীয় অনুষ্ঠান প্রচার করে থাকে ।

সারসংক্ষেপ

রাষ্ট্র সব সময়ই জনগণের কল্যাণের জন্য কাজ করে থাকে । রাষ্ট্রের কার্যাবলিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় । যেমন– অপরিহার্য কার্যাবলি ও ঐচ্ছিক কার্যাবলি । অপরিহার্য কার্যাবলি হচ্ছে, যা নাগরিকদের জীবন, সম্পত্তি, অধিকার, স্বাধীনতা ও রাষ্ট্রীয় অস্তিত্বের সাথে জড়িত সেগুলো । আর জনগণের কল্যাণ সাধন ও উন্নত জীবনের নিশ্চয়তা প্রদানের লক্ষে রাষ্ট্র যে সব কল্যাণকর কাজ করে থাকে তাকে ঐচ্ছিক কাজ বলে ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

(ক) নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১ । কোন ভূখণ্ডে রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত জনসমাজকে রাষ্ট্র বলেছেন?
(ক) টি.এইচ গ্রিন (খ) জনলক (গ) অধ্যাপক লাস্কি (ঘ) ব্লুন্টস্‌লি ।

২ । রাষ্ট্র হচ্ছে মানব জাতির সংঘবদ্ধ অংশ কে বলেছেন?
(ক) অধ্যাপক বার্জস (খ) জে.এন গার্নার (গ) হেগেল (ঘ) টি.এইচ.গ্রিন

৩ । রাষ্ট্রের অপিরিহার্য কাজ কোনটি?
(ক) শিক্ষা বিস্তার (খ) দেশরক্ষা (গ) শ্রমিক কল্যাণ (ঘ) সামাজিক নিরাপত্তা

৪ । রাষ্ট্রের ঐচ্ছিক কাজ কোনটি?
(ক) দেশরক্ষা (খ) শিক্ষা বিস্তার (গ) প্রশাসন পরিচালনা (ঘ) পররাষ্ট্র বিষয়ক

(ক) উত্তর মালা

১ । (গ), ২ । (ক), ৩ । (খ), ৪ । (ঘ)

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১ । রাষ্ট্র কি?
২ । রাষ্ট্রের উপাদান কয়টি ও কি কি?
৩ । সার্বভৌমত্ব বলতে কি বোঝেন?
৪ । সরকার কাকে বলে?

রচনামূলক প্রশ্ন

১ । রাষ্ট্রের সংজ্ঞা দিন । রাষ্ট্রের উপাদানগুলো আলোচনা করুন ।
২ । রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিস্তারিত লিখুন ।
৩ । রাষ্ট্রের কার্যাবলিকে কয়ভাগে ভাগ করা যায়? রাষ্ট্রের অপরিহার্য কার্যাবলি সম্পর্কে আলোচনা করুন ।
৪ । রাষ্ট্রের ঐচ্ছিক কার্যাবলি সম্পর্কে ব্যাখ্যা করুন ।

ইউনিট ৭

নাগরিকতা

ভূমিকা

মানুষ সমাজে বাস করে। সমাজে বাস করা তার সহজাত প্রবৃত্তি। শাব্দিক অর্থে নগরের অধিবাসীকে নাগরিক বলে। পৌরনীতিতে নাগরিক শব্দের বিশেষ অর্থ রয়েছে। একটি রাষ্ট্রের সমাজের সদস্য হিসেবে মানুষ যে পরিচিতি, মর্যাদা, অধিকার পেয়ে থাকে তাকে নাগরিকতা বলে। অতএব বলা যায়, নাগরিকতা প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রের সদস্য হিসেবে ব্যক্তির অর্জিত পরিচিতি, গুণাবলি, সম্মান ও অধিকার। নাগরিক যদি যথাযথভাবে তার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে তাহলে তার নাগরিকতার মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মতে, "সেই ব্যক্তি নাগরিক যে কোন রাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাস করে, রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে, রাষ্ট্র প্রদত্ত সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করে এবং রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে।"

বর্তমান ইউনিটে নিম্নোক্ত পাঠগুলো আলোচনা করা হলো :

পাঠ-১ : নাগরিকতা ও নাগরিকতা অর্জনের পদ্ধতি।
পাঠ-২ : নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য।
পাঠ-৩ : সুনাগরিকের গুণাবলি।
পাঠ-৪ : দ্বৈত নাগরিকতা, নাগরিকতার বিলোপ এবং নাগরিক ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক।

পাঠ–১ : নাগরিকতা ও নাগরিকতা অর্জনের পদ্ধতি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- নাগরিকতার সংজ্ঞা বলতে পারবেন ।
- নাগরিকতা কি ব্যাখ্যা করতে পারবেন ।
- নাগরিকতা অর্জনের পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন ।

নাগরিকতার সংজ্ঞা

জাতীয় রাষ্ট্রের উদ্ভবের ফলে নাগরিকতার সংজ্ঞা বৃদ্ধি পেয়েছে । এখন নাগরিকতা নগরকে কেন্দ্র করে সংজ্ঞায়িত হয় না, জাতীয় রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করে হয় । যেমন- বাংলাদেশের নাগরিক, ভারতের নাগরিক । বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ বিভিন্ন সময়ে নাগরিকের সংজ্ঞা দিয়েছেন । অধ্যাপক লাস্কির ভাষায়, "জনকল্যাণের নিমিত্তে নিজের জ্ঞান-বুদ্ধি সম্পন্ন অভিমতের প্রয়োগই হলো নাগরিকতা ।"

কেলসনের ভাষায়, "কোন রাষ্ট্রের সদস্য হিসেবে ব্যক্তির সম্মান ও পদমর্যাদাই নাগরিকতা ।"

রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ভ্যাটেল এর মতে, "নাগরিক হচ্ছে রাজনৈতিক সমাজের সেসব সদস্য যারা উক্ত সমাজের প্রতি কর্তব্য পালনে বাধ্য থাকে এবং সে সমাজ থেকে সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা লাভের অধিকারী হয় । আধুনিক নাগরিকতার ধারণায় নাগরিকের সংজ্ঞা থেকে নাগরিকতার চারটি বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় । (ক) রাষ্ট্রের সদস্য হতে হয়, (খ) রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করতে হয়, (গ) রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য পালন করতে হয়, (ঘ) সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করতে হয় ।

নাগরিকতা অর্জনের দুটি পদ্ধতি রয়েছে–

(ক) জন্মসূত্রে নাগরিক, (খ) অনুমোদনসূত্রে নাগরিক ।

জন্মসূত্রে নাগরিককে দুই ভাগে ভাগ করা যায় ।

১ । জন্মনীতি, ২ । জন্মস্থান নীতি ।

(ক) জন্মসূত্রে নাগরিক

১ । জন্মনীতি : সন্তান যেখানেই জন্মগ্রহণ করুক না কেন পিতা-মাতার নাগরিকত্বের দ্বারা সন্তানের নাগরিকত্ব নির্ধারিত হয় । অর্থাৎ পিতা-মাতা যে রাষ্ট্রের নাগরিক, সন্তান সে রাষ্ট্রের নাগরিক বলে বিবেচিত হবে । অর্থাৎ বৈবাহিক সম্পর্ক ও রক্তের বন্ধনের উপর ভিত্তি করে জন্মনীতি গড়ে ওঠে । যেমন- বাংলাদেশের নাগরিক যদি জাপানে জন্মগ্রহণ করে তবে সে এ নীতি অনুযায়ী বাংলাদেশী নাগরিক হিসেবে গণ্য হবে । চীন, রাশিয়া, ফ্রান্স, জাপান, যুক্তরাজ্য, ইতালি, অষ্ট্রেলিয়া এ নীতি অনুসরণ করে । অর্থাৎ নাগরিক যেখানেই জন্মগ্রহণ করুক না কেন, রক্তের সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে নাগরিকত্ব নির্ধারিত হয় । এক কথায় বোঝা যায়, এ নীতি অনুযায়ী পিতা-মাতার নাগরিকত্বই সন্তানের নাগরিকত্ব ।

২ । জন্মস্থান নীতি : এ নীতি নির্ধারিত হয় জন্মস্থানের উপর ভিত্তি করে । সন্তান যে স্থান জন্মগ্রহণ করবে তার উপর ভিত্তি করে নাগরিকতা নির্ধারিত হবে । যেমন- ব্রিটিশ নাগরিকের সন্তান আমেরিকায় অথবা আমেরিকার পতাকাবাহী কোন জাহাজে জন্মগ্রহণ করলে সে আমেরিকার নাগরিকত্ব লাভ করবে । আমেরিকায় এ নীতি অনুসরণ করা হয় । অর্থাৎ জন্মস্থান নীতিতে পিতা-মাতার নাগরিকতা অনুযায়ী সন্তানের নাগরিকত্ব নির্ধারণ করা হয় না ।

(খ) অনুমোদনসূত্রে নাগরিকতা অর্জন

১। অনুমোদনসূত্রে নাগরিকতা কয়েকটি শর্ত সাপেক্ষে অর্জন করা যায়। এসব শর্ত বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রূপে হয়। এ ধরনের নাগরিকতা অর্জনকে অনুমোদনসূত্রে নাগরিকতা বলে। নিম্নে অনুমোদনসূত্রে নাগরিকতা অর্জনের উপাদান আলোচনা করা হলো–

(ক) যে রাষ্ট্রের নাগরিক হতে ইচ্ছুক সে রাষ্ট্রে বিবাহ করতে হবে।

(খ) কোন রাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে হবে।

(গ) সরকারি চাকরি লাভ করতে হয়।

(ঘ) সেনাবাহিনীতে যোগদান করতে হয়।

(ঙ) সচ্চরিত্রবান হতে হয়।

(চ) জমি বা কোন স্থাবর সম্পত্তি অর্জন করতে হয়।

(ছ) সে দেশের ভাষা জানতে হয়।

(জ) নিয়ম অনুযায়ী বৈধ হয়।

অনুমোদনসূত্রে নাগরিকত্ব লাভ করতে হলে কোন বিদেশীকে উক্ত বা এক বা একাধিক শর্ত সাপেক্ষে রাষ্ট্রের যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করতে হবে। আবেদন অনুমোদন হলে আবেদনকারী ব্যক্তি সে রাষ্ট্রের নাগরিক বলে গণ্য হবে। অনুমোদন সূত্রে নাগরিকতা অর্জনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রভেদে শর্তের পার্থক্য লক্ষ করা যায়।

যেমন– যুক্তরাজ্যে পাঁচ বছর, সুইজারল্যাণ্ড, মেক্সিকো ও আর্জেন্টিনায় দুই বছর এবং ফ্রান্সে দশ বছর বৈধ ও স্থায়ীভাবে বসবাস করলে উক্ত রাষ্ট্রসমূহ যে কোন আবেদনকারী ব্যক্তিকে তাদের স্ব-স্ব রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব প্রদান করে থাকে। অন্যদিকে, যুক্তরাষ্ট্রে নাগরিকত্ব পেতে হলে আবেদনকারীকে অবশ্যই ইংরেজি ভাষা জানতে হবে। বাংলাদেশে অনুমোদনসূত্রে নাগরিকত্ব লাভ করতে হলে আবেদনকারী ব্যক্তিকে সচ্চরিত্রবান হতে হয়।

সারসংক্ষেপ

পৌরনীতি নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান। পৌরনীতিতে নাগরিক শব্দটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। সাধারণভাবে নগরের অধিবাসীকে নাগরিক বলে। তবে, বর্তমান জাতীয় রাষ্ট্রের উদ্ভবের ফলে 'নাগরিকতা' শব্দটির ব্যাপকতা বৃদ্ধি পেয়েছে। আধুনিক অর্থে নাগরিকতা বলতে, যে ব্যক্তি রাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাস করে, রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে, রাষ্ট্রের নিয়মকানুন মেনে চলে সেই রাষ্ট্রের নাগরিক। নাগরিকতা দুই ভাবে অর্জন করা যায়– জন্মসূত্রে ও অনুমোদন সূত্রে। জন্মসূত্রে নাগরিকতা আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায়– জন্মনীতি ও জন্মস্থান নীতি। অনুমোদন সূত্রে নাগরিকতা অর্জন করতে হলে কতগুলো শর্ত পালনের মধ্যদিয়ে নাগরিকতা অর্জন করতে হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

(ক) নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। নাগরিকতার সংজ্ঞা কে দিয়েছেন?

(ক) অধ্যাপক লাস্কী (খ) হবস

গ) জন লক (ঘ) রুশো

২। নাগরিক কাকে বলে?

(ক) যে সামাজিক অধিকার ভোগ করে।

(খ) যে রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করে

গ) যে সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করে

ঘ) যে ধর্মীয় অধিকার ভোগ করে।

৩। নাগরিকতা অর্জনের পদ্ধতি কয়টি?

(ক) তিনটি (খ) চারটি

গ) দুইটি (ঘ) একটি

৪। নাগরিকতা অর্জনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ কোন নীতি অনুসরণ করে?

(ক) জন্মস্থান (খ) জন্মসূত্র ও অনুমোদন সূত্র

গ) জন্মনীতি (ঘ) জন্মস্থান নীতি

(খ) এক কথায় উত্তর দিন

১। নাগরিকতা বলতে কি বুঝায় ?

২। রাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় সম্পদ কি?

৩। নাগরিক বলতে কি বুঝায়?

৪। নাগরিকতা অর্জনের পদ্ধতি কয়টি ও কি কি?

৫। জন্মস্থান নীতি কোন কোন দেশে অনুসরণ করা হয়?

(ক) উত্তরমালা

১।(ক), ২।(গ), ৩।(গ), ৪।(গ)।

(খ) এক কথায় উত্তর

১। নাগরিকতা বলতে রাষ্ট্রের হিসেবে নাগরিকের মর্যাদাকে বুঝায়।

২। সুনাগরিক রাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় সম্পদ।

৩। রাষ্ট্রের সদস্য হিসেবে ব্যক্তির পরিচয় বুঝায়।

৪। দুটি।জন্মনীতি ও জন্মস্থান নীতি।

৫। বিটিশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

পাঠ-২ : নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- অধিকারের সংজ্ঞা বলতে পারবেন ।
- অধিকার কত প্রকার ও কি কি বর্ণনা করতে পারবেন ।
- নাগরিকের কর্তব্য সম্পর্কে জানতে পারবেন ।

অধিকার ও কর্তব্য

নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য আলোচনা পৌরনীতির অন্যতম আলোচ্য বিষয় । কেননা পৌরনীতি 'নাগরিকতা' বিষয়ক বিজ্ঞান । অধিকার ভোগ ও কর্তব্য পালনের মধ্য দিয়েই একজন নাগরিক পূর্ণাঙ্গরূপ বিকশিত হয় । অধিকারের মাত্রা এবং কর্তব্য পালনের দ্বারা একটি দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার স্বরূপ লাভ করা যায় । তাই নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ।

অধিকারের সংজ্ঞা : কোন ব্যক্তির ন্যায়সঙ্গত ইচ্ছেমত কাজ করার ক্ষমতাকে অধিকার বলে । অধিকার কথাটি সামাজিক চেতনাবোধ থেকে উদ্ভূত । অধিকার শব্দের অর্থ দাবি ।

পৌরবিজ্ঞানে অধিকার বলতে রাষ্ট্র ও সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত জনকল্যাণমূলক কিছু মৌলিক সুযোগ-সুবিধাকে বোঝায়, যা ব্যতীত ব্যক্তি জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশ সম্ভব নয় । অধিকার অর্থ যথেচ্ছা নয়, কারণ যথেচ্ছার সভ্য সমাজে কখনও গ্রহণীয় নয় । অধিকার সম্পর্কে অধ্যাপক হারল্ড লাস্কি বলেছেন, "অধিকার সমাজ বহির্ভূত বা সমাজ নিরপেক্ষ কিছু নয়, সমাজ ভিত্তিক সামাজিক কল্যাণের মধ্যেই অধিকারের তাৎপর্য নিহিত ।"

তিনি আরো বলেছেন, "অধিকার হচ্ছে সমাজ জীবনের সে সব সুযোগ-সুবিধা যা ব্যতীত ব্যক্তি তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধনে অক্ষম ।" টি. এইচ গ্রিন বলেন, "অধিকার হচ্ছে সেসব বাহ্যিক অবস্থা যা মানসিক পরিপুষ্টি সাধন করে থাকে ।"

অধিকারের শ্রেণীবিভাগ

অধিকার বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে । নিম্নে বিভিন্ন ধরনের অধিকারের বর্ণনা দেয়া হলো :

১ । **নৈতিক অধিকার :** নৈতিক অধিকার বলতে সমাজের নৈতিকতা ও ন্যায়বোধ থেকে উদ্ভুত অধিকারকে বোঝায় । যেমন ভিক্ষুককে ভিক্ষাদান, দুঃস্থকে সাহায্য করা, অসুস্থকে সাহায্য করার অধিকার ইত্যাদি । নৈতিক অধিকারে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব থাকে না । মানুষের বিচার বুদ্ধি, ন্যায় বোধ ইত্যাদির উপর নির্ভরশীল । এ অধিকার ভঙ্গ করলে রাষ্ট্র কোন ব্যক্তিকে শাস্তি দিতে পারে না । তবে নৈতিক অধিকারের পিছনে সমাজের সমর্থন রয়েছে । নৈতিক অধিকার ব্যক্তি ও সমাজ ভেদে বিভিন্ন রূপ ধারণ করে ।

২ । **আইনগত অধিকার :** আইনগত অধিকার বলতে বোঝায় যা রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত বা অনুমোদিত । এর পিছনে রয়েছে রাষ্ট্রের সার্বভৌম কর্তৃত্ব । এরূপ অধিকার ভঙ্গ করলে রাষ্ট্র শাস্তির বিধান করে । যেমন জীবধারণের অধিকার, সম্পত্তি লাভের অধিকার, পেশা গ্রহণের অধিকার ইত্যাদি । বাংলাদেশ, ভারত, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র সহ সকল দেশে এ অধিকার দেয়া হয়েছে । আইনগত অধিকার সার্বজনীন । আইনগত অধিকারকে নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করা যায়–

ক.**সামাজিক অধিকার :** যে সকল অধিকার সভ্য সমাজে বাস করার জন্য প্রয়োজন তাকে সামাজিক অধিকার বলে । যেমন : জীবন ধারণের অধিকার, মত প্রকাশের অধিকার, সম্পত্তি রক্ষার অধিকার ইত্যাদি ।

খ. **অর্থনৈতিক অধিকার :** অর্থনৈতিক অধিকার বলতে সেই সব সুযোগ সুবিধাকে বোঝায়, যা দ্বারা কোন ব্যক্তি তার অর্থনৈতিক জীবনের নিরাপত্তা খুঁজে পায় । অর্থনৈতিক অধিকার বর্তমানকালে একটি স্বীকৃত

আইনগত অধিকার। যেমন : কর্মের অধিকার, ন্যায্য মজুরির অধিকার, সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার, পেশা পছন্দের অধিকার। অর্থনৈতিক অধিকার হচ্ছে রাজনৈতিক অধিকারের পূর্বশর্ত।

গ. **রাজনৈতিক অধিকার** : রাষ্ট্রীয় কাজে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে নাগরিকগণ যে অধিকার ভোগ করে তাকে রাজনৈতিক অধিকার বলে। রাজনৈতিক অধিকার যেমন–ভোট দানের অধিকার, নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অধিকার, বসবাস করার অধিকার, সরকারি চাকুরি লাভের অধিকার ইত্যাদি। রাষ্ট্র নাগরিকদের জন্য এ অধিকারগুলো সংরক্ষণ করে থাকে। রাজনৈতিক অধিকার নাগরিকের রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি করে।

ঘ. **ধর্মীয় অধিকার** : ধর্মীয় অধিকার বলতে প্রত্যেক নাগরিকের পছন্দ অনুযায়ী ধর্ম গ্রহণ, ধর্ম চর্চা এবং ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালনের অধিকারকে বোঝায়। রাষ্ট্র এবং কোন ব্যক্তি কর্তৃক হস্তক্ষেপমুক্ত হয়ে ধর্মাচরণের অধিকারই ধর্মীয় অধিকার।

ঙ. **সাংস্কৃতিক অধিকার** : সাংস্কৃতিক অধিকার হচ্ছে– নিজস্ব ভাষা, আচার-আচরণ, বিশ্বাস, পোশাক-পরিচ্ছদ ধ্যান-ধারণার বিকাশ ও সংরক্ষণের অধিকার। জাতি, ধর্ম বা বর্ণ নির্বিশেষে প্রত্যেক জাতির রয়েছে নিজস্ব সংস্কৃতি। সেই সংস্কৃতি নিয়ে রাষ্ট্র তার নিজস্ব মহিমায় মহিমান্বিত হয়ে ওঠে।

চ. **ব্যক্তিক অধিকার** : ব্যক্তিক অধিকার মানুষের জন্মগত অধিকার। মানুষ এ অধিকার প্রকৃতি থেকে পেয়ে থাকে। এ অধিকার ব্যতীত মানুষ সুস্থ জীবন-যাপন করতে পারে না। যেমন : জীবন ধারণের অধিকার, স্বাধীনতার অধিকার, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের অধিকার মানুষের ব্যক্তিক অধিকার। ব্যক্তিক অধিকার ব্যতীত কোন নাগরিক, তার ব্যক্তি সত্তার যথাযথ বিকাশ ঘটাতে পারে না।

নাগরিকের কর্তব্য

কর্তব্য বলতে নাগরিকের দায়িত্ব বোঝায়। নাগরিকগণ যেমন রাষ্ট্র প্রদত্ত অধিকার ভোগ করে, তেমনি রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকের কর্তব্যও রয়েছে। রাষ্ট্র যেমন নাগরিকের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার দান করে, তেমনি নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য আইন মেনে চলা, কর প্রদান করা ইত্যাদি। বস্তুত রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য পরায়ন ব্যক্তিই সুনাগরিক। নাগরিকের কর্তব্য পালনের গুরুত্ব অপরিসীম। কর্তব্য ও দায়িত্ব পালন করার মাধ্যমে কোন নাগরিকের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে। স্বাধীনতা, সাম্য ও অধিকার ভোগের নিশ্চয়তা কর্তব্য পালনের মধ্যেই নিহিত। সুসভ্য, সুস্থ, প্রগতিশীল ও উন্নত সমাজ বা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা সৃষ্টি মূলত নাগরিকের সচেতন কর্তব্যবোধের ওপরই নির্ভরশীল। অধ্যাপক লাস্কি বলেন, "আমার নিরাপত্তার অধিকারের মধ্যে অপরের অযৌক্তিক ও অন্যায়ভাবে আক্রমণ না করার কর্তব্য নিহিত।"

নাগরিক কর্তব্য দুই ভাগে বিভক্ত। যথা–

(ক) নৈতিক কর্তব্য (খ) আইনগত কর্তব্য।

(ক) **নৈতিক কর্তব্য** : নাগরিকের বিবেক ও ন্যায়বোধ হতে নৈতিক কর্তব্যের জন্ম। নাগরিকগণ স্বকীয় বিবেচনা অনুমায়ী যে কাজ করণীয় বলে মনে করে এবং সম্পাদন করে তাকে নৈতিক কর্তব্য বলে। যেমন: ক্ষুধার্তকে খাদ্য দান, রোগীর সেবা, শোকার্তকে সান্ত্বনা প্রদান, দুর্যোগ, মহামারী, বন্যা, খরা ও দুর্ভিক্ষের সময় মানুষের পাশে দাঁড়ানো নৈতিক কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। তবে, এসব কর্তব্য পালন না করলে কোন শাস্তি পেতে হয় না। মানুষ সামাজিক জীব যেমন, তেমনি নৈতিক জীবও। মানুষের মনুষ্যত্বের প্রকাশ ঘটে নৈতিক কর্তব্য পালনের মধ্যে দিয়ে।

(খ) **আইনগত কর্তব্য** : রাষ্ট্রের আইন দ্বারা আরোপিত কাজকে আইনগত কর্তব্য বলে। যে কর্তব্য রাষ্ট্র কর্তৃক নাগরিকের ওপর অর্পিত হয় এবং আইনের দ্বারা সেগুলো মেনে চলতে বাধ্য করা হয় তাকে, আইনগত

কর্তব্য বলে। যেমন: নির্বাচনে ভোটদান করা, আইন মেনে চলা, নিয়মিত কর প্রদান করা ইত্যাদি। আইনগত কর্তব্য সকলের জন্য অবশ্য পালনীয়।

আইনগত কর্তব্যের শ্রেণীবিভাগ

(১) **সামাজিক কর্তব্য :** সমাজ জীবনকে সুন্দর ও উন্নত করার জন্য সমাজের প্রতি মানুষের অফুরন্ত কর্তব্য বিদ্যমান। সামাজিক অনুষ্ঠান গঠন, পরিচালনা, সন্তানদের শিক্ষিত ও মানুষ করে তোলা, সমাজে প্রচলিত রীতি-নীতি মেনে চলা, সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা সামাজিক কর্তব্য।

(২) **রাজনৈতিক কর্তব্য :** সুষ্ঠু রাজনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য নাগরিকের অনেক রাজনৈতিক কর্তব্য পালন করতে হয়। যেমন– রাষ্ট্র প্রণীত আইন মেনে চলা, সততার সাথে ভোটাধিকার প্রয়োগ করা, রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করা, স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করা, নিজ নিজ পেশার প্রতি দায়িত্ববান হওয়া ইত্যাদি।

(৩) **অর্থনৈতিক কর্তব্য :** উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার সক্রিয় অংশগ্রহণ করা প্রত্যেকটি নাগরিকের কর্তব্য। নিয়মিত খাজনা ও কর প্রদান করা, শিল্প, ব্যবসা ও বাণিজ্য সংক্রান্ত কাজে অংশগ্রহণ করা, সততার সাথে দায়িত্ব পালন করা, প্রয়োজনে বিনা পারিশ্রমিকে রাষ্ট্রের সেবা করা অর্থনৈতিক কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত।

(৪) **পরিবারের প্রতি কর্তব্য :** পরিবারের উন্নতি, সমৃদ্ধি ও কল্যাণের জন্য কাজ করা নাগরিকের পরিবারের প্রতি কর্তব্য। সকলের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করা, স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থা, পরিবারের শান্তি-শৃঙ্খলা ও সংহতি পালন এবং পারিবারিক ঐতিহ্য রক্ষা করা নাগরিকের পারিবারিক কর্তব্য।

(৫) **অন্যান্য কর্তব্য :** উপরিউক্ত কর্তব্য ছাড়াও নাগরিকের আরো অনেক কর্তব্য আছে। যেমন- শহর বা নগরের উন্নতিতে উদ্যোগ গ্রহণ, অন্যের সাথে সহযোগিতা সহমর্মিতার সম্পর্ক গড়ে তোলা, প্রয়োজনে আন্তর্জাতিক শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য এগিয়ে আসা ইত্যাদি।

অধিকার ও কর্তব্যের সম্পর্ক

অধিকার ও কর্তব্যের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। এ দুটোর অবস্থান পাশাপাশি। অধিকার ভোগ করতে হলে কর্তব্য পালন করতে হয়। নাগরিকগণ নিজ নিজ অধিকারের বিনিময়ে রাষ্ট্রের প্রতি কিছু কর্তব্য পালন করে। অধিকার উপভোগ ও কর্তব্য পালনের মধ্যেই নাগরিক জীবনের পূর্ণতা। একমাত্র কর্তব্য পালনের মাধ্যমেই অধিকার উপভোগ করা যায়। নিম্নে অধিকার ও কর্তব্য পালনের কয়েকটি দিক আলোচনা করা হলো :

ক. **একজনের কর্তব্য দ্বারা অন্য জনের অধিকার সংরক্ষিত :** একজনের কর্তব্য পালনের মধ্যে অন্যের অধিকার উপভোগ সুনিশ্চিত হয়। আমার যেমন অধিকার আছে সম্পত্তি ভোগের তেমনি কর্তব্য আছে অন্যের সম্পত্তির ওপর হস্তক্ষেপ না করা। আমার যেমন নিরপেক্ষ থাকার অধিকার আছে তেমনি কর্তব্য হল অন্যের জীবনের নিরাপত্তা পথে বাধা সৃষ্টি না করা। তাই অধিকার ও কর্তব্যকে বিচ্ছিন্নভাবে কল্পনা করা যায় না। অধিকার ও কর্তব্য একে অপরের পরিপূরক।

খ. **অধিকার ও কর্তব্য যেন একই মুদ্রার দুটি পিঠ :** অধিকার বলতে কর্তব্য বোঝায়। কারণ অধিকার ভোগ করতে হলে কর্তব্য পালন করতে হয়। সুতরাং প্রত্যেকটি নাগরিকের অধিকার এক একটি নাগরিক কর্তব্য। যেমন–ভোটাধিকার বলতে ভোটাধিকার সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগের দায়িত্বকে বোঝায়।

গ. **রাষ্ট্র ও নাগরিক :** রাষ্ট্র সকল অধিকারের উৎস। ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য রাষ্ট্র সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অধিকার সহ প্রয়োজনীয় সকল অধিকার প্রদান করে। পক্ষান্তরে, নাগরিকগণই পারে রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত এবং সমাজের প্রতি কর্তব্য পালন করে রাষ্ট্রকে উন্নতির শিখরে পৌঁছে দিতে। রাষ্ট্রের স্বাধীনতা–সার্বভৌমত্ব রক্ষার্থে নাগরিকদের এগিয়ে আসতে হবে। সুতরাং, দেখা যাচ্ছে, অধিকার ও কর্তব্য

সম্পর্কযুক্ত । একটি ছাড়া অন্যটি অর্থহীন হয়ে পড়ে । তাই অধিকার ও কর্তব্যের সূত্র দিয়ে রাষ্ট্র ও নাগরিক গভীর সম্পর্কে বাঁধা । এজন্য বলা হয় "অধিকারের মধ্যে কর্তব্য নিহিত ।"

ঘ. **উভয়ের উৎসস্থল সমাজ :** একজন নাগরিক জন্ম থেকে মুত্যু পর্যন্ত সমাজে বাস করে । সমাজ ব্যক্তিকে সঠিক সুযোগ সুবিধা প্রদান করে । আবার এসমাজ জীবনকে সুন্দর ও সুস্থ করে গড়ে তোলা নাগরিকের দায়িত্ব । তাই বলা যায়, অধিকার ও কর্তব্য উভয়ের উৎসস্থল সমাজ ।

উপসংহার বলা যায়, অধিকার ও কর্তব্য শাব্দিক দিক দিয়ে পৃথক হলেও এদের ভেতর গভীর সম্পর্ক বিরাজমান । এরা একে অপরের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত । এ দুটিকে একে অপর থেকে কোন ক্রমেই বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব নয় ।

সারসংক্ষেপ

নাগরিক অধিকার বলতে রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত সুযোগ-সুবিধা বুঝায় । যে সুযোগ-সুবিধা ছাড়া ব্যক্তি তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধন করতে পারে না । রাষ্ট্রের রাজনৈতিক অধিকার হচ্ছে নির্বাচনের অধিকার, মতামত প্রকাশের অধিকার, সামাজিক অধিকার হচ্ছে শিক্ষার অধিকার, খাদ্য, বাসস্থান ও চিকিৎসার অধিকার ধর্মাচরণের অধিকার ইত্যাদি । রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকের কর্তব্যও রয়েছে । আইন মান্য করা, আনুগত্য প্রদর্শন করা, ভোটাধিকার প্রয়োগ করা । অধিকার কর্তব্য দ্বারা সীমাবদ্ধ । আবার কর্তব্য যেখানে সেখানে অধিকার আছেই । আসলে অধিকার ও কর্তব্য একই বিষয়ের দুটি দিক । অধিকার ও কর্তব্য একে অপরের পরিপূরক । একটি ব্যতীত অপরটি ভোগ করা যায় না । এজন্যই বলা হয়, অধিকারের মধ্যে কর্তব্য নিহিত ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

(ক) নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। অধিকার অর্থ কি?

(ক) যা খুশি তাই করা
(খ) ইচ্ছানুযায়ী কিছু করার ক্ষমতা
(গ) অপরের কাজে হস্তক্ষেপ না করা
(ঘ) ব্যক্তিত্ব বিকাশের অনুকূল শত ।

২। অধিকারের সংজ্ঞা কে দিয়েছেন?

(ক) জনলক
(খ) আব্রাহাম লিংকন
(গ) হবস
(ঘ) অধ্যাপক লাস্কি

৩। কোনটি রাজনৈতিক অধিকার?

(ক) শিক্ষা লাভের অধিকার
(খ) স্বাধীনভাবে ধর্মচর্চার অধিকার
(গ) মতামত প্রকাশের অধিকার
(ঘ) ন্যায্য মজুরি পাওয়ার অধিকার

(খ) এক কথায় উত্তর দিন

১। সাধারণভাবে অধিকার বলতে কি বুঝায়?

২। রাজনৈতিক অধিকার বলতে কি বুঝায়?

৩। ধর্মীয় অধিকার কি?

৪। অধিকার ও কর্তব্য কোথা হতে সৃষ্টি?

উত্তরমালা

(ক) ১। (ঘ), ২। (খ), ৩। (গ)

(খ) ১। ইচ্ছানুযায়ী কিছু করার ক্ষমতা বোঝায় ।

২। রাজনৈতিক কার্যাবলিতে অংশগ্রহণ ও মতামত প্রকাশের সুযোগকে বোঝায় ।

৩। নিজ নিজ ধর্মচর্চা ও ধর্ম পালন করার স্বাধীনতা বোঝায় ।

৪। অধিকার ও কর্তব্য সমাজ থেকে সৃষ্ট ।

পাঠ-৩ : সুনাগরিকের গুণাবলি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- সুনাগরিক কাকে বলে বলতে পারবেন ।
- সুনাগরিকের গুণাবলি বর্ণনা করতে পারবেন ।

ভূমিকা

সুনাগরিক একটি দেশের জাতীয় সম্পদ । যে দেশে সুনাগরিকের সংখ্যা যত বেশি সে দেশ তত বেশি উন্নত । সুনাগরিক বলতে সেই ব্যক্তিকে বুঝায়, যিনি রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্য চিন্তা করেন এবং প্রয়োজনীয় কর্তব্য পালন করেন ।

সুনাগরিকের গুণাবলি

লর্ড ব্রাইসের মতে– সুনাগরিকের প্রধানত তিনটি গুণ রয়েছে –

১ । **বুদ্ধি :** সুনাগরিকের প্রধান গুণ হচ্ছে বুদ্ধি । কারণ একজন বুদ্ধিমান নাগরিক দেশের সম্পদ । কারণ বুদ্ধিমান নাগরিকই একমাত্র সব সমস্যার সমাধান করতে পারে । বুদ্ধিমান ও সুশিক্ষিত নাগরিক ছাড়া রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও জনমত গঠন করা সম্ভব নয় । সুতরাং 'বুদ্ধি' ও সচেতনতা সুনাগরিকের শ্রেষ্ঠ গুণ । শিক্ষার মাধ্যমেই কেবলমাত্র বুদ্ধিমত্তার বিকাশ সাধন সম্ভব । আর এ দায়িত্ব পালন করবে সরকার ও সচেতন জনগণ । আধুনিক গণতান্ত্রিক সরকারের সফলতা নির্ভর করে নাগরিকের বুদ্ধিমত্তার উপরে ।

২ । **আত্মসংযম :** আত্মসংযম সুনাগরিকের শ্রেষ্ঠ গুণাবলি । প্রতিটি ব্যক্তির সংযমী হওয়া উচিত । কারণ আত্মসংযমী ব্যক্তিই যে কোন রাষ্ট্রের জন্য কল্যাণকর । ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে অপরের মতামত সহ্য করার মত সংযম অবশ্যই প্রত্যেক নাগরিকের অর্জন করতে হবে । এই মহৎ গুণ নাগরিককে দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থে নিজেকে বিসর্জন দেয়ার অনুপ্রেরণা যোগায় । গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আত্মসংযম একটি অপরিহার্য শর্ত । নিজেই শ্রেষ্ঠ, অপরের মতামতের কোন মূল্য নেই, এটা মনে করা সংকীর্ণতা । রাজনৈতিক দলে নিজের মতামতের পাশাপাশি অন্যের মতকেও গুরুত্ব দিতে হবে । আর এ গ্রহণ ও শ্রদ্ধাকে আত্মসংযম বলা হয় । আত্মসংযমী ব্যক্তি জীবনে সমৃদ্ধি, কল্যাণ ও সুনাম বয়ে নিয়ে আসে, তেমনি জাতির জীবনেও আসে সফলতা । আত্মসংযমী জাতি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ জাতি ।

৩ । **বিবেক :** বিবেক হচ্ছে সুনাগরিকের মৌলিক সত্তা । বিবেকের জন্যই সুনাগরিক তার কর্তব্য ও দায়িত্ব পালন করে । নাগরিক দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের মাধ্যমে অধিকার উপভোগ করার শিক্ষাই বিবেকের শিক্ষা । কোন কাজ করা উচিত এবং কোনটা করা উচিত নয় তা বিবেকবান নাগরিক মাত্রই বুঝতে পারে । কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনে নাগরিকের কেবল বিবেককেই পরিচালিত করতে হবে । সততা, কর্তব্যনিষ্ঠা ও সময়নিষ্ঠা জাগ্রত বিবেকের ফসল । বিবেকবান নাগরিক রাষ্ট্রের শক্তি ।

এতিনটি গুণছাড়াও সুনাগরিকের আরও কিছু গুণাবলি রয়েছে । যেমন : বড়দের শ্রদ্ধা করা, কাউকে ছোট না করা, শিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান হওয়া, ব্যক্তি স্বাধীনতা ও জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সচেতন থাকা, শৃঙ্খলা ও সময়ানুবর্তিতার প্রতি অনুরাগী হওয়া, সাধারণ জ্ঞান, প্রজ্ঞার অধিকারী হওয়া । নিজ সমাজ, রাষ্ট্র, সরকার ও সংবিধান সম্পর্কে সচেতন থাকা স্বাধীন মনোভাব পোষণ করা ইত্যাদি ।

সারসংক্ষেপ

সুনাগরিক দেশের সম্পদ। সুনাগরিক ছাড়া দেশের উন্নতি সম্ভব নয়। সুনাগরিক হতে হলে প্রধানত তিনটি গুণের অবশ্যই প্রয়োজন। এ তিনটি গুণ হচ্ছে বুদ্ধি, বিবেক ও আত্মসংযম। নাগরিকদের অবশ্যই বুদ্ধিমান, বিবেকসম্পন্ন ও আত্মসংযমী হতে হবে। কারণ সুনাগরিকই পারে দেশকে উন্নতির শিখরে আরোহণ করাতে। তাছাড়া সুনাগরিকের আরও কিছু মৌলিক গুণ দরকার। যেমন, রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব পালন করা, সংবেদনশীল হওয়া, নিজ ধর্ম পালন করা, স্বাধীন মতামত প্রকাশ করা, সত্য ও নিষ্ঠার অধিকারী হওয়া।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

(ক) নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। লর্ড ব্রাইস সুনাগরিকের কয়টি গুনাবলির কথা বলেছেন?

(ক) ৪টি (খ) ৫টি

(গ) ২টি (ঘ) ৩টি

২। সুনাগরিকের গুণ কোনটি?

(ক) সচেতনতা (খ) বুদ্ধি

(গ) ত্যাগ (ঘ) আত্মত্যাগ

(খ) এক কথায় উত্তর দিন

১। সুনাগরিক বলতে কোন ব্যক্তিকে বুঝায়?

২। বিবেক কাকে বলে?

৩। আত্মসংযমী নাগরিক কাকে বলে?

উত্তরমালা

১। (ঘ) ২। (খ)

এক কথায় উত্তর।

১। যিনি রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্য চিন্তা করেন এবং কর্তব্য পালন করেন।

২। নিজের চিন্তা ও কাজের ভাল-মন্দ সম্পর্কে ব্যক্তির জ্ঞানকে বিবেক বলে।

৩। রাগ, ক্ষোভ ও লোভমুক্ত থেকে ঠাণ্ডা মাথায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন যিনি।

পাঠ-৪ : দ্বৈত নাগরিকতা, নাগরিকতার বিলোপ এবং নাগরিক ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- দ্বৈত নাগরিকতা বলতে পারবেন ।
- নাগরিকতার বিলোপ সর্ম্পকে ব্যাখ্যা করতে পারবেন ।
- নাগরিক ও রাষ্ট্রের সর্ম্পক বর্ণনা করতে পারবেন ।

দ্বৈত নাগরিকতা

একজন মানুষের দুই রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব প্রাপ্তিকে দ্বিনাগরিকত্ব বলে । জন্মনীতি ও জন্মস্থান নীতি অনুযায়ী নাগরিকত্ব অর্জন করা যায় । বর্তমান কালে অনেক রাষ্ট্র জন্মস্থান নীতি ও জন্মনীতি এ উভয়ই নীতি অনুসরণ করে । আবার কোন কোন দেশ কেবল জন্মনীতি বা জন্মস্থান নীতি অনুসরণ করে । ফলে দ্বি-নাগরিকত্ব সমস্যার উদ্ভব হয় ।

দ্বি-নাগরিকত্ব অর্থ হচ্ছে, জন্মনীতি ও জন্মস্থান নীতি এ উভয় নীতি অনুযায়ী নাগরিকত্ব লাভ করা । উদাহরণ স্বরূপ ফ্রান্সের কোন দম্পতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানকালীন সন্তান জন্ম দিলেন । সে সন্তান ফ্রান্সের আইনানুযায়ী ফ্রান্সের নাগরিকতা লাভ করবে । কারণ ফ্রান্স জন্মনীতি অনুসরণ করে । আবার সে শিশু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইন অনুসারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব লাভ করবে । কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জন্মস্থান নীতি অনুসরণ করা হয় ।

এভাবে দ্বি-নাগরিকত্ব সমস্যার উদ্ভব ঘটে ।

দ্বৈত নাগরিকতার বিলোপ : দ্বৈত নাগরিকত্বের সমস্যা দেখা দিলে শিশুটি বয়:বৃদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয় । সে শিশু বয়স্ক হলে সে নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী যে কোন একটি দেশের নাগরিকতা লাভ করবে । অর্থাৎ সে শিশু যে রাষ্ট্রের নাগরিকতা লাভ করতে চাইবে, সে সেই রাষ্ট্রের নাগরিকতা লাভ করবে ।

নাগরিকতার বিলোপ

নাগরিকতা অর্জনের যেমন অনেকগুলো পদ্ধতি রয়েছে তেমন বিলোপেরও কারণ রয়েছে । যেমন–

১ । যদি কোন নাগরিক স্বেচ্ছায় অন্য রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব গ্রহণ করে, আর তার রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব ত্যাগ করে সে ক্ষেত্রে তার পূর্ব নাগরিকত্ব লোপ পায় ।

২ । যদি কোন নাগরিক তার নিজ রাষ্ট্র হতে দীর্ঘদিন অনুপস্থিত থাকে তাহলে তার নাগরিকত্ব লোপ পাবে ।

৩ । যদি কোন স্ত্রীলোক অন্য রাষ্ট্রের পুরুষকে বিবাহ করে তাহলে উক্ত স্ত্রীলোকটি নিজ দেশের নাগরিকত্ব হারায় এবং তার স্বামীর দেশের নাগরিকত্ব অর্জন করে । তবে জাপানি কোন স্ত্রীলোককে অন্য কোন রাষ্ট্রের পুরুষ বিবাহ করলে তাকে জাপানের নাগরিকত্ব গ্রহণ করতে হয় । ফলে ঐ পুরুষ নিজ রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব হারাতে পারে ।

৪ । যদি কোন নাগরিক বিদেশী কোন রাষ্ট্রের সরকারি চাকরি গ্রহণ করে বা সেনাবাহিনীতে যোগদান করে কিংবা কোন উপাধি গ্রহণ করে তাহলে তার নিজ রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব বিলোপ হবে ।

৫ । রাষ্ট্র কোন কারণে কোন নাগরিককে বিতাড়িত করলে বিতাড়িত নাগরিক নাগরিকত্ব হারায় ।

৬ । উগ্র জাতীয়তা বোধের কারণে কোন দেশের সরকার সেই দেশের কোন সম্প্রদায়ের লোককে দেশ থেকে বিতাড়িত করলে তারা ঐ দেশের নাগরিকত্ব হারায় ।

৭। যুদ্ধে জয়-পরাজয় ও রাষ্ট্রে চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে নাগরিকত্ব লোপ পেতে পারে। কোন বিজয়ী রাষ্ট্র যদি বিজিত রাষ্ট্রের কোন অংশ দখল করে, আনুষ্ঠানিকভাবে নিজ দেশের সংগে সংযুক্ত করে, তাহলে দখলকৃত এলাকার অধিবাসীগণের তাদের পূর্ব রাষ্ট্রের নাগরিকতার বিলোপ ঘটে।

৮। জন্মস্থান ও জন্মনীতি অনুযায়ী কোন পিতা–মাতার সন্তান দ্বিনাগরিকত্ব লাভ করতে পারে। কিন্তু বয়োপ্রাপ্ত হয়ে সে একটি রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব বর্জন করলে উক্ত রাষ্ট্রে তার নাগরিকত্ব বিলুপ্ত হয়।

৯। কোন সামরিক কর্মকর্তা বা কর্মচারী সেনাবাহিনী থেকে পলায়ন করলে অথবা গুরুতর অপরাধ করলে নাগরিকত্ব বিলোপ হতে পারে। এভাবে বহু কারণে নাগরিকত্ব বিলুপ্ত হতে পারে।

নাগরিক ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক

নাগরিক ও রাষ্ট্র ওতপ্রোতভাবে জড়িত। নাগরিক ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। সুপ্রাচীন কাল হতে নাগরিকের সঙ্গে রাষ্ট্রের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। তবে কালের পরিবর্তে রাষ্ট্র ও নাগরিকত্বের সাংগঠনিক রূপেও পরিবর্তন ঘটেছে। এরিস্টটল বলেছেন, "নাগরিক জীবনের বহুমুখী প্রয়োজনে রাষ্ট্র গড়ে উঠেছে এবং উন্নত জীবন বিধানের লক্ষ্যে টিকে রয়েছে।" নাগরিক ও রাষ্ট্রের ধারণা সমসাময়িক। প্রাচীন কালে নগরকে কেন্দ্র করে নাগরিকতা বিবেচনা করা হত। কিন্তু বর্তমান কালে জাতীয় রাষ্ট্রের উদ্ভবের ফলে নাগরিকতা নগরকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে না বরং জাতীয় রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করে নাগরিকতা নির্ধারিত হয়।

নাগরিকদের প্রয়োজনেই রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছে। নাগরিকদের সকল চাহিদা, সামাজিক, রাজনৈতিক প্রয়োজন রাষ্ট্র মিটিয়ে থাকে। রাষ্ট্রের মাধ্যমে নাগরিকদের ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধন হয়।

রাষ্ট্র যে উদ্দেশ্য গড়ে উঠেছে তার বাস্তবায়ন নাগরিকদের সক্রিয় সহযোগিতায় সম্ভব। রাষ্ট্র নাগরিকদের বন্ধু, পথ প্রদর্শক। রাষ্ট্র সবসময় নাগরিকদের কল্যাণের কথা চিন্তা করে।

নাগরিকগণ মেধা, মনন ও যোগ্যতা দিয়ে রাষ্ট্রকে উন্নত রূপে গড়ে তোলে। তাই রাষ্ট্রের বিকাশের ক্ষেত্রে নাগরিকদের মাধ্যমে নাগরিকদের জন্য নিরাপদ জীবন নিশ্চিত করে এবং উন্নত জীবন গড়ে তোলার জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে।

নাগরিকগণ তাদের জীবন রাষ্ট্রর মধ্যেই অতিবাহিত করে। তাদের জীবনের সব কাজ রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পন্ন করে। রাষ্ট্র নাগরিকদের নিরাপত্তা দান করে। রাষ্ট্র সব সময়ই নাগরিকদের কল্যাণের কথা চিন্তা করে বহু কর্মসূচি গ্রহণ করে। রাষ্ট্রের প্রতিও নাগরিকদের যথেষ্ট দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। দেশকে রক্ষার ক্ষেত্রেও নাগরিকগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দেশের সার্বভৌমত্ব ও সংহতি রক্ষার ক্ষেত্রে সমাজ সজাগ দৃষ্টি রাখে। রাষ্ট্রের অস্তিত্ব যখন বিপন্ন হয়, তখন নাগরিকবৃন্দ রাষ্ট্রের আহবানে তাদের জীবন উৎসর্গ করতেও দ্বিধা বোধ করে না।

সারসংক্ষেপ

নাগরিকতার ক্ষেত্রে দ্বি-নাগরিকত্ব অনুসরণ করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে জন্মস্থান নীতি ও জন্মনীতি একই সময়ে মেনে চলার কারণে দ্বৈত নাগরিকতার সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে সন্তান বড় হয়ে যে কোন একটি নাগরিকতা গ্রহণ করতে পারে। নাগরিকতা যে ভাবে অর্জন করা যায়, সেভাবে বিলোপও করা যায়। কেউ স্বেচ্ছায় নাগরিকতা বর্জন করতে পারে আবার যুদ্ধে হয়– পরাজয়ের কারণে ও নাগরিকতা বিলুপ্ত হতে পারে। রাষ্ট্রের সংগে ব্যক্তির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। নাগরিকগণ রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব পালন করে। রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে। অন্যদিকে রাষ্ট্রও নাগরিকদের কল্যাণ করে। নাগরিকদের কল্যাণের জন্যই রাষ্ট্র গড়ে উঠেছে। সুতরাং রাষ্ট্র ও নাগরিক ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

(ক) নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। নাগরিকতা অর্জনের ক্ষেত্রে ফ্রান্স কোন নীতি মেনে চলে?

(ক) জন্মনীতি (খ) জন্মস্থান নীতি

(গ) জন্মসূত্র (ঘ) জন্মসূত্র ও অনুমোদনসূত্র

২। নাগরিকতা অর্জনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কোন নীতি মেনে চলে?

(ক) জন্মস্থান নীতি (খ) জন্মনীতি

(গ) জন্মস্থান নীতি ও জন্মনীতি (ঘ) জন্মসূত্র ও অনুমোদনসূত্র

৩। কি কারণে নাগরিকতা বিলুপ্ত হয়?

(ক) অন্য রাষ্ট্রের সেনাবাহিনীতে যোগদান করলে

(খ) সরকারের বিরোধিতা করলে

(গ) জমিজমা বিক্রয় করলে

(ঘ) অন্য রাষ্ট্রে বসবাস করলে

(ক) উত্তরমালা

১। (ক), ২। (ক), ৩। (ক)

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

(ক) সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। নাগরিকতা কি?

২। নাগরিকতা কাকে বলে?

৩। নাগরিকতা অর্জনে জন্মস্থান নীতি কি?

৪। অধিকার বলতে কি বুঝায়?

৫। রাজনৈতিক অধিকার বলতে কি বুঝেন।

৬। ব্যক্তিগত অধিকার কি?

৭। নাগরিকের নৈতিক কর্তব্য কি?

৮। সুনাগরিক কাকে বলে?

৯। আত্মসংংযম কি?

১০। দ্বৈত নাগরিকতা কি?

(খ) রচনামূলক প্রশ্ন

১। নাগরিকতার অর্থ কি? নাগরিকতা অর্জনের পদ্ধতিগুলোর বর্ণনা দিন?

২। অধিকারের সংজ্ঞা দিন। নাগরিকের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার আলোচনা করুন।

৩। কর্তব্য কি? অধিকার ও কর্তব্যের সম্পর্ক আলোচনা করুন।

৪। সুনাগরিকের গুণাবলি আলোচনা করুন।

৫। নাগরিকতা বিলোপের কারনগুলোর বিবরণ দিন।

৬। নাগরিক ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক আলোচনা করুন।

ইউনিট ৮

সরকার

ভূমিকা

সরকার রাষ্ট্র গঠনের একটি উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ উপাদান । সরকারকে রাষ্ট্রের মুখপাত্র বলা হয় । সরকারের মাধ্যমে রাষ্ট্রের কর্মসূচি ও নীতিমালা প্রকাশিত ও কার্যকর হয় । সরকার ছাড়া রাষ্ট্র গঠিত হতে পারে না। আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সরকার জনগণের প্রতিনিধিত্ব করে। অন্য কথায়, রাষ্ট্রের কাজে নিয়োজিত শাসন বিভাগ, আইন বিভাগ ও বিচার বিভাগের সকল কর্মকতা ও কর্মচারীদের সমষ্টিকে সরকার বলে। সরকার রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতাবলে শাসন কার্য পরিচালনা করে। রাষ্ট্রভেদে সরকারের রূপ ও সংগঠন আলাদা হয়ে থাকে । প্রাচীন কাল থেকে আজ অবধি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের সরকার ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটেছে।

বর্তমান ইউনিটে নিম্নোক্ত পাঠগুলো আলোচনা করা হলো :

পাঠ-১ : সরকারের সংজ্ঞা, রাষ্ট্রের সাথে সরকারের সম্পর্ক ও সরকারের শ্রেণীবিভাগ।
পাঠ-২ : সংসদীয় ও রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার।
পাঠ-৩ : এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার।
পাঠ-৪ : গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্র।

পাঠ-১ : সরকারের সংজ্ঞা, রাষ্ট্রের সাথে সরকারের সম্পর্ক ও সরকারের শ্রেণীবিভাগ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- সরকারের সংজ্ঞা বলতে পারেন ।
- রাষ্ট্রের সাথে সরকারের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবেন ।
- সরকারের শ্রেণীবিভাগ বর্ণনা করতে পারবেন ।

সরকারের সংজ্ঞা : বিভিন্ন রাষ্ট্র চিন্তাবিদগণ বিভিন্ন সময়ে সরকারের সংজ্ঞা দিয়েছেন । অধ্যাপক লাস্কি বলেছেন, "সরকার হলো রাষ্ট্রের মুখপাত্র । সরকার হলো একটি যন্ত্রবিশেষ । যার মাধ্যমে রাষ্ট্র তার কার্যাবলি সুসম্পন্ন করে থাকে ।" সরকারের মাধ্যমেই রাষ্ট্র তার ইচ্ছাসমূহের বাস্তবায়ন ঘটায় । কেউ কেউ সরকারকে রাষ্ট্রের মস্তিষ্ক বলে থাকেন । সরকারই রাষ্ট্রের চালিকাশক্তি ।

রাষ্ট্রের সাথে সরকারের সম্পর্ক

রাষ্ট্র ও সরকারের গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান । প্রাচীনকালে রাষ্ট্র ও সরকারকে একই অর্থে ব্যবহার করা হত । আপাত দৃষ্টিতে রাষ্ট্র ও সরকার শব্দ দুটি সমার্থক মনে হলেও উভয়ের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান । রাষ্ট্র একটি বিমূর্ত ধারণা । আর সরকার সেই ধারণার বাস্তব সংগঠন । রাষ্ট্র একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিষ্ঠান । চারটি অন্যতম উপাদান নিয়ে রাষ্ট্র গঠিত । এর একটিকে বাদ দিয়ে রাষ্ট্র গঠিত হতে পারে না । আর সরকার রাষ্ট্রের চারটি উপাদানের একটি উপাদান । এদের মধ্যে সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য । অধ্যাপক গার্নার বলেন, "রাষ্ট্রকে যদি জীবদেহ মনে করা হয় তাহলে সরকার হলো এর মস্তিষ্ক ।"

তবে রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে কিছু মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান । নিম্নে তা আলোচনা করা হলো :

১ । সরকার রাষ্ট্রের চারটি উপাদানের একটি ।
২ । রাষ্ট্র স্থায়ী, সরকার অস্থায়ী ও পরিবর্তনশীল ।
৩ । সরকার বাস্তব প্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্র বিমূর্ত ধারণা ।
৪ । রাষ্ট্র মোট জনসমষ্টি নিয়ে গঠিত । সরকার মোট জনসমষ্টির একটি ক্ষুদ্র অংশ নিয়ে গঠিত ।
৫ । সরকারের বিভিন্ন রূপ হতে পারে, কিন্তু রাষ্ট্রের কোন পরিবর্তন সম্ভব নয় ।
৬ । রাষ্ট্রের শাসন কার্য পরিচালনার জন্য সরকার পরিবর্তন হয় । কিন্তু রাষ্ট্রের পরিবর্তন হয় না ।
৭ । রাষ্ট্র সার্বভৌম বা চরম ক্ষমতার অধিকারী, আর সরকার সেই চরম ক্ষমতার বাস্তবায়নকারী মাত্র ।
৮ । রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে যত পার্থক্য থাকুক না কেন, সরকার না থাকলে রাষ্ট্রকে কল্পনা করা যায় না । আর রাষ্ট্রের ইচ্ছা-অনিচ্ছা সরকারের মাধ্যমে প্রকাশিত হয় । তাই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সরকার ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য ।

যুগে যুগে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা বিভিন্নভাবে সরকারের শ্রেণীবিভাগ করেছেন । এদের মধ্যে এরিস্টটল, মন্টেস্কু, জ্যা জ্যাক রুশো, ম্যাকাইভার, ম্যারিয়ট এ্যালান ও লিককের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । তবে অধ্যাপক লিকক প্রদত্ত সরকারের শ্রেণীবিভাগটি সর্বাপেক্ষা সুস্পষ্ট এবং সর্বাধুনিক, তিনি সরকারকে চার ভাগে ভাগ করেছেন । অধ্যাপক লিকক প্রদত্ত সরকারের শ্রেণীবিভাগটি নিম্নরূপ :

সার্বভৌম ক্ষমতার ভিত্তিতে সরকার দুই ভাগে বিভক্ত । একনায়কতন্ত্র ও গণতন্ত্র । গণতন্ত্র সার্বভৌম ক্ষমতা জনগণের হাতে থাকে । আর একনায়কতন্ত্রে ক্ষমতা একজনের হাতে থাকে । একদল, একনেতা, এক জাতি একনায়কতন্ত্রের শ্লোগান ।

রাষ্ট্র প্রধানের ক্ষমতা লাভের পদ্ধতির ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক সরকারকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন ।

নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্র ।

নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রে রাজা নামমাত্র রাষ্ট্রপ্রধান, প্রকৃত শাসন ক্ষমতা ন্যাস্ত থাকে জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে । ইংল্যাণ্ডের শাসন ব্যবস্থা এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ ।

আইন ও শাসন বিভাগের সম্পর্কের ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক সরকার দুই ভাগে বিভক্ত । মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার বা সংসদীয় সরকার এবং রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার । শাসন বিভাগ আইন বিভাগের নিকট দায়ী থাকলে তাকে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার বলে । যেমন– বাংলাদেশ ও ভারতের সরকার ।

আর আইন বিভাগের নিকট শাসন বিভাগ দায়ী না থাকলে তাকে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার বলে । যেমন– আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সরকার । রাষ্ট্রপ্রধান জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত তিনি প্রকৃত শাসক । কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টনের ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক সরকারকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে । এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় । এককেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতা সংবিধানের মাধ্যমে কেন্দ্রের ওপর ন্যাস্ত থাকে । কেন্দ্র প্রাদেশিক সরকার বা আঞ্চলিক সরকারের হাতে ক্ষমতা ন্যাস্ত করে তা নিয়ন্ত্রণ করে । অপরদিকে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা বলতে , যে শাসন ব্যবস্থায় সংবিধানের মাধ্যমে কেন্দ্র ও প্রাদেশিক সরকারের হাতে ক্ষমতা বণ্টন করে দেয়া হয় তাকে বোঝায় । যেমন– মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারত ।

অধ্যাপক লিককের সরকারের শ্রেণীবিভাগ নিম্নে রেখাচিত্রের মাধ্যমে দেখানো হলো–

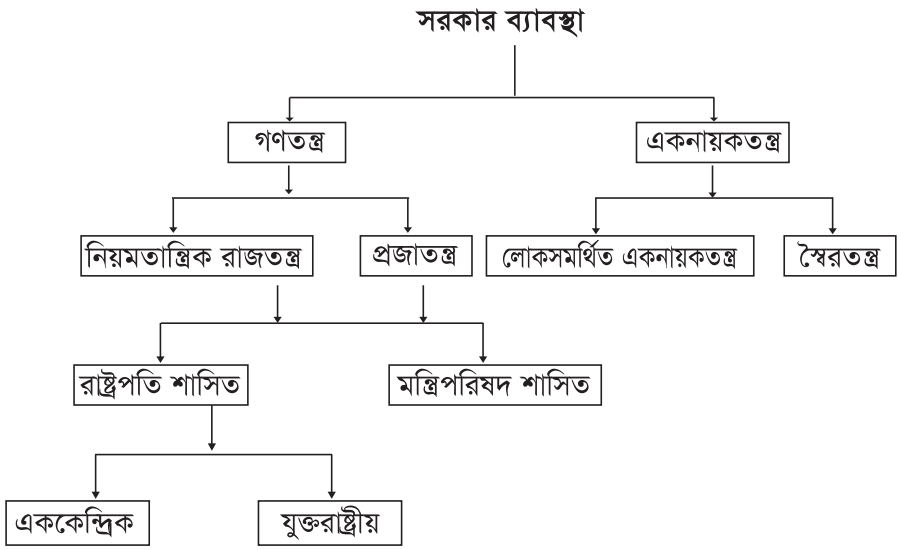

এছাড়া অর্থনৈতিক ভিত্তিতে সরকারকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় । যথা–

(১) পুঁজিবাদী ও (২) সমাজতান্ত্রিক ।

১। **পুঁজিবাদী :** পুঁজিবাদী যে ব্যবস্থায় ব্যক্তি মালিকানা, বিনিয়োগ ও মুনাফা অর্জনের উপর সরকারের কোন বাধা নিষেধ থাকে না তাকে পুঁজিবাদী সরকার বলে । যেমন – মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ।

২। **সমাজতান্ত্রিক :** আর যে ব্যবস্থায় ভূমি, শ্রম, মূলধন ও ব্যবস্থাপনা সহ উৎপাদনের সকল উপাদান রাষ্ট্রীয় মালিকানায় থাকে তাকে সমাজতান্ত্রিক সরকার বলে । যেমন– চীন ।

সারসংক্ষেপ

সরকার রাষ্ট্র গঠনের একটি উল্লেখযোগ্য ও অন্যতম উপাদান। সরকারের মাধ্যমে রাষ্ট্রের কর্মসূচি ও নীতিমালা প্রকাশিত ও কার্যকর হয়। সরকার রাষ্ট্রের মুখপাত্র সরকার রাষ্ট্রের ইচ্ছার বাস্তবায়ন করে। সরকার বলতে সেই জনগণকে বুঝায় যারা আইন প্রণয়ন, শাসন পরিচালনা ও বিচার কাজের সাথে জড়িত । সরকারের সাথে রাষ্ট্রের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। সরকারের বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগ রয়েছে। ক্ষমতার ভিত্তিতে সরকার দুই ধরনের। গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্র । গণতান্ত্রিক সরকার দুই ধরনের নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্র। আঞ্চলিক ক্ষমতা বণ্টনের ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক সরকার দু ধরনের । এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয়। আইন ও শাসন বিভাগের সম্পর্কের ভিত্তিতে গনতান্ত্রিক সরকার আবার দু ধরনের, সংসদীয় সরকার ও রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার। অর্থনৈতিক ভিত্তিতে সরকার পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক দুই ধরনের হয়ে থাকে ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

(ক) নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। রাষ্ট্রের ইচ্ছার প্রকাশ ও বাস্তবায়ন করে —
(ক) জনগণ (খ) রাজনৈতিক দল
(গ) সরকার (ঘ) বিচার বিভাগ

২। রাষ্ট্রকে জীবদেহের সাথে তুলনা করেছেন কে?
(ক) অধ্যাপক লাস্কী (খ) অধ্যাপক গার্নার?
(গ) জনলক (ঘ) ম্যাকাইভার

৩। লিকক আধুনিক সরকারকে কয় ভাগে ভাগ করেছেন?
(ক) দুই (খ) তিন
(গ) চার (ঘ) পাঁচ

৪। কোন ধরনের সরকারে ব্যক্তি মালিকানা স্বীকৃত নয়?
(ক) পুঁজিবাদী সরকার (খ) সমাজতান্ত্রিক সরকার
(গ) একনায়কতান্ত্রিক সরকার (ঘ) প্রজাতান্ত্রিক সরকার

৫। কোন সরকার উত্তম সরকার?
(ক) সমাজতন্ত্র (খ) একনায়কতন্ত্র
(গ) রাজতন্ত্র (ঘ) গণতন্ত্র

(খ) এক কথায় উত্তর দিন

১। সরকারকে এক কথায় কি বলা হয়?

২। সরকার কেন প্রয়োজন?

৩। সার্বভৌম ক্ষমতার ভিত্তিতে সরকারকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়?

৪। আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগের সম্পর্কের ভিত্তিতে রাষ্ট্রকে কয় ভাগে ভাগ করা হয়েছে এবং কি কি?

৫। পুঁজিবাদী সরকার কাকে বলে?

(ক) উত্তরমালা

১। (গ), ২। (খ), ৩। (গ), ৪। (ঘ), ৫। (ঘ)

পাঠ -২ : সংসদীয় ও রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- সংসদীয় সরকার বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার কি তা বলতে পারবেন ।
- সংসদীয় সরকারের দোষ-গুণ ব্যাখ্যা করতে পারবেন ।
- রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন ।
- রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের দোষ-গুণ জানতে পারবেন ।

সংসদীয় সরকার

যে শাসন ব্যবস্থায় শাসন বিভাগ তার কাজের জন্য আইনসভার নিকট দায়ী থাকে তাকে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার বলে । সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিসদ শাসন ব্যবস্থায় একজন নামমাত্র রাষ্ট্রপ্রধান থাকেন । সরকার পরিচালনার প্রকৃত ক্ষমতা থাকে আইনসভার আস্থাভাজন মন্ত্রিসভার হাতে । প্রধানমন্ত্রি হচ্ছেন মন্ত্রিসভার নেতা । সরকার প্রধান, মন্ত্রিসভা যতক্ষণ পর্যন্ত আইনসভার আস্থাভাজন থাকবেন ততক্ষণ শাসন ক্ষমতা পরিচালনা করতে পারবেন । আইনসভার অনাস্থা প্রকাশ পেলে মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করবে । মন্ত্রিসভার সদস্যগণ আইনসভার সদস্য । মন্ত্রিগণ ব্যক্তিগত ও যৌথভাবে সংসদের নিকট জবাবদিহি করেন । গ্রেট ব্রিটেন, ভারত, বাংলাদেশ, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্রে সংসদীয় সরকার প্রচলিত রয়েছে ।

সংসদীয় সরকারের গুণাবলি : সংসদীয় সরকার আধুনিককালে জনপ্রিয় শাসন ব্যবস্থা । এ সরকারের গুণাবলি নিম্নে আলোচনা করা হলো :

১। **দায়িত্বশীলতা :** মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার ব্যবস্থায় মন্ত্রিপরিষদ আইনসভার নিকট দায়ী থাকে, ফলে সরকার দায়িত্বশীল হয়ে ওঠে ।

২। **নমনীয়তা :** সংসদীয় সরকার নমনীয় প্রকৃতির । কেননা প্রয়োজনবোধে যে কোন সময় সরকার মন্ত্রিসভার পরিবর্তন করতে পারে ।

৩। **প্রতিনিধিত্ব মূলক শাসন ব্যবস্থা :** মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার জন প্রতিনিধিত্ব মূলক শাসন ব্যবস্থা । নিবার্চিত প্রতিনিধিদের দ্বারা এটি গঠিত হয় । জনমতের উপর ভিত্তি করে শাসন পরিচালনা করে ।

৪। **শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক :** সংসদীয় সরকারের শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে । মন্ত্রিসভা অতি সহেজে আইন পরিষদে আইন পাস করে নিতে পারে । কেননা মন্ত্রিপরিষদের সদস্যগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সদস্য ।

৫। **সুষ্ঠু শাসন ব্যবস্থা :** শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা থাকায় এ সরকার ব্যবস্থা সুষ্ঠু শাসন প্রতিষ্ঠায় সক্ষম ।

৬। **স্বেচ্ছাচার বিরোধী :** সংসদীয় শাসন ব্যবস্থায় মন্ত্রিসভার ক্ষমতায় টিকে থাকা না থাকা নির্ভর করে আইন সভার আস্থা ও অনাস্থার ওপর । মন্ত্রীগণ সংসদের আস্থা অর্জনের জন্য শাসন কার্য পরিচালনায় মনোযোগী হয় । ফলে স্বেচ্ছাচারী সরকার প্রতিষ্ঠার আশংঙ্কা দূর হয় ।

৭। **যোগ্য লোকের শাসন :** অধ্যাপক লাস্কীর মতে, "রাজনৈতিক অভিজ্ঞ এবং আইন পরিষদে প্রভাব বিস্তারে সক্ষম এমন সদস্যদের মন্ত্রিসভার নিয়োগদানের ফলে সংসদীয় ব্যবস্থায় যোগ্য লোকের শাসন কায়েম হয় ।"

৮। **দ্রুত আইন প্রণয়ন :** এই শাসন ব্যবস্থায় মন্ত্রিসভায় সদস্যাগণ আইনসভার সদস্য। প্রধানমন্ত্রি শুধু মন্ত্রিসভার নেতা নন, আইনসভারও নেতা। ফলে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিসভা অতি সহজে দ্রুত আইন প্রণয়ন করতে সক্ষম হয়।

সংসদীয় সরকারের দোষ

সংসদীয় সরকারের কিছু উল্লেখযোগ্য গুণ থাকলেও এর কিছু দোষ বা ত্রুটি আছে। সেগুলো নিম্নে আলোচনা করা হলো :

১। **সংকট কালে অনুপযোগী :** এ ব্যবস্থা সংকট মোকাবেলার উপযোগী নয়। মন্ত্রিপরিষদ ও আইন পরিষদের আলোচনার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয় বলে অনেক সময় দ্রুত সিদ্ধান্তের অভাবে সংকট উত্তরণ সম্ভব হয় না।

২। **অযোগ্যর শাসন :** এ শাসন ব্যবস্থাকে অযোগ্যর শাসন বলা হয়। কেননা মন্ত্রীগণ রাজনৈতিক নেতা হলেও প্রশাসনে দক্ষ ও পারদর্শী নয়। ফলে তাদেরকে আমলানির্ভর হয়ে শাসন কার্য পরিচালনা করতে হয়।

৩। **সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বৈরাচারী শাসন :** সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় সংসদের সংখাগরিষ্ঠ দল সরকার গঠন করে। সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকায় তাদের পতনের ভয় থাকে না, ফলে সরকার স্বৈরাচারী হয়ে উঠতে পারে।

৪। **স্থিতিশীলতার অভাব :** মন্ত্রিপরিষদ শাসিত শাসন ব্যবস্থায় মন্ত্রীদের কার্যকাল আইন পরিষদের আস্থার ওপর নির্ভরশীল। যে কোন সময় অনাস্থার মাধ্যমে মন্ত্রি পরিষদের পতন ঘটতে পারে। ফলে সরকার অস্থিতিশীল হতে পারে।

৫। **মন্ত্রিসভায় একনায়কত্ব :** এ ব্যবস্থায় দলীয় শৃঙ্খলা রক্ষার কঠোর দৃষ্টিভঙ্গির কারণে আইন সভার সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত না হয়ে বাস্তবে মন্ত্রিসভার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

৬। **দলীয় স্বার্থ :** সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় জাতীয় স্বার্থ অপেক্ষে অনেক সময় দলীয় স্বার্থই প্রাধান্য পায়। গঠনমূলক সমালোচনার পরিবর্তে বিরোধিতার খাতিরে বিরোধিতা নীতি বা দলাদলি প্রাধান্য পায়।

৭। **ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির অনুপস্থিতি :** সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় শাসন বিভাগের সদস্যগণ আইনসভার সদস্য, ফলে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি কার্যকর হয় না।

রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার

রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার বলতে সেই ব্যবস্থাকে বোঝায়, যেখানে রাষ্ট্রপতি প্রকৃত শাসন ক্ষমতার অধিকারী এবং তিনি তার মন্ত্রিমণ্ডলী দ্বারা শাসন কার্য পরিচালনা করেন। রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসন ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্র পরিচালনায় প্রকৃত ক্ষমতা প্রয়োগ করেন এবং তিনি তার কার্যনীতির জন্য আইন বিভাগের কাজে দায়ী নন, জবাবদিহি করতে বাধ্য নন।

এ ব্যবস্থায় মন্ত্রিপরিষদ রাষ্ট্রপতির অধীনস্থ এবং আজ্ঞাবহ কর্মচারী মাত্র, রাষ্ট্রপতির ইচ্ছা অনিচ্ছার উপরে মন্ত্রিপরিষদের মন্ত্রিত্ব নির্ভর করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, ব্রাজিল প্রভৃতি রাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার প্রচলিত আছে।

রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের গুণ

১। **দক্ষ শাসন ব্যবস্থা :** সমাজে এমন অনেক যোগ্য, সৎ ও দক্ষ ব্যক্তি আছেন যারা নির্বাচনী হাঙ্গামা এড়িয়ে চলেন, রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসন ব্যবস্থায় এ সমস্ত ব্যক্তিদের মন্ত্রী পদে নিযুক্ত করা সম্ভব। ফলে শাসন কার্যের দক্ষতা ও উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পায়।

২। **দ্রুত ও কার্যকর সিদ্ধান্ত :** রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার প্রয়োজন অনুযায়ী দ্রুত ও কার্যকর সিদ্ধান্ত নিতে পারে। সরকারের সিদ্ধান্তের জন্য আইনসভার সাথে আলোচনার সময় অপচয় করতে হয় না।

৩। **ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত :** রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। প্রতিটি বিভাগ একে অপরের নিয়ন্ত্রণমুক্ত হয়ে কার্যপরিচালনায় মনোনিবেশ করে এবং স্বীয় বিভাগের কাজের উন্নয়ন ঘটায়।

৪। **স্থায়ীত্ব :** এ সরকার তুলনামূলকভাবে স্থায়ী। যখন তখন সরকার পরিবর্তনের মত দুরবস্থার শিকারে পরিণত হয় না। নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট নির্বিঘ্নে সরকার পরিচালনা করে।

৫। **আইনসভার প্রভাব মুক্ত শাসন বিভাগ :** রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের মন্ত্রীগণ সংসদ সদস্যদের চাপমুক্ত থাকে। ফলে তারা নিরপেক্ষ ও স্বাধীনভাবে সরকারের নিয়ম-নীতি প্রয়োগ করতে পারে।

৬। **ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের সুফল ভোগ :** রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের ফলে শাসন বিভাগ স্বৈরাচারী ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে না। ফলে জনমনে স্বাধীনতার সুফল ভোগ করতে পারে।

৭। **উন্নয়নে সহায়ক :** রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার অপেক্ষাকৃত স্থায়ী বিধায় এ ব্যবস্থায় দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে জাতীয় উন্নয়ন করা সম্ভব হয়।

রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের ত্রুটি

রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের উল্লেখযোগ্য গুণাবলি থাকা সত্ত্বেও এর কতগুলো ত্রুটি আছে। যেমন–

১। **নেতৃতের সংকট :** এ শাসন ব্যবস্থায় রাজনৈতিক চর্চা কম হওয়ায় জনগণ রাজনৈতিক শিক্ষার দিক থেকে পিছিয়ে থাকে, ফলে রাজনৈতিক নেতৃত্বের সংকট সৃষ্টি হয়।

২। **দায়িত্বহীন সরকার :** রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারকে দায়িত্বহীন সরকার বলে অভিযুক্ত করা হয়। কেননা রাষ্ট্রপতি এবং মন্ত্রিপরিষদ তাদের কার্যনীতির জন্য আইন বিভাগের নিকট দায়ী নয়। আবার রাষ্ট্রপতিকে পদচ্যুত করাও সময় সাপেক্ষে ব্যাপার।

৩। **আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগের মধ্যে সম্পর্কের অভাব :** রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থায় আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগ একে অপর থেকে অনেকাংশে স্বাধীন ও বিচ্ছিন্ন। কিন্তু সুষ্ঠুভাবে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য উভয় বিভাগের মধ্যে সু-সম্পর্ক থাকা প্রয়োজন। না হলে সংকটকালে দেশে অচলাবস্থার সৃষ্টি হতে পারে।

৪। **অনমনীয় শাসন :** রাষ্ট্রপতি শাসিত ব্যবস্থায় সংবিধান সাধারণত সহজে পরিবর্তন করা যায় না। ফলে শাসন ব্যবস্থা ও অনমনীয় প্রকৃতির হয়। কোথাও কোন পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে তা সহজে করা যায় না। আবার রাষ্ট্রপতিকে সহজে পদচ্যুত করা যায় না বলে কাম্য পরিবর্তন ঘটানো কঠিন।

৫। **স্বেচ্ছাচারী শাসন :** রাষ্ট্রপ্রধানের হাতে দেশের সর্বময় কর্তৃত্ব থাকায় এবং মন্ত্রীগণ তার আজ্ঞাবহ হওয়ায় রাষ্ট্রপতি স্বেচ্ছাচারী শাসকে পরিণত হতে পারেন।

৬। **অপ্রতিনিধিত্বশীল :** রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি জনগণ কৃর্তক নির্বাচিত হলেও শাসন বিভাগের অন্যান্য মন্ত্রী জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি নন। ফলে তাদের কার্যনীতির মধ্যে জনগণের অভাব-অভিযোগ ও আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটে না।

৭। **আইন প্রণয়নে বাধা সৃষ্টি :** মন্ত্রিপরিষদ শাসনকার্য পরিচালনা করতে গিয়ে অনেক সময় নতুন আইনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। কিন্তু তারা আইন বিভাগের সদস্য না হওয়ায় সরাসরি আইন উত্থাপন করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন। ফলে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থায় অনেক সময় প্রয়োজন অনুযায়ী আইন প্রণয়নে বাধার সৃষ্টি হয়।

সারসংক্ষেপ

মন্ত্রিপরিষদ শাসিত শাসন ব্যবস্থা বলতে সেই শাসন ব্যবস্থাকে বোঝায়, যেখানে শাসন ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রীকে কেন্দ্র করে গঠিত মন্ত্রিপরিষদের উপর ন্যস্ত থাকে। মন্ত্রিপরিষদ তাদের কার্যাবলির জন্য আইন পরিষদের নিকট দায়ী থাকে। রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসন ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি প্রকৃত শাসন ক্ষমতার অধিকারী। তিনি তার মন্ত্রিপরিষদ দ্বারা শাসন কার্য পরিচালনা করেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

(ক) নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। সংসদীয় সরকার কোন প্রকৃতির?

(ক) নমনীয় (খ) অনমনীয়

(গ) জটিল (ঘ) স্বেচ্ছাচারী

২। রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের গুণ কোনটি?

(ক) নমনীয়তা (খ) স্থিতিশীলতা

(গ) অধিক সমলোচনার সুযোগ (ঘ) রাজনৈতিক সচেতনতা

৩। কোন দেশে সংসদীয় সরকার চালু আছে?

(ক) সৌদী আরবে (খ) ফ্রান্সে

(গ) বাংলাদেশে (ঘ) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে

৪। কোন দেশে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার চালু আছে?

(ক) বাংলাদেশ (খ) ব্রিটেন

(গ) ভারত (ঘ) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

(খ) এক কথায় উত্তর দিন

১। কোন কোন দেশে সংসদীয় সরকার চালু আছে?

২। রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের গুণগুলো কি কি?

৩। সংসদীয় সরকারের গুণগুলো কি কি?

৪। কোন্ কোন্ দেশে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার চালু আছে?

৫। মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারের দোষগুলো কি কি?

উত্তরমালা

১. (ক), ২. (খ), ৩. (গ), ৪. (ঘ)।

পাঠ-৩ : এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- এককেন্দ্রিক সরকার কি তা বলতে পারবেন ।
- এককেন্দ্রিক সরকারের দোষ-গুণ বর্ণনা করতে পারবেন ।
- যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার বলতে কি বুঝায় তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন ।
- যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের দোষ-গুণ আলোচনা করতে পারবেন ।

কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টনের ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক সরকার দুই ভাগে বিভক্ত । যথা–

(১)এককেন্দ্রিক সরকার

(২)যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার

এককেন্দ্রিক সরকার : এককেন্দ্রিক সরকার বলতে সেই সরকারকে বোঝায়, যেখানে রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতা একটিমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের উপর ন্যস্ত হয় ।

এই ব্যবস্থায় কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন করা হয় না । তবে কেন্দ্রীয় সরকার প্রয়োজনবোধে প্রাদেশিক সরকারকে কিছু ক্ষমতা প্রদান করে । এ ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণও করে কেন্দ্রীয় সরকার । অর্থাৎ প্রাদেশিক সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের এজেন্ট মাত্র । শাসন ক্ষমতা পরিচালিনার ক্ষেত্রে এরা কোন সাংবিধানিক স্বাধীনতা ভোগ করে না । যেমন : বাংলাদেশ, জাপান, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে এককেন্দ্রিক সরকার প্রচলিত আছে ।

এককেন্দ্রিক সরকারের গুণ

এককেন্দ্রিক সরকারের গুণগুলো নিম্নে আলোচনা করা হলো :

১। **দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ :** যেকোন সমস্যা মোকাবিলায় এককেন্দ্রিক সরকার দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে । কেন্দ্র কর্তৃক গৃহিত সিদ্ধান্ত সারা দেশে বাস্তবায়িত হয় বিধায় দ্রুত সমস্যার সমাধান হয় । সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত মতান্তর দেখা দেয়ার সম্ভবনা কম ।

২। **সুষ্ঠু শাসন ব্যবস্থা :** এ শাসন ব্যবস্থা প্রশাসনিক জটিলতা থেকে মুক্ত হওয়ায় সুষ্ঠুভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করতে পারে ।

৩। **নমনীয় প্রকৃতির :** এককেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থা নমনীয় প্রকৃতির । কেননা এ সরকার দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে । এ সরকার দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সংকটাপন্ন পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে পারে ।

৪। **মিতব্যয়ী সরকার :** এককেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থার সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন সহজ বিধায় সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম । সুতরাং প্রশাসনিক ব্যয়ও কম ।

৫। **সাংগঠনিক সরলতা :** এককেন্দ্রিক সরকারের সংগঠন সহজ ও সরল । এ ব্যবস্থায় সরকারের ক্ষমতা বণ্টন সংক্রান্ত কোন সংকট বা জটিলতা সৃষ্টি হয় না ।

৬। **ছোট রাষ্ট্রের উপযোগী :** এককেন্দ্রিক সরকার অভিন্ন কৃষ্টি সমৃদ্ধ ছোট রাষ্ট্রের জন্য উপযোগী ।

৭। **জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠায় সহায়ক :** এ ব্যবস্থায় সমগ্র দেশের জন্য একই আইন, নীতি ও পরিকল্পনা প্রণীত হয় । ফলে প্রশাসনিক সামঞ্জস্যতা বজায় থাকে এবং জাতীয় ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হয় ।

৮। **বিচ্ছিন্নতার মনোভাব জাগ্রত হয় না :** এই ব্যবস্থায় কোন অঞ্চলের বিচ্ছিন্ন হওয়ার সুযোগ নেই । কারণ স্বায়ত্তশাসন ভোগ করার সুযোগ নেই বলে বিচ্ছিন্নতার মানোভাব জাগ্রত হয় না ।

এককেন্দ্রিক সরকারের দোষ

১। **অধিকারহীন স্থানীয় সরকার :** এ শাসন ব্যবস্থায় স্থানীয় সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের সৃষ্টি। কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হতে প্রাপ্ত ক্ষমতা বাস্তবায়িত করাই এদের কাজ। এরা ক্ষমতা ব্যবহারে কোন সাংবিধানিক অধিকার ভোগ করে না।

২। **আমলাদের দৌরাত্ম্য বৃদ্ধি :** এককেন্দ্রিক সরকার কেন্দ্রীয় কার্য-নীতি স্থানীয় পর্যায়ে বাস্তবায়নের জন্য আমলাদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। ফলে আমলাদের দৌরাত্ম্য বেড়ে যায়।

৩। **কেন্দ্রীয় সরকারের উপর প্রবল চাপ :** সাংবিধানিকভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে প্রবল চাপ থাকায় কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর প্রবল চাপ পড়ে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমুদয় কাজ কেন্দ্রীয় সরকারকে সমাধান করতে হয়। ফলে, প্রশাসকগণ অফিসের রুটিন কাজের চাপে জনহিতকর কাজের প্রতি উদাসীন হয়ে পড়ে।

৪। **স্বায়ত্তশাসনের অভাব :** এই সরকারে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন থাকে না। ফলে অঞ্চলগুলোর প্রশাসন ও প্রয়োজনীয় অর্থের জন্য কেন্দ্রের দ্বারস্থ হতে হয়।

৫। **ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের সুফল পায় না :** সরকারের সমুদয় ক্ষমতা একটি কেন্দ্রের উপর ন্যস্ত থাকায় কেন্দ্রীয় সরকারের উপর দায়িত্বের বোঝা বৃদ্ধি পায়। ফলে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীয়করণের সুফল থেকে এ সরকার বঞ্চিত হয়।

৬। **বৃহৎ রাষ্ট্রের অনুকূল নয় :** এককেন্দ্রিক সরকার বৃহৎ রাষ্ট্রের জন্য অনুকূল নয়। অভিন্ন আইন দ্বারা সমস্যার সমাধান করা হয় বলে আঞ্চলিক স্বার্থ, বৈশিষ্ট্য ও সাংস্কৃতির যথাযথ মূল্যায়ন সম্ভব নয়।

৭। **স্থানীয় নেতৃত্ব বিকাশের অনুপযোগী :** এককেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থায় স্থানীয় পর্যায়ে রাজনীতি চর্চা কম হওয়ায় স্থানীয় নেতৃত্ব বিকাশের সুযোগ কম।

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার

যেখানে রাষ্ট্রের শাসন সংক্রান্ত যাবতীয় ক্ষমতা সংবিধানের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে বণ্টন করে দেয়া হয় তাকে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার বলে। ইংরেজি 'Federation' শব্দটি ল্যাটিন শব্দ 'Foedus' হতে উদ্ভূত যার অর্থ মিলন বা সন্ধি। উৎপত্তিগত অর্থে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার বলতে, কয়েকটি রাষ্ট্র মিলিত হয়ে যে সরকার গঠন করে তাকে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার বলে।

অধ্যাপক ডাইসি বলেন, "যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার হলো জাতীয় ঐক্যের সঙ্গে অঙ্গরাজ্যের অধিকারের সামঞ্জস্য বিধানের লক্ষ্যে গঠিত রাজনৈতিক সংগঠন।" ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা প্রভৃতি দেশে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থা চালু রয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের গুণাবলি

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের কতিপয় গুণাবলি রয়েছে। নিম্নে আলোচনা করা হলো :

১। **শক্তিশালী ও সমৃদ্ধশালী রাষ্ট্র :** যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থায়, ক্ষুদ্র ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে দুর্বল রাষ্ট্রগুলো একত্রিত হয়ে শক্তিশালী এবং সমৃদ্ধশালী রাষ্ট্র গঠন করতে সক্ষম হয়।

২। **কেন্দ্রীয় সরকারের কাজের চাপ লাঘব করে :** এই সরকার ব্যবস্থায় সংবিধানের মাধ্যমে কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে ক্ষমতা ভাগ করে দেয়া হয়। ফলে কেন্দ্রের উপর কাজের চাপ কমে যায়।

৩। **স্বৈরশাসন প্রতিরোধ :** যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় ক্ষমতা সুনির্দিষ্টভাবে সংবিধানের মাধ্যমে প্রদেশ ও কেন্দ্রের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন করা হয়। ফলে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার স্বেচ্ছাচারী হতে পারে না।

৪। **আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের প্রসার :** যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের প্রসার ঘটে। প্রদেশের জনসাধারণের মধ্যে স্বায়ত্তশাসনের অভিজ্ঞতারও ব্যাপ্তি ঘটে।

৫। **স্থানীয় নেতৃত্বের বিকাশ ঘটায় :** এ সরকার একদিকে জাতীয় এবং অন্যদিকে স্থানীয় নেতৃত্ব গড়ে ওঠার সুযোগ দেয়। স্থানীয় ও জাতীয় নেতৃত্বের যোগ্যতা অর্জন করা একমাত্র যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থায় সম্ভব হয়।

৬। **বৃহৎ ও বৈচিত্র্যময় রাষ্ট্রের জন্য উপযোগী :** বৃহৎ ও বৈচিত্র্যময় রাষ্ট্রের জন্য যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থা খুবই কার্যকর ও উপযোগী। কেননা যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় সরকার দুই বিপরীতমুখী প্রবণতাকে কেন্দ্র করে প্রতিষ্ঠিত। একদিকে যুক্ত হতে চায়, অন্যদিকে আঞ্চলিক স্বকীয়তা বজায় রাখতে চায়।

যুক্তরাষ্ট্রীয় সকারের দোষ :

আধুনিক বিশ্বে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থা নিঃসন্দেহে একটি কাম্য শাসন ব্যবস্থা। কিন্তু এ সরকারের কিছু অন্তর্নিহিত দোষ আছে। নিম্নে সেগুলো আলোচনা করা হলো :

১। **দুর্বল সরকার :** এই সরকার দুর্বল প্রকৃতির হয়ে থাকে। ক্ষমতা বণ্টনের ফলে জাতীয় ও আঞ্চলিক সরকার উভয়ে দুর্বল অবস্থায় থাকে। জরুরি অবস্থায় বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব হয় না। আঞ্চলিক সরকারগুলোর মতামতের প্রয়োজন দেখা দিলে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অনেক বিলম্ব ঘটে।

২। **ব্যয়বহুল সরকার ব্যবস্থা :** এই সরকার ব্যবস্থা ব্যয়বহুল। দ্বৈত সরকারের কাঠামো তৈরি ও বজায় রাখতে গিয়ে অনেক বাহুল্য খরচের সম্মুখীন হতে হয়।

৩। **সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব :** সুদূর প্রসারী রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত বিলম্বিত ও বাধাগ্রস্ত হয়। ফলে জনকল্যাণ বিঘ্নিত হয় ও রাষ্ট্র দুর্বল হয়ে পড়ে।

৪। **শাসনতান্ত্রিক জটিলতা :** যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় শাসনতান্ত্রিক জটিলতা সৃষ্টি করে। অঙ্গরাজ্যগুলো নিজ নিজ বিষয়ে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে স্বাধীন বলে এক অঙ্গরাজ্যের অধিবাসী অন্য অঙ্গরাজ্যে গিয়ে বিপরীতমুখী আইনের সম্মুখীন হয়ে বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে পারেন।

৫। **বিচ্ছিন্ন হওয়ার ভয় :** যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় প্রদেশগুলোর পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন প্রদান করায় তারা বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা লাভ করে। ফলে সামান্য ভুল বুঝাবুঝির কারণে প্রদেশগুলোর বিছিন্ন হওয়ার ভয় থাকে।

৬। **জাতীয় উন্নয়ন বিঘ্নিত :** শাসন ক্ষমতা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যাওয়ার কারণে জাতীয় পর্যায়ে অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগে। ফলে জনকল্যাণ ও জাতীয় উন্নয়ন ব্যাহত হয়।

৭। **নাগরিকদের ঔদাসীন্য :** যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থায় নাগরিকদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড প্রদেশকে কেন্দ্র করে গঠিত হয় বিধায় তারা কেন্দ্রীয় সরকার ও জাতীয় রাজনীতি সম্পর্কে উদাসীন হয়ে পড়ে। তাই বলা যায়, যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থা নাগরিকদের উদাসীনতা জন্ম দেয়।

সারসংক্ষেপ

কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টনের ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থাকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয়। যখন শাসন ক্ষমতা একটা কেন্দ্রের হাতে থাকে তখন তাকে এককেন্দ্রিক সরকার বলে। আর শাসন ক্ষমতা যখন কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে বণ্টন করে দেয়া হয় তখন তাকে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার বলে। ছোট রাষ্ট্রের জন্য এককেন্দ্রিক সরকার উপযোগী। আর বৃহৎ রাষ্ট্রের জন্য যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থা উপযোগী।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

(ক) নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। এক কেন্দ্রিক সরকারের ক্ষমতা কার হাতে থাকে?

(ক) অঙ্গরাজ্য খ) প্রাদেশিক সরকার

গ) কেন্দ্রীয় সরকার ঘ) আঞ্চলিক সরকার

২। এককেন্দ্রিক সরকারের গুণ কোনটি?

(ক) নমনীয়তা খ) অনমনীয়তা

গ) বড় রাষ্ট্রের উপযোগী ঘ) শক্তিশালী রাষ্ট্র গঠনে সহায়ক

৩। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের ক্ষমতা কিভাবে বণ্টন করা যায়?

(ক) প্রদেশের ইচ্ছায় খ) কেন্দ্রের ইচ্ছায়

গ) প্রাদেশিক সরকারে ইচ্ছায় ঘ) সাংবিধানিকভাবে

৪। যুক্তরাষ্ট্রের দোষ কোনটি?

(ক) জটিল পদ্ধতির শাসন খ) নমনীয়

গ) পরিবর্তনশীল ঘ) কেন্দ্রের স্বেচ্ছাচার।

(খ) এক কথায় উত্তর দিন

১। কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে ক্ষমতা বন্টনের ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক সরকার কয় ভাগে বিভক্ত।

২। এককেন্দ্রিক সরকার ব্যবস্থার কোন কোন দোষ রয়েছে?

৩। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার কি?

৪। ভারত, কানাডা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কোন ধরনের সরকার রয়েছে?

(ক) উত্তরমালা

১। (গ), ২। (ঘ), ৩। (ঘ), ৪। (ক)

পাঠ-৪ : গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্র

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- গণতন্ত্রের সংজ্ঞা বর্ণনা করতে পারবেন ।
- গণতন্ত্রের দোষ-গুণ ব্যাখ্যা করতে পারবেন ।
- একনায়কতন্ত্রের সংজ্ঞা বর্ণনা করতে পারবেন ।
- একনায়কতন্ত্রের দোষ-গুণ বর্ণনা করতে পারবেন ।

গণতন্ত্রের সংজ্ঞা

বর্তমানকালে 'গণতন্ত্র' সবচেয়ে জনপ্রিয় ও গ্রহণযোগ্য সরকার ব্যবস্থ্যা । গণতন্ত্রে জনগণ সকল ক্ষমতার উৎস । গণতন্ত্রের ইংরেজি শব্দ Democracy শব্দটি গ্রিক শব্দ 'Demos' এবং 'Kratos' বা 'Kratia' থেকে উদ্ভূত । যার অর্থ জনগণ ও শাসনক্ষমতা । অর্থাৎ গণতন্ত্র হচ্ছে জনগণের শাসন ক্ষমতা । গণতন্ত্রে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা দিয়েছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিঙ্কনের মতে, "Democracy is a government of the people, by the people and for the people."

অধ্যাপক ডাইসি বলেছেন, "গণতন্ত্র হচ্ছে এমন একটি শাসন ব্যবস্থা যেখানে শাসকগণ তুলনামূলকভাবে জনসংখ্যার একটি বিরাট অংশ ।" গণতন্ত্র আধুনিককালে সবচেয়ে জনপ্রিয় সরকার ব্যবস্থা । গণতান্ত্রিক সরকারকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় ।

(১) প্রজাতন্ত্র (২) নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র ।

প্রজাতন্ত্র : এ ব্যবস্থায় রাষ্ট্র প্রধান জনগণ কর্তৃক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন । আমাদের বাংলাদেশ একটি প্রজাতন্ত্র । মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত ।

নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র : রাজতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থায় রাজা থাকেন নিয়মতান্ত্রিক প্রধান । তবে নিয়মতান্ত্রিক রাজতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থায় প্রকৃত ক্ষমতা থাকে জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে । এরূপ সরকার ব্যবস্থা যুক্তরাজ্যে চালু রয়েছে ।

গণতন্ত্রের গুণাবলি

গণতন্ত্র জনপ্রিয় শাসন ব্যবস্থা । জনগণের কল্যাণে এ সরকার ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটেছে । বস্তুত গণতন্ত্র গুণের অধিকারী । নিম্নে সেগুলো আলোচনা করা হলো :

১ । **আইনের শাসন :** গণতন্ত্র আইনকে সর্বোচ্চ আসনে রাখে । কোন ব্যক্তিকে বিনা কারণে শাস্তি দেয়া যাবে না । বিনা বিচারে আটকে রাখা যাবে না । আইনের চোখে সবাই সমান ।

২ । **রাষ্ট্র পরিচালনায় সকলের অংশগ্রহণ :** গণতন্ত্রে যেহেতু সকল ক্ষমতার উৎস জনগণ, সেহেতু রাষ্ট্র পরিচালনায় সকলের অংশগ্রহণ থাকে ।

৩ । **দায়িত্বশীল শাসন :** জনপ্রতিনিধিগণ তাদের কাজের জন্য জনগণের কাছে দায়ী থাকেন ফলে তাদের জবাবদিহিতা থাকে । এ কারণে এ সরকার দায়িত্বশীল ।

৪ । **নাগরিক মর্যাদা বৃদ্ধি :** এই সরকার নাগরিকদের মর্যাদা ও ব্যক্তিত্ববোধ প্রতিষ্ঠায় সহায়ক । রাষ্ট্রীয় কাজে নাগরিকগণের অংশগ্রহণ তাদের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগ্রত করে ।

৫ । **সাম্য ও স্বাধীনতা সংরক্ষণ :** গণতন্ত্র সাম্য ও স্বাধীনতার মত মহান আদর্শে বিশ্বাসী । "মানুষে মানুষে ভেদাভেদ নেই, সকল মানুষই সমান" গণতন্ত্র এই মহান আদর্শকে রাষ্ট্রের বিভিন্ন কার্মকাণ্ডে প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টা চালায় । গণতন্ত্র ব্যক্তি স্বাধীনতা সংরক্ষণ করে ।

৬। **বিপ্লবের আশঙ্কা হ্রাস :** গণতন্ত্রে শান্তিপূর্ণ সরকার পরিবর্তনের ব্যবস্থা থাকায় বিপ্লব বা হিংসাত্মক কার্যাবলির মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের প্রয়োজন হয় না। কেননা নির্বাচনের মাধ্যমে শাসকগোষ্ঠীকে বিনা রক্তপাতে ক্ষমতা থেকে বিদায় করা যায় বা পছন্দনীয় দল বা ব্যক্তিকে ক্ষমতায় বসানো যায়।

৭। **জনসম্মতি ভিত্তিক :** গণতান্ত্রিক সরকার গঠিত হয় জনগণের সম্মতিক্রমে। জনসমর্থন হারালে নির্বাচনে সরকারকে পরাজিত হতে হয়। সুতরাং, গণতন্ত্র হচ্ছে জনসম্মতি-ভিত্তিক শাসন ব্যবস্থা।

৮। **নমনীয় শাসনব্যবস্থা :** গণতন্ত্র নমনীয় শাসনব্যবস্থা। প্রয়োজনীয় মুহূর্তে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে শাসক বদল করা যায়। গণতন্ত্রে শাসকগণ পরিবর্তিত পরিস্থিতি মোকাবিলায় নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টাতে পারে।

গণতন্ত্রের দোষ

বিশ্বের কোনো কিছুই ত্রুটিহীন নয়। গণতন্ত্র উত্তম শাসন ব্যবস্থা হলেও এর দোষ আছে। নিম্নে সেগুলো আলোচনা করা হলো :

১. **সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব :** এই ব্যবস্থা অধিক জনপ্রতিনিধি থাকায় যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব হয়।

২. **দলীয় মনোভাব :** এ ব্যবস্থায় দলীয় সংকীর্ণ মানসিকতা চরমে ওঠে এবং সবকিছু দলীয়ভাবে চিন্তা করা হয়।

৩. **ব্যয়বহুল :** এ ব্যবস্থায় বহু জনগণ জড়িত থাকার কারণে সরকারের ব্যয় বাড়ে। ফলে সরকারের প্রচুর অপচয় হয়।

৪. **দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কঠিন :** গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা কঠিন। কেননা, গণতন্ত্রে যখন-তখন সরকারের পতন ঘটতে পারে। ফলে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা কঠিন হয়ে পড়ে ।

৫. **গণতন্ত্র স্থিতিশীল নয় :** গণতন্ত্রে দলাদলির জন্য জাতীয় ঐক্য নষ্ট হয় এবং সরকারের স্থিতিশীলতা নষ্ট হয়। মিথ্যা আশ্বাস প্রদান করে জনগণকে বিভ্রান্ত করে একটি দল অনায়াসেই ক্ষমতায় আসতে পারে।

৬. **স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতি :** গণতন্ত্রে দলীয়করণ, স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতি চরমে ওঠে। ফলে সমাজে অরাজকতা বৃদ্ধি পেতে পারে।

৭. **অজ্ঞ ও অযোগ্যদের শাসন :** প্লেটো, এরিস্টটল গণতন্ত্রকে মূর্খ ও অযোগ্য লোকদের শাসন ব্যবস্থা মনে করতেন। কারণ, তাঁদের মতে, অধিকাংশ মানুষ অশিক্ষিত হওয়ায় তারা যোগ্য প্রার্থী নির্বাচনে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে না।

৮. **দ্রুত নীতি পরিবর্তন :** এই ব্যবস্থায় সরকার পরিবর্তনের সাথে সাথে দলীয় স্বার্থে ঘন ঘন নীতি পরিবর্তিত হয়। ফলে দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়।

৯. **আবেক দ্বারা পরিচালিত :** গণতন্ত্রে আবেগের প্রভাব বেশি। আবেগময় বক্তৃতার জোরে এখানে মানুষকে সহজেই বশ করা যায়। সম্মোহনী বক্তৃতা দিয়ে দুর্নীতিপরায়ণ ও অযোগ্য ব্যক্তিও নির্বাচিত হয়।

একনায়কতন্ত্র

একনায়কতন্ত্রের সংজ্ঞা : একনায়কতন্ত্র বলতে সেই শাসন ব্যবস্থাকে বোঝায়, যেখানে রাষ্ট্র পরিচালনার সামগ্রিক ক্ষমতা একজন ব্যক্তি বা একজন 'নায়ক' হস্তগত করেন। তার বিরুদ্ধাচারণ তিনি কঠোর হস্তে দমন করেন। তিনি চরম ক্ষমতার অধিকারী, তার আদেশই আইন। তিনি কোন প্রকার সমালোচনা সহ্য করেন না। একনায়কতন্ত্র একজন চরম শাসক নিয়ে গঠিত। একনায়কতন্ত্র ব্যক্তি স্বাধীনতার বিরোধী। একনায়কতন্ত্রে প্রচার মাধ্যমগুলোর উপর বিধি নিষেধ আরোপ করা হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর স্পেন, ইতালি ও জার্মানিতে

একনায়কতান্ত্রিক সরকারের অবির্ভাব ঘটে। জার্মানির হিটলার, ইতালির মুসোলিনি এবং স্পেনের ফ্রাংকো একনায়ক ছিলেন।

একনায়কতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য

১. জনমত বা জনপ্রতিনিধিগণের মতামত ও পরামর্শ গ্রহণের দায়বদ্ধতা না থাকায় একনায়ক দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারনে।

২. ছলে-বলে-কৌশলে একজন একনায়ক দীর্ঘদিন একক নিয়ন্ত্রণে শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করার প্রয়াস পেয়ে থাকেন।

৩. একনায়কের নেতৃত্বাধীন শাসন ব্যবস্থার সবচেয়ে বড় ত্রুটি কর্তৃত্বহীন ক্ষমতা ধারণ ও প্রয়োগ, যা একনায়কের নেতৃত্বের প্রধান অযোগ্যতা প্রমাণ করে। একনায়ক উচ্চাভিলাষী, পরমত অসহিষ্ণু, গণতন্ত্রে আস্থা ও সম্মানবোধহীন এবং দাম্ভিক হয়ে থাকেন।

একনায়কতন্ত্রের গুণ

একনায়কতন্ত্র একচেটিয়া ও সর্বাত্মক ধরণের সরকার হলেও এর কিচু গুণ আছে। নিম্নে সেগুলো আলোচনা করা হলো :

১। **যোগ্য নেতৃত্ব** : একনায়ক সাধারণত অসাধারণ গুণাবলির অধিকারী হন। তার মধ্যে এমকন এক সম্মোহনী নেতৃত্বে থাকে যা সকলকে আকৃষ্ট করে। রাষ্ট্র পরিচালনায় তাঁর দক্ষতা অপরিসীম।

২। **দ্রুত কর্ম সম্পাদন** : একনায়ক রাষ্ট্র পরিচালনায় সর্বেসর্বা। তাই তিনি কর্ম সম্পাদনে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। সিদ্ধান্ত গ্রহণে তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন। ফলে যে কোনো সমস্যার তিনি দ্রুত মোকাবেলা করতে পারেন।

৩। **সাংগঠনিক সরলতা** : একনায়কতন্ত্র সরল প্রকৃতির কাঠামোর অধিকারী। এখানে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ নেই। একজনের সিদ্ধান্ত সকল স্তরে কার্যকর হয়। কাজেই স্তরে স্তরে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য বহু প্রশাসনিক ধাপের প্রয়োজন হয় না। ফলে নির্বাহী খরচও কম হয়।

৪। **ঐক্য ও শৃঙ্খলার সহায়ক** : একনায়ক চূড়ান্ত আনুগত্য আদায়ের মাধ্যমে জাতীয় ঐক্য ও কঠোর শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সক্ষম। একনায়কের গুণগান জাতীয় কর্তব্যে পরিণত হয় বিধায় একনায়কের প্রতি সকলেই আনুগত্য দেখায়।

একনায়কতন্ত্রের দোষ :

একনায়কতন্ত্রের কিছু দোষ রয়েছে। নিম্নে তা আলোচনা করা হলো–

১. **জনমত ভিত্তিক নয় :** একনায়কতন্ত্র জনমতের উপর নির্ভরশীল নয়। বরং, একনায়কতন্ত্রী জনগণের মতামতকে কঠোর হস্তে দমন করে থাকে।

২. **শান্তি বিরোধী :** একনায়কতন্ত্র শান্তি নয়, বরং যুদ্ধে বিশ্বাসী। এ ব্যবস্থা বিশ্বশান্তি বা সহযোগিতায় বিশ্বাস করে না। যুদ্ধ এবং সাম্রাজ্য বিস্তারে গৌরববোধ করে।

৩. **অস্থায়ী ব্যবস্থা :** একনায়কতন্ত্র মূলত অস্থায়ী ব্যবস্থা। একনায়কের মৃত্যু হলে বা দলীয় ব্যবস্থার অবসান হলে রাষ্ট্রের আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়।

৪. **ব্যক্তিস্বাধীনতা বিরোধী :** এ ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের লক্ষ্য অর্জনের জন্য ব্যক্তিকে বিসর্জিত হতে হয়। ব্যক্তির রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক নৈতিকতা পর্যন্ত রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। ফলে, ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকশিত হয় না।

৫. **বিপ্লবের সম্ভাবনা :** একনায়তন্ত্রে কোন নিয়ম থাকে না। ফলে সরকার পরিবর্তনের সকল নিয়মতান্ত্রিক পথ বন্ধ হয়ে যায়। শাসন ব্যবস্থায় জনগণের অংশগ্রহণ না থাকায় সরকার পরিবর্তনের আন্দোলন বা বিপ্লবের পথ বেছে নিতে হয়। ফলে রাষ্ট্রের শাসন কাঠামো ভেঙ্গে পড়ে।

৬. **স্বৈরাচারী শাসন :** একনায়ক তার কাজের জন্য কারও নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকেন না। তার সিদ্ধান্তই আইন। উপদেষ্টা বা মন্ত্রীগণ তার নিকট দায়ী থাকেন। ফলে তিনি স্বৈরাচারী হয়ে ওঠেন।

৭. **রাষ্ট্রের প্রাধান্য :** রাষ্ট্র সব কিছুর উর্ধ্বে। "রাষ্ট্রের জন্য সব, জনগণের জন্য রাষ্ট্র নয়,"– এরূপ পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে। জনগণের বাক স্বাধীনতা, চলাফেরার স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা থাকে না।

সারসংক্ষেপ

বর্তমানকালে সরকার দুই ধরনের। একনায়কতন্ত্র ও গণতন্ত্র। গণতান্ত্রিক সরকার দুই প্রকার : নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্র। বর্তমানকালে গণতন্ত্র সবচেয়ে উত্তম ও গ্রহণযোগ্য সরকার ব্যবস্থা। একনায়কতন্ত্র একমতে বিশ্বাসী। এটি একটি স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থায় স্বাধীনতাকে খর্ব করা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

(ক) নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। আধুনিক সরকারকে প্রধানত কয়ভাগে ভাগ করা হয়?
(ক) দুই খ) তিন গ) চার ঘ) পাঁচ

২। কোনটি উত্তম সরকার?
(ক) গণতন্ত্র খ) রাজতন্ত্র গ) স্বৈরতন্ত্র ঘ) একনায়কতন্ত্র

৩। কোনটি গণতান্ত্রিক সরকারের গুণ-
(ক) দ্রুত সিদ্ধান্ত খ) দায়িত্বশীল শাসন গ) সরল সরকার কাঠামো ঘ) স্বেচ্ছাচারী শাসন

৪। গণতান্ত্রিক সরকার কিসের উপর প্রতিষ্ঠিত?
(ক) নির্বাচনের উপর খ) সম্মতির উপর গ) বিপ্লবের উপর ঘ) শক্তির উপর

৫। একনায়কতন্ত্রে প্রকৃত ক্ষমতা কার হাতে?
(ক) জনগণের হাতে খ) শাসক দলের হাতে গ) শাসন বিভাগের হাতে ঘ) একজনের হাতে

(খ) এক কাথায় উত্তর দিন

১। গণতন্ত্রের ইংরেজী শব্দ কি?
২। গণতান্ত্রিক সরকার কয়ভাগে বিভক্ত?
৩। গণতন্ত্রে প্রকৃত ক্ষমতা কার হাতে থাকে?
৪। একনায়কতন্ত্র কাকে বলে?
৫। একনায়কতন্ত্রে প্রকৃত ক্ষমতা কার হাতে থাকে?
৬। রাষ্ট্রকে সকল কিছুর উর্ধ্বে স্থান দেয় কোন সরকার ব্যবস্থা?

উত্তরমালা

১। (ক), ২। (ক), ৩। (খ), ৪। (ক), ৫। (ঘ)

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

(ক) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন :

১। সরকার বলতে কি বোঝায়?
২। সংসদীয় সরকার বলতে কি বোঝায়?
৩। রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার কাকে বলে?
৪। এককেন্দ্রিক সরকার কি?
৫। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার কি?
৬। গণতন্ত্র বলতে কি বোঝায়?
৭। একনায়কতন্ত্র কাকে বলে?
৮। গণতন্ত্রের গুণ কি কি?

(খ) রচনামূলক প্রশ্ন

১। সরকারের সংজ্ঞা দিন। রাষ্ট্রের সাথে সরকারের সম্পর্ক আলোচনা করুন।
২। সরকারের শ্রেণীবিভাগ আলোচনা করুন।
৩। সংসদীয় সরকার কি? এর গুণ ও দোষগুলো আলোচনা করুন।
৪। রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার কি? এর গুণ ও দোষগুলোর বিবরণ দিন।
৫। এককেন্দ্রিক সরকার কি? এককেন্দ্রিক সরকারের গুণ ও দোষ বর্ণনা করুন।
৬। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের সংজ্ঞা দিন। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের গুণ ও দোষ বর্ণনা করুন।
৭। গণতন্ত্রের সংজ্ঞা দিন। গণতন্ত্রের গুণ ও দোষগুলো আলোচনা করুন।

ইউনিট ৯

সরকারের বিভিন্ন অঙ্গ

ভূমিকা

রাষ্ট্র গঠনের অন্যতম প্রধান উপাদান হলো সরকার। সরকার রাষ্ট্রের চালিকা শক্তি। জনগণের মুখপাত্র হিসেবে সরকার আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-প্রশাসনিক কার্যাবলি সম্পাদন করে। সরকারের তিনটি বিভাগ রয়েছে। যথা– আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগ। বর্তমান ইউনিটে নিম্নোক্ত পাঠগুলো আলোচনা করা হলো :

পাঠ-১ : আইন বিভাগ ও এর কার্যাবলি।
পাঠ-২ : শাসন বিভাগ ও এর কার্যাবলি।
পাঠ-৩ : বিচার বিভাগের গঠন, কার্যাবলি এবং স্বাধীনতা।

পাঠ-১ : আইন বিভাগ ও এর কার্যাবলি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- আইন বিভাগ সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- আইন বিভাগের কার্যাবলি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

ভূমিকা

সরকার হলো রাষ্ট্রের চালিকাশক্তি। জনগণের মুখপাত্র হিসেবে সরকার তার রাজনৈতিক কার্যাবলি পরিচালনা করে। সরকারের মধ্যমেই রাষ্ট্রীয় উদ্দেশ্যাবলি সার্থকরূপ নেয়। সরকারকে রাষ্ট্রীয় উদ্দেশ্যাবলি সাধন করার জন্য বহুবিধ কার্য সম্পাদন করতে হয়। সরকারের এ বহুবিধ কার্য মূলত তিনটি বিভাগের মাধ্যমে সম্পাদন করে। যথা–

(১) আইন বিভাগ (২) শাসন বিভাগ এবং (৩) বিচার বিভাগ।

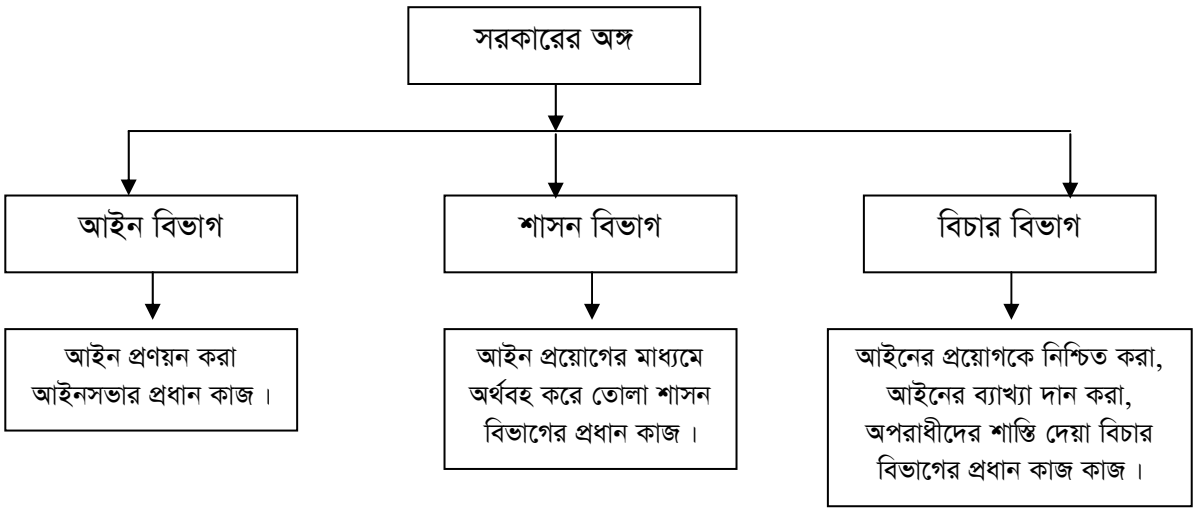

আইন বিভাগ

সরকারের তিনটি বিভাগের মধ্যে আইন বিভাগ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। বর্তমান বিশ্বে রাষ্ট্র জনকল্যাণমূলক কাজ করে থাকে। জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রে সরকারের কাজকর্ম নির্ধারণ ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে আইন বিভাগের ভূমিকা অনস্বীকার্য। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় আইন বিভাগকে অন্যান্য বিভাগ থেকে শক্তিশালী মনে করা হয়। কারণ এটি সরকারের নীতি নির্ধারক যন্ত্র ও রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয় আইন সরবরাহকারী সংস্থা।

আইন বিভাগের আইন প্রণয়নের ওপর সরকারের অন্যান্য বিভাগের কার্যাবলি নির্ভরশীল। আইন বিভাগ আইন প্রণয়ন না করলে অন্যান্য বিভাগগুলো কার্যকর হতে পারে না।

অধ্যাপক গার্নারের মতে, "যে সমস্ত বিভাগের মাধ্যমে রাষ্ট্রের অভিপ্রায় ব্যক্ত ও বলবৎ করা হয়, তার মধ্যে আইন বিভাগের স্থান সবার উপরে।"

বিভিন্ন দেশে আইনসভার কার্যাবলি বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। বিভিন্ন ধরনের সরকার পদ্ধতির কারণেই আইনসভায় কার্যাবলি ভিন্ন প্রকৃতির হয়ে থাকে। আইনসভার কার্যাবলি নিম্নে আলোচনা করা হলো :

১। **আইন প্রণয়ন :** আইন সভার প্রধান ও অন্যতম কাজ হচ্ছে আইন প্রণয়ন করা। আইনসভা আইন প্রণয়ন করে, শাসনবিভাগ প্রয়োগ করে, বিচার বিভাগ বাস্তবায়ন করে। জনগণের ইচ্ছা ও জাতির আদর্শ বাস্ত বায়নের প্রয়োজনে আইন সভা নতুন আইন তৈরি করে।

২। **আইন সংশোধন :** প্রয়োজনে আইনসভা রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রাচীন আমলের আইনকে বাতিল করে সেখানে নতুন আইন তৈরি করতে পারে। প্রচলিত আইনের সংশোধন করাও এ সভার গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

৩। **সংবিধান রচনা :** আইনসভা সংবিধান রচনা করে থাকে। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ 'গণপরিষদ' হিসেবে সংবিধান রচনা করেছিল, পরবর্তীতে আইনসভা হিসেবে কাজ করে। ব্রিটিশ পার্লামেন্ট আইন তৈরি করতে পারে, সংশোধনও করতে পারে, আবার বাতিল করতেও সক্ষম। সুতরাং আইন সভা সংবিধান রচনা ও সংশোধন করতে পারে।

৪। **জনপ্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থা হিসেবে কাজ :** আইনসভা জনপ্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থা হিসেবে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে কাজ করে। জনপ্রতিনিধিরা আইনসভায় জনগণের অভাব অভিযোগ তুলে ধরে।

৫। **বিচার সংক্রান্ত কাজ :** আইনসভা কিছু বিচার সংক্রান্ত কাজ করে থাকে। ব্রিটেনের আইনসভার উচ্চ কক্ষ লর্ড সভা সর্বোচ্চ আপিল আদালত হিসেবে গণ্য হয়। আইনসভা তার নিজ সদস্যদের অসদাচারণেরও বিচার করতে পারে।

৬। **জনমত গঠন সংক্রান্ত :** আইনসভা জনমত গঠনের অন্যতম বাহক। আইনসভার সদস্যগণ সংসদের ভিতরে ও বাইরে সরকারের কাজের সমালোচনা, আলোচনা ও বির্তকের মধ্য দিয়ে জনগণকে প্রকৃত অবস্থা অবহিত করে। এসব আলোচনা ও বিতর্ক তাদের করণীয় স্থির করে। এভাবে দেশে জনমত গঠিত হয়।

৭। **সমালোচনামূলক কাজ :** আইনসভা সমালোচনামূলক ভূমিকা পালন করে থাকে। আইনসভার বিরোধী দলীয় সদস্যরা সরকারের বিতর্কিত কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করে সরকারের দোষ-ত্রুটি জনগণের সামনে তুলে ধরে এবং সরকারকে সঠিক পথে চলার পথ নির্দেশ করে।

৮। **অনুসন্ধানমূলক কাজ :** আইনসভা রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে বিভিন্ন ধরনের অনুসন্ধানমূলক কাজ করে থাকে। অনেক সময় সামাজিক, অর্থনৈতিক সমস্যা ও ঘটনাবলি পর্যালোচনা করার জন্য আইনসভার সদস্যদের মধ্য থেকে বিভিন্ন ধরনের কমিশন বা কমিটি গঠন করা হয়ে থাকে।

৯। **অর্থসংক্রান্ত কাজ :** গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আইনসভা অর্থ সংক্রান্ত কাজ করে থাকে। আইনসভার সম্মতি ব্যতীত সরকার কোন কর ধার্য, ব্যয় বরাদ্দ করতে পারে না। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সরকারসমূহ প্রত্যেক আর্থিক বছরের শেষের দিকে পরবর্তী বছরের জন্য আয় ও ব্যয় সংক্রান্ত হিসাব বা বাজেট আইনসভায় পেশ করে থাকে। আইনসভার অনুমোদন ছাড়া কোন বিল পাস হয় না।

১০। **আলোচনা ও বিতর্ক :** আইনসভায় আইন প্রণয়ন, নীতি নির্ধারণ, সরকারি সিদ্ধান্তের ওপর আলাপ-আলোচনা ও বিতর্ক সৃষ্টি হয়। তাই আইনসভাকে জাতীয় বিতর্ক সভা বলা হয়। আলোচনা ও বিতর্কের ফলে সঠিক ও উন্নতমানের আইন ও শাসন সংক্রান্ত নীতি প্রণীত হয়।

১১। **নির্বাচন সংক্রান্ত কাজ :** কোন কোন দেশের আইনসভা কিছু নির্বাচন সংক্রান্ত কাজ করে থাকে। নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রধান সাধারণত আইনসভার সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হয়ে থাকে।

সারসংক্ষেপ

সরকারের তিনটি বিভাগ রয়েছে, এর মধ্যে আইন বিভাগ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আইন বিভাগের কাজ আইন প্রণয়ন করা, শাসন বিভাগের কাজ তা প্রয়োগ করা। বিচার বিভাগের কাজ হচ্ছে বিচারকে বাস্তবায়িত করা। আইন বিভাগ আইন তৈরি, সংশোধন, নির্বাচন সংক্রান্ত, সমালোচনামূলক, অর্থসংক্রান্ত, বিচার সংক্রান্ত, অনুসন্ধানমূলক ও নির্বাচন সংক্রান্ত কাজ করে থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

(ক) নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। জনসাধারণের প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান–

(ক) শাসন বিভাগ　　খ) আইন বিভাগ

গ) বিচার বিভাগ　　ঘ) রাজতন্ত্র

২। জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিকে নিয়ে গঠিত হয় –

(ক) আইন সভা　　খ) শাসন বিভাগ

গ) বিচার বিভাগ　　ঘ) সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ

(খ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১। আইন বিভাগ বলতে কি বুঝায়?

২। আইন বিভাগকে সরকারের অন্যান্য বিভাগ হতে শক্তিশালী মনে করা হয় কেন?

(গ) রচনামূলক প্রশ্ন

১। আইন বিভাগের কার্যাবলি আলোচনা কর।

(ক) উত্তরমালা

১। (খ), ২। (ক)

পাঠ-২ : শাসন বিভাগ ও এর কার্যাবলি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- শাসন বিভাগের স্বরূপ চিহ্নিত করতে পারবেন।
- শাসন বিভাগের কার্যাবলির ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

শাসন বিভাগ

শাসন বিভাগ রাষ্ট্রীয় শাসন সংক্রান্ত কার্যাবলি পরিচালনা করে। শাসন বিভাগ সাধারণত শাসন সংক্রান্ত, বৈদেশিক সম্পর্ক রক্ষা সংক্রান্ত, প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত, আইন সংক্রান্ত, বিচার সংক্রান্ত ও অর্থ সংক্রান্ত কার্যাবলি সম্পাদন করে। শাসন বিভাগের সকল কর্মচারী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রের শাসন সংক্রান্ত বিষয়ে অংশগ্রহণ করে। এই অর্থে, শাসন বিভাগ বিচার বিভাগের কর্মচারী ব্যতীত সরকারি কাজে নিয়োজিত অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়ে গঠিত হয়।

গঠন ও কার্যাবলির ভিত্তিতে শাসন বিভাগ দুই ভাগে বিভক্ত। যথা (১) রাজনৈতিক শাসক (২) অ-রাজনৈতিক শাসক। রাজনৈতিক অংশ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হন। তারা তাদের সম্পাদিত কার্যাবলির জন্য জনগণের কাছে দায়ী থাকেন। অন্যদিকে, প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনকারী স্থায়ী বেতনভুক্ত কর্মচারী অ-রাজনৈতিক অংশ।

নিম্নে শাসন বিভাগের কার্যাবলি আলোচনা করা হলো :

১. **শাসন সংক্রান্ত :** আইনসভা কর্তৃক প্রণীত আইনকে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করার দায়িত্ব শাসন বিভাগের। রাষ্ট্রের আইনানুসারে শাসনকার্য পরিচালনা করে অধিক জনকল্যাণ সুনিশ্চিত করাই শাসন বিভাগের প্রধান কাজ। এটি সরকারের বিভিন্ন বিভাগ ও সংস্থার কার্যাবলির মধ্যে সমন্বয় সাধন করে। শাসন বিভাগ দেশের অভ্যন্তরে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা ছাড়াও সরকারি কর্মচারীদের নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি, অবসর প্রদান, বেতন ও ভাতাদি প্রদান, অধ্যাদেশ ইত্যাদি প্রণয়ন করে থাকে। রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা শাসন বিভাগের দায়িত্ব। শাসন বিভাগ সুসংগঠিত সেনাবাহিনী গঠন করে, প্রয়োজনে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়।

২. **আইন সংক্রান্ত কাজ :** শাসন বিভাগ কিছু আইন সংক্রান্ত কাজ করে থাকে। শাসন বিভাগ আইনসভার অধিবেশন আহ্বান; স্থগিত ও বন্ধ ঘোষণা করতে পারে। জরুরি অবস্থায় শাসন বিভাগ অর্ডিন্যান্স জারি করার ক্ষমতাধারী। মন্ত্রিপরিষদ শাসিত শাসন ব্যবস্থায় শাসন বিভাগ প্রত্যক্ষ ভাবে আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত কার্যে অংশগ্রহণ করে থাকে।

৩. **অর্থসংক্রান্ত কাজ :** শাসন বিভাগ কিছু অর্থ সংক্রান্ত কাজ করে থাকে। প্রতি বছর সম্ভাব্য আয়-ব্যয়ের খতিয়ান সম্বলিত বাজেট শাসন বিভাগ তৈরি করে এবং আইন পরিষদে পেশ করে থাকে। আইনসভার সম্মতিক্রমে শাসন বিভাগ সাধারণত কর ধার্য, সেবামূলক কাজ সম্পাদন এবং অন্যান্য উপায় অবলম্বন করে অর্থ সংগ্রহ এবং তা ব্যয় করে থাকে।

৪. **বিচার বিভাগীয় কাজ :** শাসন বিভাগ কিছু কিছু বিচার বিভাগীয় কার্য সম্পাদন করে থাকে। বিচার বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত বিচারকগণের নিয়োগ সংক্রান্ত কাজ শাসন বিভাগই করে থাকে। শাসন বিভাগ কোন ব্যক্তিকে বা কোন প্রতিষ্ঠানের চরম শাস্তি মওকুফ বা হ্রাস করার ক্ষমতা রাখে ।

৫. **জরুরি অবস্থা ঘোষণা :** প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা অন্য কোন কারণে দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করার দায়িত্ব শাসন বিভাগের। ঐ সময় রাষ্ট্র প্রধান আইনসভা স্থগিত করে জনগণের মৌলিক অধিকার নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

৬. **জনকল্যানমূলক কার্যাবলি :** শাসন বিভাগ জনস্বাস্থ্য, জনশিক্ষা, কৃষ্টি, শিল্প-বাণিজ্য, যোগাযোগ, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন প্রভৃতি কাজ করে। এছাড়া শাসন বিভাগ পুনর্বাসন সংক্রান্তস্বল্প মেয়াদি ও দীর্ঘ মেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে।

৭. **সামরিক কার্যাবলি :** রাষ্ট্র প্রধান পদাধিকার বলে সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক। সর্বাধিনায়ক হিসেবে তিনি সেনা কর্মকর্তাদের নিয়োগ, পদোন্নতি, পদচ্যুতি, সেনাবাহিনী সংগঠন ও পরিচালনা করে থাকেন। কিছু রাষ্ট্রে রাষ্ট্রপ্রধান প্রয়োজনবোধে সামরিক আইনও জারি করতে পারেন।

সারসংক্ষেপ

শাসন বিভাগ শাসন সংক্রান্ত, বৈদেশিক সম্পর্ক সংক্রান্ত, প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত, আইন সংক্রান্ত ও বিচার সংক্রান্ত কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকে। তাছাড়া শাসন বিভাগ জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড ও জরুরি অবস্থা মোকাবেলা সংক্রান্ত কিছু কার্যাবলিও সম্পাদন করে থাকে। আধুনিক জনকল্যানকর রাষ্ট্রে শাসন বিভাগ জনস্বাস্থ্য, জনশিক্ষা, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, যোগাযোগ, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন প্রভৃতি কাজে নিয়োজিত রয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

(ক) নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। আইন অনুযায়ী শাসন কাজ পরিচালনা করে।

(ক) সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ (খ) বিচার বিভাগ

(গ) শাসন বিভাগ (ঘ) বিশেষ কার্যাদি বিভাগ

(খ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১। শাসন বিভাগ বলতে কি বুঝায়?

২। শাসন বিভাগের কাজ কি কি?

(গ) রচনামূলক প্রশ্ন

১। শাসন বিভাগের কার্যাবলি বর্ণনা করুন।

(ক) উত্তরমালা

১। (গ)

পাঠ-৩ : বিচার বিভাগের গঠন, কার্যাবলি এবং স্বাধীনতা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- বিচার বিভাগের গঠন সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।
- বিচার বিভাগের কার্যাবলি বর্ণনা করতে পারবেন।
- বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষার উপায়সমূহ আলোচনা করতে পারবেন।

বিচার বিভাগ

বিচার বিভাগ সরকারের তিনটি বিভাগের মধ্যে অন্যতম, দেশের সমস্ত বিচারকদের নিয়ে বিচার বিভাগ গঠিত। বিচার বিভাগ বিচার পরিচালনা করে। অপরাধীকে শাস্তিদেয়া বিচার বিভাগের প্রধান কাজ। 'দুষ্টের দমন, শিষ্টের লালন' করাই বিচার বিভাগের দায়িত্ব। নাগরিকদের স্বাচ্ছন্দ্য ও শান্তিপূর্ণ জীবনের জন্য বিচার বিভাগ তার কর্তব্য পালন করে থাকে। অধ্যাপক ব্রাইস বলেন, "বিচার বিভাগের কর্মকুশলতা অপেক্ষা কোন সরকারের যোগ্যতা বিচার করার উপযোগী মানদণ্ড আর নেই।"

বিচার বিভাগের এখতিয়ার যথেষ্ট বিস্তৃত। গ্রাম্য আদালত হতে কেন্দ্রীয় সুপ্রীম কোর্ট পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরে ফৌজদারি ও দেওয়ানি মামলার বিচার করা হয়। থানায় গ্রাম্য আদালত, জেলায় ফৌজদারি ও দেওয়ানি আদালত এবং কেন্দ্রে হাইকোর্ট বিভাগ ও আপীল বিভাগ নিয়ে সুপ্রীম কোর্ট গঠিত।

নিম্নে বিচার বিভাগের কার্যাবলি আলোচনা করা হলো :

১. **বিচার সংক্রান্ত কাজ :** বিচার বিভাগ আইনকে বাস্তবায়িত করে। এ বিভাগ দেশের আইন মোতাবেক বিচার কার্য সম্পাদন করে। এটা ব্যক্তির সাথে, রাষ্ট্রের সাথে, প্রতিষ্ঠানের সাথে বিরোধের মোকাবেলা সম্পন্ন করে।

২. **আইন সংক্রান্ত :** বিচার বিভাগ আইনের ব্যাখ্যা করে। প্রয়োজনে নিজস্ব মতামতের প্রতিফলন ঘটায়। আইনের এ ব্যাখ্যা পরবর্তীকালে উদাহরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

৩. **শাসন সংক্রান্ত কাজ করা :** বিচার বিভাগ শুধু বিচার সংক্রান্ত কাজ করে না। শাসন সংক্রান্ত কাজও করে থাকে। নাবালকের সম্পত্তি দেখা শোনা করা, বিদেশী নাগরিককে নাগরিকত্ব প্রদান করাও বিচার বিভাগের কাজ।

৪. **পরামর্শ সংক্রান্ত কাজ :** শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগ, বিচার বিভাগের পরামর্শের প্রত্যাশী হয়। বিচার বিভাগ সেক্ষেত্রে তাদের জ্ঞানগর্ভ শলা-পরামর্শ বা উপদেশ প্রদান করে থাকে।

৫. **জনগণের মৌলিক অধিকার রক্ষা :** বিচার বিভাগ জনগণের মৌলিক অধিকার রক্ষা করে। শাসন বিভাগের যথেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে বিচার বিভাগ একমাত্র হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে। এটা বিভিন্নভাবে ব্যক্তির অধিকার রক্ষার প্রতিবন্ধকতার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করতে পারে।

৬. **তদন্ত সংক্রান্ত কাজ :** গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনগণের সম্পত্তি ও জানগণের নিরাপত্তা দান করতে সরকার ওয়াদাবদ্ধ থাকে। ফলে রাষ্ট্রে যদি কোন অন্যায় বা জোর-জবরদস্তি, অপরাধ বা দুর্ঘটনা ঘটে, সেক্ষেত্রে বিচার বিভাগ তদন্ত কাজ পরিচালনা করেও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করে।

৭. **সংবিধান সংরক্ষণ :** বিচার বিভাগ সংবিধান সংরক্ষণ করে থাকে। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় বিচার বিভাগ সংবিধানের অভিভাবক। সংবিধানের ব্যাখ্যা প্রদান করে কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যের মধ্যে বিবাদ মীমাংসা করে যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত সংবিধানের প্রাধান্য বজায় রাখে।

৮. **ন্যায়-বিচার প্রতিষ্ঠা :** ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা বিচার বিভাগের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। বিচার বিভাগ মামলা পরিচালনার তথ্য অনুসন্ধানের জন্য নথিপত্র দেখে সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণ করে অপরাধীর শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে ন্যায়-বিচার প্রতিষ্ঠা করে।

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষার উপায়

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষা করা অত্যাবশ্যক। নিম্নলিখিত উপায়ে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষা করা যায়–

১. **যোগ্য ও উপযুক্ত বিচারক নিয়োগ :** বিচারকদের নিজস্ব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, যোগ্যতা ও ন্যায় নীতির ওপর বিচার বিভাগ বহুলাংশে নির্ভরশীল। এজন্য দৃঢ়চেতা, নির্ভীক, প্রজ্ঞাবান, আইনজ্ঞ ও স্বাধীনচেতা ব্যক্তিকে বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রধান্য দেয়া প্রয়োজন।

২. **বিচারকগনের নিয়োগ পদ্ধতি :** বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষা করতে হলে বিচারকদের নিয়োগের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা থাকতে হবে। বিচারকগণ যেন আইন ও শাসন বিভাগের অনুকম্পা না পায়। স্থায়ী বিচারকমণ্ডলীর কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে রাষ্ট্র প্রধান দ্বারা বিচারকদের নিয়োগের ব্যবস্থা করা হলে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষা হবে। এতে করে সত্যিকার অর্থে বিজ্ঞ, সৎ ও ন্যায়নীতিবান ব্যক্তিরা বিচারক হিসেবে আসীন হবেন।

৩. **কার্যকাল ও অপসারণ পদ্ধতি :** বিচারকদের কার্যকাল স্থায়ী হতে হবে। একবার নিয়োগ করলে তার কার্যকালের মধ্যে জুডিসিয়াল সার্ভিসের সুপারিশ ছাড়া তাকে অপসারণ করা যাবে না।

৪. **উপযুক্ত বেতন ও মর্যাদা :** বিচারকদের উপযুক্ত বেতন ও মর্যাদা দিতে হবে, যাতে তাদের মধ্যে কোন হীনমন্যতা কাজ না করে। বিচারকগণ যাতে যথাযথ মর্যাদা সহকারে জীবন যাপন করতে পারে সে দিকে রাষ্ট্রকে খেয়াল রাখতে হবে।

৫. **বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা সংরক্ষণ :** সরকারের অন্যান্য বিভাগ থেকে বিচার বিভাগের স্বাতন্ত্র-স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে হবে, যাতে করে বিচারকগণ স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারেন।

৬. **বিচার বিভাগের প্রতি আস্থা :** বিচার বিভাগের উপর জনগণের আস্থা থাকতে হবে। বিচারকগণের মতামতকে সকলের উপরে স্থান দিতে হবে। সংবিধানের ব্যাখ্যা, আইন বিষয় মতামত ও আইন সংক্রান্ত বিষয়ে প্রাধ্যান্য দিতে হবে। বিচার বিভাগের সিদ্ধান্তের প্রতি সরকারের বিভিন্ন বিভাগ এবং জনগণের শ্রদ্ধা থাকতে হবে।

উপরিউক্ত দিকগুলো যদি সঠিকভাবে পালন করা যায়, তবেই বিচারকদের স্বাধীনতা সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা যাবে।

সারসংক্ষেপ

বিচার বিভাগ বিচার কার্য পরিচালনার দায়িত্ব পালন করে। সরকারের তিনটি বিভাগের মধ্যে বিচার বিভাগ অন্যতম। 'দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন' বিচার বিভাগের কাজ। গ্রাম্য আদালত থেকে শুরু করে জেলায় দেওয়ানি ও ফৌজদানি আদালত, কেন্দ্রে হাইকোর্ট ও আপিল আদালত নিয়ে সুপ্রীম কোর্ট গঠিত। বিচার বিভাগ, আইন সংক্রান্ত, শাসন সংক্রান্ত, তদন্ত সংক্রান্ত কার্যাবলিসহ জনগণের মৌলিক অধিকার রক্ষা, সংবিধানের রক্ষক হিসেবে কাজ করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

(ক) নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। অপরাধীকে শাস্তি দেওয়ার কাজ –

(ক) আইন বিভাগের (খ) শাসন বিভাগের

(গ) বিশেষ কার্যাদি বিভাগের (ঘ) বিচার বিভাগের

২। বিচার বিভাগ গঠিত হয় -

(ক) দুই স্তরের আদালত নিয়ে (খ) তিন স্তরের আদালত নিয়ে

(গ) চার স্তরের আদালত নিয়ে (ঘ) পাঁচ স্তরের আদালত নিয়ে ।

(খ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১। বিচার বিভাগের শাসন সংক্রান্ত কাজ কি?

২। বিচার বিভাগের তদন্তমূলক কাজ কি?

(গ) রচনামূলক প্রশ্ন

১। বিচার বিভাগের কার্যাবলি আলোচনা করুন ।

২। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষার উপায় কি কি?

(ক) উত্তরমালা

১। (ঘ), ২। (ক)

ইউনিট
১০

আইন, স্বাধীনতা ও সাম্য

ভূমিকা

আইন, স্বাধীনতা ও সাম্য একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। স্বাধীনতার শর্ত ও ভিত্তি এবং সাম্য প্রতিষ্ঠার সহায়ক আইন। সমাজে আইন কার্যকর না হলে স্বাধীনতা ও সাম্যের অর্থ থাকে না। আইনহীন সমাজে স্বাধীনতা ও সাম্য কেবল কল্পনামাত্র।

এ.ভি.ডাইসি ও গডউইন বলেন, আইন ও স্বাধীনতা পরস্পর বিরোধী। স্বাধীনতার জন্য আইন ক্ষতিকর। একটি বেশি হলে অপরটি কমে যায়।" আবার লর্ড অ্যাক্টন বলেন, "স্বাধীনতা ও সাম্য পরস্পর বিরোধী। কেননা সাম্যের বন্ধনে আবদ্ধ হলে ব্যক্তি স্বাধীনতা সর্বোচ্চ পর্যায়ে উপনিত হয় না।" তিনি বলেন, সাম্যের নেশা স্বাধীনতার আশাকে ব্যর্থ করে। কেউ কেউ বলেন, সমাজতন্ত্র সাম্য প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হলেও স্বাধীনতাকে খর্ব করেছে। কিন্তু এসব ধারণা সঠিক নয়। কেননা স্বাধীনতা বলতে যা খুশি তাই করা বোঝায় না। সাম্য ও স্বাধীনতার মধ্যে কোন বিরোধ নেই। সুতরাং আইন, স্বাধীনতা ও সাম্য পরস্পরের সহায়ক এবং পরিপূরক।

বর্তমান ইউনিটে নিম্নোক্ত পাঠগুলো আলোচনা করা হলো :

পাঠ-১ : আইনের সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য ও উৎস।
পাঠ-২ : আইন ও নৈতিকতা, আইন ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক।
পাঠ-৩ : আইন মান্য করার কারণ।
পাঠ-৪ : স্বাধীনতার সংজ্ঞা ও প্রয়োজনীয়তা।
পাঠ-৫ : স্বাধীনতা ও সাম্যের সম্পর্ক।

পাঠ-১ : আইনের সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য ও উৎস

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- আইনের সংজ্ঞা বলতে পারবেন ।
- আইনের বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ করতে পারবেন
- আইনের উৎস সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন ।

আইনের সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য ও উৎস

আইন ফার্সি শব্দ । ফার্সি ভাষায় আইন শব্দের অর্থ সুনির্দিষ্ট নীতি বা নিয়ম । সমাজ জীবনে প্রচলিত বিধি-বিধানের নামই আইন ।

আইনের প্রামাণ্য সংজ্ঞা

১. গ্রিক দার্শনিক এ্যারিস্টটলের মতে, "আইন হল পক্ষপাতহীন যুক্তি ।"

২. আইনবিদ জন অস্টিনের মতে, "সার্বভৌম শক্তির আদেশই আইন ।"

৩. অধ্যাপক হল্যান্ড বলেন, "আইন হল মানুষের বাহ্যিক আচরণ নিয়ন্ত্রণের এমন কতগুলো সাধারণ নিয়ম যা সার্বভৌম রাজনৈতিক কর্তৃত্ব দ্বারা প্রযুক্ত হয় ।"

৪. স্যার হেনরি মেইনের মতে, "আইন হল পরিবর্তনশীল, ক্রমাউন্নতিমূলক, ক্রমবর্ধমান ও দীর্ঘকালীন সামাজিক প্রথার গতির ফল ।"

৫. আইনের সার্বজনীন ও উৎকৃষ্ট সংজ্ঞা প্রদান করেছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি উড্রো উইলসন । তাঁর মতে, "আইন হল সমাজের সে সব সুপ্রতিষ্ঠিত প্রথা ও রীতিনীতি যেগুলো সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত ও রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত বিধিতে পরিণত হয়েছে এবং যাদের পিছনে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের সুস্পষ্ট সমর্থন রয়েছে ।"

আইনের উপরিউক্ত সংজ্ঞাগুলো বিশ্লেষণ করে বলা যেতে পারে যে, আইন হল মানুষের বাহ্যিক আচরণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত কতগুলো বিধিবদ্ধ নিয়মাবলি, যা রাষ্ট্র ও সমাজ কর্তৃক গৃহীত, সমর্থিত ও প্রযুক্ত হয় । জনগণের কল্যাণের জন্য আইন অত্যাবশ্যক । আইন ভঙ্গ করলে সার্বভৌম কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনে বল প্রয়োগ ও শাস্তি প্রদান করে আইন মেনে চলতে বাধ্য করে ।

আইনের বৈশিষ্ট্যসমূহ

আইন সম্পর্কে প্রদত্ত সংজ্ঞাগুলো বিশ্লেষণ করলে আইনের নিম্নোক্ত মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলো ধরা পড়ে । বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ–

১ । **বিধিবদ্ধ নিয়মাবলি :** আইনের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল প্রথা, রীতি-নীতি ও নিয়ম-কানুনের সমষ্টি ।

২ । **রাষ্ট্রীয় অনুমোদন ও স্বীকৃতি :** আইনের আর একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল বিধি-বিধান প্রচলিত নিয়ম-কানুন বা প্রথাসমূহ যা রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদন ও স্বীকৃতির প্রয়োজন হয় । আইন হতে হলে রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক রচিত, অনুমোদিত ও স্বীকৃতিপ্রাপ্ত হতে হবে ।

৩ । **সার্বজনীনতা :** আইন সার্বজনীন । সকল মানুষই আইনের দৃষ্টিতে সমান । জাতি-ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, নারী-পুরুষ, ধনী-গরিব, রাজা-প্রজা নির্বিশেষে সকল মানুষের উপর আইন সমভাবে প্রযোজ্য ।

৪। **সুস্পষ্ট :** আইনের বিধানগুলো সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট। সুনির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আইন বলবৎ হয়। এ জন্যই আইনের ক্ষেত্রে কোন অস্পষ্টতা থাকে না।

৫। **শাস্তিযোগ্য :** কেউ আইন ভঙ্গ করলে শাস্তি পেতে হয়। আইনের ব্যতিক্রম সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে বিধায় আইন অবশ্যই পালনীয়। তাই আইন ভঙ্গ করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

৬। **আইনের স্থান সবার উর্ধ্বে :** আইন হচ্ছে সার্বভৌম শক্তির আদেশ। তাই সকলেই আইন মেনে চলতে বাধ্য। সার্বভৌম শক্তি কর্তৃক সমর্থিত বিধায় আইনের স্থান সবার উর্ধ্বে।

৭। **বাহ্যিক আচার আচরণের সাথে যুক্ত :** আইন প্রধানত মানুষের বাহ্যিক আচার-আচরণ ও ক্রিয়াকলাপকে নিয়ন্ত্রণ করে। মানুষের চিন্তা ভাবনার সাথে আইনের প্রত্যক্ষ কোন সম্পর্ক নেই।

আইনের উৎসসমূহ

আইন বিভিন্ন উৎস থেকে সৃষ্টি হয়েছে। আইনের উৎসসমূহ নিম্নরূপ–

১। প্রথা বা রীতিনীতি

২। ধর্ম

৩। বিচারকের রায়

৪। ন্যায়বিচার

৫। বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা

৬। আইনসভা

নিম্নে আইনের উৎস সম্পর্কে আলোচনা করা হলো–

১। **প্রথা বা রীতিনীতি :** প্রথা হল আইনের এক সুপ্রাচীন উৎস। প্রত্যেক সমাজেই সুপ্রাচীনকাল থেকে বিভিন্ন প্রকার প্রথা ও রীতিনীতি প্রচলিত। এ সমস্ত প্রথা ও রীতিনীতি সমাজ জীবনের সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত। সমাজ জীবনের প্রয়োজনীয়তা ও কল্যাণের দিকে দৃষ্টি দিয়ে রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ যখন এগুলোর প্রতি সমর্থন জানায় তখন এ সব প্রথা ও রীতিনীতি আইনে পরিণত হয়। অতএব এভাবেই সমাজ জীবনে প্রচলিত প্রথা ও রীতিনীতি আইনের উৎস রূপে গণ্য হয়।

২। **ধর্ম :** আইনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস হল ধর্ম। বিশ্বে প্রচলিত প্রত্যেক ধর্মের অনুশাসন মর্যাদা সহকারে পালিত হয়ে থাকে। ধর্মীয় এ সমস্ত অনুশাসনের যেগুলো সমাজ জীবনকে বিকশিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করে থাকে সেগুলো পরবর্তিতে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের স্বীকৃতি পেয়ে আইনের মর্যাদা লাভ করে। মুসলিম, খ্রিষ্টীয় ও হিন্দু আইন এর উপযুক্ত উদাহরণ।

৩। **বিচারকের রায় :** বিচারকগণ অনেক সময় নিজেদের বিবেক ও অভিজ্ঞতা থেকে নতুন আইন সৃষ্টি, প্রচলিত আইনের ব্যাখ্যা বা যথার্থতা বিশ্লেষণ করেন। ফলে আইনের নতুন নতুন সূত্র সৃষ্টি হয়। অন্যান্য বিচারক পরবর্তী সময়ে আইনের এসব নতুন সূত্রকে বিচারের ক্ষেত্রে অনুসরণ করেন।

৪। **ন্যায়বিচার :** যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে প্রচলিত আইন যখন অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে কিংবা নতুন সমস্যার সমাধান প্রচলিত আইনের মধ্যে না পাওয়া যায়, তখন বিচারকগণ ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার জন্য নিজেদের বিচারবুদ্ধি ও ন্যায়বোধ প্রয়োগ করেন। এভাবে নতুন আইন সৃষ্টি হয় এবং আইন যুগোপযোগী হয়।

৫। **বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা :** যুগে যুগে আইনজ্ঞদের বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা, ব্যাখ্যা ও মতামত বিচারালয় কর্তৃক গৃহীত হয়েছে। এতে আইনের প্রকৃত অর্থের প্রকাশ ঘটে। ফলে আইনজ্ঞদের এসব আলোচনা ও সিদ্ধান্ত আইনের অন্যতম উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়।

৬। **আইনসভা :** আধুনিক রাষ্ট্রে আইনসভাই হচ্ছে আইনের প্রধানতম উৎস। আইনসভা সমাজের প্রয়োজনের সাথে সংগতি রেখে নতুন নতুন আইন তৈরি করে, আইনের রদবদল ও সংশোধন করে থাকে। আইনসভাই হচ্ছে জনপ্রতিনিধিত্বমূলক পরিষদ। তাই আইনসভা জনমতের সাথে সঙ্গতি রেখে আইন প্রণয়ন করে থাকে। সুতরাং আইনসভাই হচ্ছে আইন প্রণয়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উৎস।

এই ছয়টি উৎস ছাড়াও কেউ কেউ জনমতকে আইনের গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে বর্ণনা করেছেন। অপেনহেম (Openheim) বলেন, 'জনমত আইনের অন্যতম উৎস'। জনমতের প্রভাবে সরকার অনেক আইন তৈরি করে।

সারসংক্ষেপ

সমাজ জীবনের প্রচলিত বিধিবিধানগুলো যখন অধিকাংশ মানুষের সমর্থন লাভ করে এবং যা ভঙ্গ করলে শাস্তি হয় তাই আইন। আইন সার্বভৌম কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োগ করা হয়। আইনের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য হল– বিধিবদ্ধ নিয়মাবলি, রাষ্ট্রীয় অনুমোদন, সুস্পষ্ট, সার্বজনীন, শাস্তিযোগ্য, আইনের স্থান সবার ঊর্ধ্বে ও বাহ্যিক আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণ। বিভিন্ন উৎস থেকে আইন তৈরি হয়েছে। যেমন –প্রথা বা রীতিনীতি, ধর্ম, বিচারকের রায়, ন্যায় বিচার, বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা এবং আইনসভা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

(ক) নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। আইনকে সার্বভৌম শক্তির আদেশ বলে অভিহিত করেছেন-

(ক) এরিস্টটল (খ) লর্ড এ্যাকটন

(গ) অস্টিন (ঘ) হল্যাণ্ড

২। আইনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উৎস-

(ক) ধর্ম (খ) বিচারকের রায়

(গ) আইনসভা (ঘ) বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা

৩। আইনের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল-

(ক) সার্বজনীনতা (খ) রাষ্ট্রীয় অনুমোদন ও স্বীকৃতি

(গ) সুস্পষ্টতা (ঘ) প্রথা রীতিনীতি ও নিয়মকানুন

(খ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. আইনের সংজ্ঞা দিন।

২. আইনের উৎসসমূহ কি কি?

(গ) রচনামূলক প্রশ্ন

১. আইনের উৎসসমূহ সম্পর্কে বর্ণনা দিন।

২. আইনের বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করুন

(ক) উত্তরমালা

১। (ঘ), ২। (গ), ৩। (খ)

পাঠ ২ : আইন ও নৈতিকতা, আইন ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- আইন ও নৈতিকতার সম্পর্ক আলোচনা করতে পারবেন।
- আইন ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক বর্ণনা করতে পারবেন।

আইন ও নৈতিকতার সম্পর্ক

আইন বলতে সেসব নিয়মকে বোঝায় যেগুলো সাধারণত মানুষের বাহ্যিক আচার-আচরণ ও ক্রিয়াকর্ম নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। নৈতিকতা মানুষের বাহ্যিক ও অন্তর্গত ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে। তাই বলা যায় আইন ও নৈতিকতা গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। আইন ও নৈতিকতার মধ্যে অনেক সাদৃশ্য বিদ্যমান। নিম্নে তা আলোচনা করা হলো–

প্রথমত, আইন এবং নৈতিকতা উভয়ই মানুষের বিবেক বিবেচনা এবং বুদ্ধি থেকে সৃষ্টি হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, বিষয়বস্তুর দিক থেকেও উভয়ের মধ্যে মিল রয়েছে। কারণ উভয়ই মানুষের আচার-আচরণ এবং ক্রিয়াকলাপ নিয়ে কাজ করে।

তৃতীয়ত, উদ্দেশ্যগত দিক থেকেও আইন ও নৈতিকতা এক ও অভিন্ন। আইন মানুষের কল্যাণ সাধন করে, সমাজ জীবনে শৃঙ্খলা আনে, অন্যদিকে নৈতিকতা মানুষকে সততা ও কল্যাণের পথে নিয়ে আসে।

চতুর্থত, আইন ও নৈতিকতা পরস্পর নির্ভরশীল। একের সাথে অপরের নিবিড় সম্পর্ক। প্রচলিত নীতিজ্ঞানের সাথে সামঞ্জস্য রেখেই আইন প্রণয়ন করতে হয়। তা না হলে নৈতিকতা বিরোধী আইন ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে পারে। নীতি ভিত্তিক আইন সকলের কাছে গ্রহণীয় হয়।

পঞ্চমত, আইন ও নৈতিকতা পরস্পরের উপর প্রভাব বিস্তার করে। প্রচলিত নৈতিক আইন কখনো অশুভ পথে অগ্রসর হলে রাষ্ট্রীয় আইন সেক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করে। সতীদাহ প্রথা এক সময় ধর্মচিন্তাভিত্তিক ছিল। পরবর্তীতে সতীদাহ প্রথা রহিত হয় এবং বিবেচনা সিদ্ধনীতি প্রতিষ্ঠিত হয়। রাষ্ট্রীয় আইন নৈতিকতা বিরোধী হলে তা বাতিলের দাবি ওঠে।

আইন ও নৈতিকতার বৈসাদৃশ্য

নিম্নে আইন ও নৈতিকতার বৈসাদৃশ্যগুলো আলোচনা করা হলো :

প্রথমত, রাষ্ট্রীয় আইন মানুষের বাহ্যিক আচার-আচরণ ও ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে, কিন্তু নৈতিক আইন মানুষের অন্তর্জীবনের সাথে সম্পর্কিত। নৈতিকতার সাথে মানুষের বুদ্ধি, বিবেক ও ন্যায়পরায়ণতা যুক্ত থাকে।

দ্বিতীয়ত, আইন সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট, কিন্তু নৈতিকতা অনির্দিষ্ট ও অস্পষ্ট। আইন সর্বক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য কিন্তু নৈতিকতা অঞ্চলভেদে এবং ব্যক্তি বিশেষে আলাদা হতে পারে। যেমন– ভিক্ষুককে ভিক্ষা দান কারো নিকট নীতি বিরুদ্ধ আবার কারো নিকট নৈতিক দায়িত্ব।

তৃতীয়ত, আইন ও নৈতিকতার ক্ষেত্র সবসময় এক হয় না। কোন কিছু নৈতিকতা বিরুদ্ধ হলেও তা বে-আইনী নাও হতে পারে। যেমন– যানবাহন রাস্তার ডানদিক দিয়ে চলা বেআইনী কিন্তু নীতি বিরোধী নয়।

চতুর্থত, রাষ্ট্র আইন প্রয়োগ ও আইনের ব্যাখ্যা করে কিন্তু নৈতিকতা সামাজিক বিবেক দ্বারা পরিচালিত হয়। রাষ্ট্র আইন কার্যকরী করে এবং আইনভঙ্গকারীকে শাস্তি প্রদান করে কিন্তু নীতিভঙ্গকারী সমাজের বিবেকের ধিক্কারে শাস্তি ভোগ করে। আইনের পশ্চাতে সার্বভৌম রাষ্ট্রের সমর্থন থাকে কিন্তু নৈতিকতা সামাজিক মূল্যবোধ দ্বারা শাসিত।

অতএব, আইন ও নৈতিকতার মধ্যে পার্থক্য থাকলেও মানুষের সার্বিক কল্যাণের প্রয়োজনে অভিন্ন নীতি ও আদর্শের ভিত্তিতে পরস্পর পরস্পরের সম্পূরক হয়ে কাজ করে।

আইন ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক

আইন ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। একটি ছাড়া অন্যটির অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। তবে আইন ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক কেমন তা নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক রয়েছে। কোন কোন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বলেন, রাষ্ট্র আইনের জন্মদাতা এবং আইনের ঊর্ধ্বে। আবার কেউ কেউ বলেন, আইন রাষ্ট্রের ঊর্ধ্বে এবং রাষ্ট্র আইনের অধীন।

স্যার ফ্রেডারিক পোলক এবং স্যার-হেনরী মেইনের মতে, রাষ্ট্র সৃষ্টির পূর্বেই আইনের জন্ম হয়েছে। মানব সমাজে প্রথা, রীতি-নীতি রাষ্ট্র সৃষ্টির পূর্বে প্রচলিত ছিল। রাজনৈতিকভাবে সুসংবদ্ধ জনগোষ্ঠী যখন রাষ্ট্র সৃষ্টি করল তখন রাষ্ট্র এই প্রচলিত প্রথা-রীতিনীতিকে স্বীকৃতি দিয়েছে মাত্র। ফলে রাষ্ট্র প্রকৃতপক্ষে আইনের বন্ধনে আবদ্ধ।

অধ্যাপক লাস্কি আইনকে রাষ্ট্রের উপরে স্থান দিয়েছেন। তাঁর মতে, আইন শুধুমাত্র আদেশই নয়, আবেদনও বটে।

ফরাসি সমাজবিজ্ঞানী দুগুই বলেন, আইন রাষ্ট্রের আদেশ নয় এবং আইনের কার্যকারীতা তার জন্য রাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল নয়। তাঁর মতে, আইন রাষ্ট্রের ঊর্ধ্বে, রাষ্ট্র আইনের আওতাধীন। রাষ্ট্র যদি আইন মান্য না করে চলে তবে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব।

অন্যদিকে অস্টিন, হবস, বদিন রাষ্ট্রকে সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছেন। তাঁদের মতে, রাষ্ট্রই একমাত্র সংস্থা যার সার্বভৌম ক্ষমতা আছে এবং যার আদেশ, নির্দেশ চূড়ান্ত। রাষ্ট্রের সার্বভৌম আদেশই আইন। আইন রাষ্ট্রের আওতাধীন। আইন রাষ্ট্রের ঊর্ধ্বে নয়।

আইন ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক যাই থাকুক না কেন, রাষ্ট্র আইন তৈরি, পরিবর্তন এবং বাতিল করতে পারে; কিন্তু আইনকে বাদ দিয়ে রাষ্ট্র এক মুহূর্ত চলতে পারে না। অতএব 'আইন রাষ্ট্রের উর্ধ্বে' বা 'আইনের অধীন রাষ্ট্র' যেটাই সত্য হোক না কেন, আইন ব্যতীত রাষ্ট্র হবে বিশৃঙ্খল ও অচল এবং সমাজ হবে বর্বর। রাষ্ট্র ব্যতীত আইন অস্তিত্বহীন। আইন ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক তাই অত্যন্ত নিবিড় ও অবিচ্ছেদ্য।

সারসংক্ষেপ

আইন ও নৈতিকতা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত এবং পরস্পর নির্ভরশীল দুটি বিষয়। আইন ও নৈতিকতার বিষয়বস্তু এবং উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন। মানুষের কল্যাণ উভয়ের লক্ষ্য। আর এদের মধ্যে মূল পার্থক্য হল আইন মানুষের বাহ্যিক আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে। আইন ভঙ্গ করলে দৈহিক ও মানসিক শাস্তি পেতে হয়। আর নৈতিকতা ভঙ্গকারী শুধু মানসিক কষ্ট ভোগ করে। অপরদিকে আইন ও রাষ্ট্রের মধ্যেও গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। আইন ব্যতীত রাষ্ট্র অচল ও বিশৃঙ্খল এবং সমাজ হবে বর্বর। আবার রাষ্ট্র ব্যতীত আইন অস্তিত্বহীন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

(ক) নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। রাষ্ট্রীয় আইন ভঙ্গ করলে-

(ক) মানসিক শাস্তি পেতে হয় (খ) কোন শাস্তি পেতে হয় না

(গ) দৈহিক শাস্তি পেতে হয় (ঘ) দৈহিক ও মানসিক উভয় শাস্তিই পেতে হয়

২। আইন সার্বভৌম কর্তৃপক্ষের আদেশ বিধায় জনগণ আইন মান্য করে-বলেছেন

(ক) অস্টিন (খ) এরিস্টটল

(গ) গ্রিণ (ঘ) হেনরি মেইন

(খ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১। আইন ও নৈতিকতার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য কি?

২। আইন ও নৈতিকতার মধ্যে বিষয়গত ও উদ্দেশ্যগত মিল কি কি?

(গ) রচনামূলক প্রশ্ন

১। আইন ও নৈতিকতার মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যসমূহ আলোচনা করুন।

২। আইন ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক বর্ণনা দিন।

(ক) উত্তরমালা

১। (ঘ), ২। (খ)

পাঠ-৩ : আইন মান্য করার কারণ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- আইন মান্য করার কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবেন ।

আইন মান্য করার কারণ

রাষ্ট্রের আইন জনগণ কেন মান্য করে এ নিয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে মত পার্থক্য রয়েছে । রাষ্ট্রবিজ্ঞানী টমাস হবস, জেরমী বেন্থাম ও জিন অস্টিন মনে করেন, "জনগণ আইন মেনে চলে শাস্তির ভয়ে ।" অস্টিনের মতে, "আইন সার্বভৌম কর্তৃপক্ষের আদেশ বিধায় জনগণ আইন মান্য করে চলে । কেননা জনগণের মধ্যে এ চেতনা জাগে যে, রাষ্ট্র শুধুমাত্র আইন ভঙ্গকারীকে অভিযুক্ত করে না বরং শাস্তি প্রদান করে থাকে ।

অপরদিকে এরিস্টটল, লক, রুশো, গ্রিণ এ প্রসঙ্গে ভিন্ন মত পোষণ করেন । তাঁদের মতে, আইনের উপযোগিতার উপলব্ধি হল আইন মান্য করার অপরিহার্য কারণ । তাঁদের ধারণা আইন অধিকার রক্ষা করে । দুর্বলকে সবলের হাত থেকে রক্ষার জন্য আইনের প্রয়োজন । আইনের প্রয়োজনীয়তার উপলব্ধি স্বাভাবিকভাবেই জনসাধারণকে আইন মান্য করতে সহায়তা করে ।

আইন মান্য করা সম্পর্কিত উপরোক্ত দু'টি মতাবাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেন জন হেনরি মেইন । তিনি বলেন, শাস্তির ভয়ে এবং আইনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে উভয়বিধ কারণে জনসাধারণ আইন মান্য করে থাকে ।

লর্ড ব্রাইস জনসাধারণের আইন মান্য করার কারণগুলোকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করেছেন । যেমন–

ক) নির্লিপ্ততা, (খ) শ্রদ্ধা (গ) সহানুভূতি (ঘ) শাস্তির ভয় (ঙ) যৌক্তিকতার উপলব্ধি । নিম্নে এগুলো আলোচনা করা হলো–

(ক) **নির্লিপ্ততা** : নির্লিপ্ততার অর্থ হল উদাসীনতা । বিশাল ভূখণ্ডে ব্যাপক জনগোষ্ঠীর মধ্যে ব্যক্তি নিজেকে ক্ষুদ্র মনে করে । ফলে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত কোন আইন বিচার বিশ্লেষণ না করে অন্যদের ন্যায় নিজেও অতি সহজেই আইন মান্য করে চলে ।

(খ) **শ্রদ্ধা** : যুগ যুগ ধরে সমাজ জীবনে যেসব রীতি-নীতি প্রথা চলে আসছে; মা, বাবা, গুরুজন ও বংশধররা যে সব রীতিনীতি দীর্ঘকাল ধরে মান্য করে আসছে, সেগুলো জনসাধারণও শ্রদ্ধাভরে মান্য করে থাকে ।

(গ) **সহানুভূতি** : সমাজের প্রায় সকলেই যখন আইন মান্য করে চলে তখন তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে অন্যদের মধ্যেও আইন মান্য করার প্রবণতা সৃষ্টি হয় ।

(ঘ) **শাস্তির ভয়** : জনসাধারণ জানে আইন ভঙ্গ করলে আইন ভঙ্গকারীকে অভিযুক্ত করা হবে এবং তাকে কঠোর শাস্তি পেতে হবে । তাই জনসাধারণ শাস্তির ভয়ে আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকে এবং আইন মান্য করে চলে ।

(ঙ) **যৌক্তিকতার উপলব্ধি** : জীবন, সম্পত্তি, নিরাপত্তা, অধিকার রক্ষা এবং ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশের অপরিহার্য শর্ত হিসেবে মানুষ আইনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে এবং আইন মান্য করতে শেখে ।

জন লক বলেছেন, 'যেখানে আইন থাকে না সেখানে স্বাধীনতা থাকতে পারে না ।' আইন স্বাধীনতার রক্ষক ও অভিভাবক, মানুষ তাই আইন মান্য করে ।

তবে শাস্তির ভয়, উপযোগিতা, আনুগত্য ও চেতনাবোধই আইন মেনে চলার অন্যতম কারণ ।

সারসংক্ষেপ

জনগণ আইন কেন মান্য করে এ নিয়ে মত পার্থক্য থাকলেও মূলত জনগণ শাস্তির ভয়ে এবং আইনের উপযোগিতার উপলব্ধি করেই আইন মান্য করে চলে। লর্ড ব্রাইস আইন মান্য করার পাঁচটি কারণ উল্লেখ করেন, নির্লিপ্ততা, শ্রদ্ধা, সহানভূতি, শাস্তির ভয় এবং যৌক্তিকতার উপলব্ধি। তবে শাস্তির ভয়, উপযোগিতা, আনুগত্য ও চেতনাবোধই আইন মান্য করার কারণ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

(ক) নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। আইন মান্য করার কারণগুলো কয় ভাগে বিভক্ত?

(ক) ২ ভাগে (খ) ৫ ভাগে

(গ) ৩ ভাগে (ঘ) ৪ ভাগে

২। "যেখানে আইন থাকে না সেখানে স্বাধীনতা থাকে না" বলেছেন–

(ক) প্লেটো (খ) জন লক

(গ) রুশো (ঘ) এরিস্টটল

(খ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১। আইন মান্য করার কারণের দুটি মতবাদ কী?

(গ) রচনামূলক প্রশ্ন

১। আইন মান্য করার কারণসমূহের বর্ণনা দিন।

(ক) উত্তরমালা

১. খ, ২. খ

পাঠ-৪ : স্বাধীনতার সংজ্ঞা ও প্রয়োজনীয়তা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- স্বাধীনতার অর্থ ও সংজ্ঞা বলতে পারবেন ।
- স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন ।

স্বাধীনতার অর্থ

স্বাধীনতার ইংরেজি প্রতিশব্দ Liberty ল্যাটিন শব্দ Liber থেকে এসেছে । Liber শব্দের অর্থ স্বাধীন বা মুক্ত । সুতরাং উৎপত্তির দিক থেকে স্বাধীনতা বলতে যা খুশি তাই করার অধিকারকে বুঝায় । কিন্তু পৌরনীতিতে অবাধ স্বাধীনতা বলতে কিছু নেই । স্বাধীনতার অর্থ যা খুশি তা করা বা স্বেচ্ছাচারিতা নয় । স্বাধীনতা হল অপরের কাজে হস্তক্ষেপ না করে নিজের কাজ করা । যা ইচ্ছা তা করতে দেয়া হলে সমাজে কারও মান, মর্যাদা এবং জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা থাকবে না । সুতরাং সামাজিক শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার জন্য সব রকম কাজের উপর নিয়ন্ত্রণ থাকা প্রয়োজন । কারণ নিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতাই প্রকৃত স্বাধীনতা ।

স্বাধীনতার সংজ্ঞা ও প্রয়োজনীয়তা

স্বাধীনতার অর্থ যা খুশি তা করা বা স্বেচ্ছাচারিতা নয় । অপরের কাজে কোনরকম হস্তক্ষেপ না করে নিজের কাজ করার অধিকারকে স্বাধীনতা বলে ।

সমাজবিজ্ঞানী হার্বার্ট স্পেনসার বলেন, "স্বাধীনতা বলতে খুশিমত কাজ করাকে বোঝায় যদি উক্ত কাজের দ্বারা অন্যের অনুরূপ কাজে বাধা সৃষ্টি করা না হয় ।"

টি.এইচ. গ্রিন বলেন, "যা উপভোগ করার এবং সম্পন্ন করার যোগ্য, তা উপভোগ ও সম্পাদন করার ক্ষমতাকে স্বাধীনতা বলে ।"

জন স্টুয়ার্ট মিল বলেন, "মানুষের মৌলিক শক্তির বলিষ্ঠ, অব্যাহত ও বিভিন্নমুখী প্রকাশই স্বাধীনতা । স্বাধীনতার অর্থ মানুষ কর্তৃক নিজস্ব উপায়ে কল্যাণ অনুধাবন করা ।"

অধ্যাপক লাস্কি বলেন, "স্বাধীনতা বলতে সেই সব সামাজিক বিধিনিষেধের অপসারণকে বোঝায় যা সভ্য জগতে মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য অপরিহার্য ।" সুতরাং স্বাধীনতা হল এমন পরিবেশ যা কারও ক্ষতি না করে নিজের অধিকার উপভোগ করতে পারে ।

অতএব স্বাধীনতা হল এমন ধরনের সুযোগ-সুবিধা যা দ্বারা কোন ব্যক্তি তার ব্যক্তিত্বের চরম বিকাশ সাধন করতে সক্ষম হয় । ব্যক্তি তার স্বাভাবিক সুকুমার বৃত্তিগুলোর বিকাশ সাধনে অন্যের দ্বারা বাধাগ্রস্ত না হয় ।

মানুষের জীবনে স্বাধীনতার প্রযোজনীয়তা অপরিসীম । স্বাধীনতা না থাকলে মানুষ দাসে পরিণত হয় । কেননা আইনের আওতার মধ্যে নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী চলতে না পারলে অন্যের ইচ্ছায় চলতে হবে । এ ধরনের পরিস্থিতি পরাধীনতার নামান্তর ।

স্বাধীনতা মানুষের জীবনকে নিরাপদ এবং মর্যাদাসম্পন্ন করে । ব্যক্তিত্বের বিকাশ এবং নতুন কিছু সৃষ্টির সুযোগ করে দেয় । স্বাধীনতা মানুষের মধ্যে অধিকার বোধ জাগ্রত করে । স্বাধীনতা থাকলেই মানুষ তার প্রাপ্য আদায় করতে পারে । পরাধীনতার গ্লানি থেকে মুক্ত থেকে আত্মমর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকার সুযোগ পায় । স্বাধীনতা ব্যক্তির জীবনে শান্তি, উন্নতি ও কল্যাণ বয়ে আনে । তাই মানুষের স্বাভাবিক জীবনের জন্য স্বাধীনতা অপরিহার্য । সমাজ,

রাষ্ট্র, ধর্ম, কর্ম সকল ক্ষেত্রেই স্বাধীনতার প্রয়োজন। স্বাধীনতা জীবনকে নিরাপদ, মহীয়ান, গৌরবময় করে তোলে।

সারসংক্ষেপ

স্বাধীনতার শাব্দিক অর্থ হল ইচ্ছানুযায়ী যা খুশি তাই করা। কিন্তু স্বাধীনতা আর স্বেচ্ছাচারিতা এক নয়। পৌরনীতিতে স্বাধীনতার অর্থ নিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতা। মানবজীবনে স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের বিকাশ এবং সৃজনশীল কাজের জন্য স্বাধীনতার প্রয়োজন। স্বাধীনতাহীন জীবন মানুষের কাম্য নয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

(ক) নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। পৌরনীতিতে স্বাধীনতার অর্থ

(ক) নিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতা (খ) অবাধ স্বাধীনতা

(গ) যা খুশি তা করার স্বাধীনতা (ঘ) ব্যক্তির স্বাধীনতা

২। 'মানুষের মৌলিক শক্তির বলিষ্ঠ অব্যাহত ও বিভিন্নমুখী প্রকাশই স্বাধীনতা।" বলেছেন–

(ক) অধ্যাপক লাস্কি(খ) টি.এইচ. গ্রিন

(গ) জন স্টুয়ার্ট মিল (ঘ) অধ্যাপক ম্যাকাইভার

(খ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১। স্বাধীনতার সংজ্ঞা দিন।

২। পৌরনীতিতে 'স্বাধীনতা' শব্দটির অর্থ কি?

(গ) রচনামূলক প্রশ্ন

১। স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করুন।

(ক) উত্তরমালা

১. ক, ২. গ

পাঠ-৫ : স্বাধীনতা ও সাম্যের সম্পর্ক

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- সাম্য কি জানতে পারবেন ।
- স্বাধীনতা ও সাম্যের সম্পর্ক আলোচনা করতে পারবেন ।

সাম্য

সাম্যের অর্থ সমান । কিন্তু সমাজে সকলেই সমান নয় বা সমান হওয়া সম্ভবও নয় । পৌরনীতিতে সাম্য বলতে সমান করে নেয়ার প্রক্রিয়াকে বোঝায় । জাতি ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে সমান সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থাকে সাম্য বলে । কারও জন্য বিশেষ সুযোগ-সুবিধা না থাকা এবং সবার জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করার নামই সাম্য । অধ্যাপক লাস্কির মতে, "সাম্য হল সেই সব সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা যাতে কোন ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে অন্যের সুবিধার স্বার্থে বিসর্জন দিতে না হয় ।"

স্বাধীনতা ও সাম্যের সম্পর্ক

স্বাধীনতা ও সাম্যের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে । কেউ কেউ স্বাধীনতা ও সাম্যের মধ্যে বিরোধ খুঁজে পান । লর্ড এ্যাক্টন, টকভিল স্বাধীনতা ও সাম্যকে পরস্পর বিরোধী আদর্শ বলে মনে করেন । লর্ড এ্যাকটন বলেন, "সাম্যের নেশা স্বাধীনতার আশাকে ব্যর্থ করেছে ।"

কিন্তু তাঁদের ধারণা সঠিক নয়, কেননা স্বাধীনতা ও সাম্যের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান । স্বাধীনতা বলতে যা খুশি তা করা বুঝায় না । স্বাধীনতা বলতে নিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতা বোঝায় ।

সাম্য ও স্বাধীনতার সম্পর্ক নিম্নরূপ–

১ । সাম্যের মাঝে স্বাধীনতার মূল্য নিহিত । সাম্য নিয়ন্ত্রণের নিশ্চয়তা বিধান করে । সাম্য সংরক্ষণের জন্য রাষ্ট্র সম্পদ ও সুযোগ-সুবিধার সমবণ্টনের ব্যবস্থা করে ।

২ । সাম্য ও স্বাধীনতার মধ্যে কোন বিরোধ নেই । পরস্পর পরস্পরের সহায়ক ও পরিপূরক । স্বাধীনতা উপভোগের জন্য সাম্যের প্রয়োজন । অধ্যাপক টনি বলেন, "সাম্য স্বাধীনতার জন্য অপরিহার্য । সাম্য ব্যতীত স্বাধীনতাকে কল্পনা করা যায় না ।"

৩ । দার্শনিক রুশো বলেন, "সাম্য ব্যতীত স্বাধীনতা অর্থহীন ।" সাম্য না থাকলে স্বাধীনতা থাকতে পারেনা । অধ্যাপক লাস্কি বলেন, "রাষ্ট্র যত বেশি সমতা বিধান করবে, স্বাধীনতার উপভোগ তত বেশি নিশ্চিত হবে ।" সাম্য সকলকে পর্যাপ্ত সুবিধা দান করে সম্পদের সমবণ্টনকে নিশ্চিত করে ।

৪ । সাম্য ও স্বাধীনতা পরস্পর পরিপূরক ও সহায়ক । সাম্যের নিশ্চয়তা না থাকলে কোন প্রকার স্বাধীনতাও থাকে না । তাই সাম্যের জন্য স্বাধীনতার প্রয়োজন, আবার স্বাধীনতার জন্য সাম্যের প্রয়োজন । সাম্যই স্বাধীনতা এবং স্বাধীনতাই সাম্য । উভয়ের সম্পর্ক দেহ ও প্রাণের ন্যায় । এদের মধ্যে কোন বিরোধ নেই । পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক ও সম্পূরক ।

মানুষের বিভিন্নমুখী বিকাশ সাধনের জন্য সমান সুযোগ-সুবিধার প্রয়োজন । সুযোগ-সুবিধা দানের সাম্যাবস্থা বিরাজ করলে মানুষ সেসব সুযোগ গ্রহণ করে আত্ম বিকাশ ঘটাতে পারে ।

সারসংক্ষেপ

সাম্য ও স্বাধীনতা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। মানুষের স্বাধীনতা উপভোগের জন্য সাম্যের প্রয়োজন। বৈষম্যমূলক সমাজে মানুষের প্রকৃত সত্তার বিকাশ সম্ভব নয়। তাই স্বাধীনতা উপভোগ করতে হলে সাম্য প্রয়োজন। সুতরাং স্বাধীনতার জন্য যেমন সাম্যের প্রয়োজন তেমনি সাম্যের জন্যও স্বাধীনতার প্রয়োজন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

(ক) নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। স্বাধীনতা ও সাম্য পরস্পর বিরোধী আদর্শ বলেছেন–

(ক) জন লক ও রুশো (খ) বেন্থাম ও মিল

(গ) টনি ও লাস্কি (ঘ) এ্যাকটন ও টকভিল

২। 'সাম্য ব্যতীত স্বাধীনতা অর্থহীন'-বলেছেন

(ক) ম্যাকাইভার (খ) রুশো

(গ) আব্রাহাম লিংকন (ঘ জনলক

(খ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১। অধ্যাপক লাস্কি ও রুশো স্বাধীনতা ও সাম্য সম্পর্কে কি বলেছেন?

২। সাম্যের অর্থ কি?

(গ) রচনামূলক প্রশ্ন

১। স্বাধীনতা ও সাম্যের সম্পর্ক নির্ণয় করুন।

(ক) উত্তরমালা

১। (ঘ), ২। (খ)

ইউনিট ১১

সংবিধান

ভূমিকা

সংবিধান হল রাষ্ট্রের দর্পণ। রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য লিখিত ও অলিখিত নিয়মাবলির সমষ্টিকে সংবিধান বলে। সরকার গঠনের পদ্ধতি ও সরকারের ক্ষমতার বিভিন্ন দিক, জনগণের সাথে সরকারের সম্পর্ক, সরকারের বিভিন্ন বিভাগের প্রকৃতি ও পরিধি সংবিধানে নির্ধারিত থাকে। প্রকৃতপক্ষে সংবিধান হল কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ আইনগত বিধান, যে বিধানের দ্বারা রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগ ও অংশের মধ্যে সংযুক্তি ঘটে। রাষ্ট্রের প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য এবং সমগ্র জাতির জীবন পদ্ধতি সংবিধানের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

সংবিধানকে লিপিবদ্ধকরণ ও সংশোধনের ভিত্তিতে চার শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। যথা–

(ক) সংবিধান লিপিবদ্ধ করণের ভিত্তিতে : ১. লিখিত সংবিধান ২. অলিখিত সংবিধান।

(খ) সংবিধান সংশোধন পদ্ধতির ভিত্তিতে : ১. সুপরিবর্তনীয় ২. দুষ্পরিবর্তনীয়।

সংবিধান সংক্রান্ত আলোচনায় বিভিন্ন দেশের সংবিধান কিভাবে গড়ে উঠেছে, কোন্ সংবিধান উত্তম-এ সকল প্রশ্ন চলে আসে। যে সংবিধান জনগণের প্রয়োজনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, সুস্পষ্ট ও বোধগম্য, সংক্ষিপ্ত, যুগোপযোগী, স্থায়ী ও মৌলিক অধিকার সংম্বলিত তাই উত্তম সংবিধান। বর্তমান ইউনিটে নিম্নোক্ত পাঠগুলো আলোচনা করা হলো :

পাঠ-১ : সংবিধানের সংজ্ঞা ও শ্রেণীবিভাগ।
পাঠ-২ : সংবিধান প্রতিষ্ঠার বিভিন্ন পদ্ধতি।
পাঠ-৩ : উত্তম সংবিধানের বৈশিষ্ট্য।

পাঠ-১ : সংবিধানের সংজ্ঞা ও শ্রেণীবিভাগ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- সংবিধানের সংজ্ঞা জানতে পারবেন ।
- সংবিধানের বিভিন্ন শ্রেণী বিভাগ আলোচনা করতে পারবেন ।

সংবিধান

প্রত্যেক রাষ্ট্রের নিজস্ব সংবিধান থাকে । সংবিধান রাষ্ট্রের প্রতিচ্ছবি । একটি রাষ্ট্রকে তার সংবিধান দ্বারা জানা যায় । সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয় । সরকারের রূপ, সরকার ও জনগণের মধ্যে সম্পর্ক সংবিধান কর্তৃক নির্ধারিত হয় । সংবিধান হল রাষ্ট্রের সে সব নীতিমালা, যা দ্বারা রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয় ।

সংবিধানের সংজ্ঞা

এরিস্টটল বলেন, 'সংবিধান হল রাষ্ট্র কর্তৃক পছন্দকৃত জীবন প্রণালী ।'

কে সি হুইয়ার বলেন, "কোন্ উদ্দেশ্যে এবং কোন্ কোন্ বিভাগের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা চর্চা করা হবে সেগুলো যে দলিল বা বিধিমালা নির্ধারণ করে তাই সংবিধান ।"

লর্ড ব্রাইস বলেন, "রাষ্ট্রীয় জীবন পরিচালনার জন্য আইন ও রীতিনীতির সমষ্টিকেই সংবিধান বলে ।"

সি. এফ. স্ট্রং বলেন, "সংবিধান হল কতগুলো নিয়মের সমষ্টি যা দ্বারা শাসকের ক্ষমতা, শাসিতের অধিকার এবং উভয়ের মধ্যে সম্পর্কের সামঞ্জস্য বিধান করে ।"

ডাইসি বলেন, "প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যে সকল বিধিবিধান রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার বণ্টন অথবা প্রয়োগের রীতি-নীতিকে প্রভাবিত করে তাই সংবিধান ।"

গিলক্রাইস্ট বলেন, "সংবিধান হল কতগুলো লিখিত বা অলিখিত নিয়মের সমষ্টি যা দ্বারা সরকার গঠিত হয়, সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন করা হয় এবং ঐসব বিভাগের কাজের ক্ষেত্র নির্দিষ্ট করা হয় ।"

সুতরাং সংবিধান হল সরকার ও তার বিভিন্ন বিভাগের সংগঠন, ক্ষমতা বণ্টন এবং শাসক ও শাসিতের অধিকার ও কর্তব্য সংক্রান্ত কতগুলো মৌলিক নীতির সমষ্টি । সংবিধানবিহীন রাষ্ট্রের কথা কল্পনা যায় না ।

সংবিধানের শ্রেণীবিভাগ

বিভিন্ন রাষ্ট্রের সংবিধানের প্রকৃতি, ধরন ও যথার্থ স্বরূপ জানার সুবিধার্থে সংবিধানের শ্রেণীবিভাগ করা হয়ে থাকে । সাধারণত দুটি ভিত্তি অনুযায়ী সংবিধানকে চার শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয় ।

১ । লিপিবদ্ধকরণের প্রকৃতি ও পরিমাণের উপর ভিত্তি করে সংবিধানকে দুভাগে ভাগ করা হয় । যেমন– (১) লিখিত সংবিধান ও (২) অলিখিত সংবিধান ।

২ । সংশোধন পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে সংবিধানকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা হয় । যেমন– (১) সুপরিবর্তনীয় সংবিধান ও (২) দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান ।

লিখিত সংবিধান

কোন রাষ্ট্রের শাসন পরিচালনার মৌলিক নিয়ম-কানুনগুলো যখন এক বা একাধিক দলিলে লিপিবদ্ধ থাকে তখন তাকে লিখিত সংবিধান বলে। যেমন– বাংলাদেশ, ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান প্রভৃতি দেশের সংবিধান লিখিত।

অলিখিত সংবিধান

কোন রাষ্ট্রের শাসন পরিচালনার মৌলিক নিয়ম-কানুনগুলো অধিকাংশই যখন কোন দলিলে লিখিত আকারে লিপিবদ্ধ থাকে না তখন তাকে অলিখিত সংবিধান বলে। অলিখিত সংবিধান মূলত প্রথা, বিচারকের রায়, আচার-ব্যবহার ও রীতি-নীতির উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। এরূপ সংবিধান তৈরি হয় না, গড়ে ওঠে। এ সংবিধানের কিছু কিছু ধারা বিচ্ছিন্নভাবে লিপিবদ্ধ থাকে। যেমন– ব্রিটিশ সংবিধান। ঐতিহাসিক ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে অলিখিত সংবিধান গড়ে ওঠে। কোন সংবিধান পরিষদ কর্তৃক অলিখিত সংবিধানকে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয় না। সুতরাং অলিখিত সংবিধান হল যার অধিকাংশই অলিখিত আর অল্প অংশ লিখিত। যেমন– যুক্তরাজ্যের সংবিধান।

সুপরিবর্তনীয় ও দুষ্পরিবর্তীনীয় সংবিধান

সংবিধান সংশোধন পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে লর্ড ব্রাইস সংবিধানকে সুপারিবর্তনীয় এবং দুষ্পরিবর্তনীয়– এ দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন। নিম্নে তা আলোচনা করা হলো–

সুপরিবর্তনীয় সংবিধান

সুপরিবর্তনীয় সংবিধান বলতে সেই সংবিধানকে বোঝায় যা সাধারণ আইন তৈরির নীতি ও পদ্ধতিতে সংশোধন করা যায়। এ সংবিধান পরিবর্তন বা সংশোধন করার জন্য কোন জটিল বা পৃথক পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয় না। সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় আইন সভা এর যে কোন ধারা সংশোধন করতে পারে। ব্রিটিশ সংবিধান এবং নিউজিল্যাণ্ডের সংবিধান সুপরিবর্তনীয় সংবিধান।

দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান

যে সংবিধান পরিবর্তন ও সংশোধন করতে বিশেষ এবং জটিল পদ্ধতির অবলম্বন করতে হয় তাকে দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান বলে। দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানকে সাধারণ আইন তৈরির পদ্ধতিতে পরিবর্তন বা সংশোধন করা যায় না। যেমন বাংলাদেশের সাধারণ আইন প্রণয়ন করতে আইন সভার সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রয়োজন হয়। কিন্তু সংবিধান পরিবর্তন করতে হলে দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সম্মতির প্রয়োজন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানও দুষ্পরিবর্তনীয়। কেননা সে দেশের সংবিধান পরিবর্তন বা সংশোধন করার জন্য জটিল পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয়।

সারসংক্ষেপ

সংবিধান হল রাষ্ট্রে শাসনব্যবস্থা পরিচালনার মৌলিক দলিল। সংবিধান অনুযায়ী সরকার পরিচালিত হয় এবং সরকার ও জনসাধারণের মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারিত হয়। সংবিধান লিখিত এবং অলিখিত হতে পারে তবে সংশোধনের দিক থেকে সংবিধান সুপরিবর্তনীয় এবং দুষ্পরিবর্তনীয় হতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

(ক) নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থা পরিচালিত হয়–

(ক) শাসকের ইচ্ছা দ্বারা (খ) সাধারণ আইন দ্বারা

(গ) সংবিধান দ্বারা (ঘ) ধর্মীয় বিধান দ্বারা

২। অলিখিত সংবিধানের প্রকৃষ্ট উদাহরণ–

(ক) বাংলাদেশ (খ) ভারত

(গ) ব্রিটেন (ঘ) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

(খ) সংক্ষিপ্ত উত্তর মূলক প্রশ্ন

১। সংবিধানের সংজ্ঞা দিন।

২। সংবিধানের শ্রেণীবিভাগ কী কী?

৩। অলিখিত সংবিধান কিভাবে গড়ে ওঠে?

(গ) রচনামূলক প্রশ্ন

১। সংবিধানের শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে আলোচনা করুন।

(ক) উত্তরমালা

১। (গ), ২। (গ)

পাঠ-২ : সংবিধান প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

➡ সংবিধান প্রতিষ্ঠার পদ্ধতিসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

সংবিধান প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি

বিশ্বের সব রাষ্ট্রের সংবিধান একই পদ্ধতিতে সৃষ্টি হয়নি বা গড়ে ওঠেনি। বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে সংবিধান গড়ে উঠেছে। তবে অধ্যাপক গেটেলসহ অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর মতে চারটি পদ্ধতিতে বিভিন্ন দেশের সংবিধান গড়ে উঠেছে। এগুলো হচ্ছে–

১. মঞ্জুরি বা অনুমোদনের দ্বারা।
২. আলাপ-আলোচনা বা গণপরিষদ দ্বারা রচনা।
৩. বিপ্লবের মাধ্যমে।
৪. বিবর্তনের মাধ্যমে।

নিম্নে এগুলো আলোচনা করা হলো –

(১) **মঞ্জুরি বা অনুমোদনের মাধ্যমে :** অতীতকালে প্রায় সব দেশে স্বৈরাচারী শাসন বিদ্যমান ছিল। এরূপ শাসন ব্যবস্থায় জনগণ সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। রাজার আদেশই ছিল আইন বা সংবিধান। তারা নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করতেন। কালক্রমে রাজার ক্ষমতা হ্রাস পায়। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সূচনা হয়। গণ-অসন্তোষ দেখা দেয়। ফলে রাজা স্বেচ্ছায় অথবা বিপ্লবের ভয়ে জনগণের সাথে ক্ষমতা ভাগাভাগি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। রাজা বা শাসক দলিল বা চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে জনগণের হাতে বেশ কিছু ক্ষমতা ও অধিকার ছেড়ে দেয়। এভাবে মঞ্জুরি বা অনুমোদনের মাধ্যমে সংবিধান গড়ে ওঠে। রাজতান্ত্রিক জাপান ও নেপালের সংবিধান এভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

(২) **গণ-পরিষদ দ্বারা রচনা :** নতুন স্বাধীনতাপ্রাপ্ত সকল রাষ্ট্রের সংবিধান এ পদ্ধতিতে তৈরি হয়েছে। স্বাধীনতা অর্জনকারী কর্তৃপক্ষ জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গণপরিষদ গঠন করেন। গণ-পরিষদ সংবিধানের খসড়ার উপর আলোচনা ও বিতর্কের পর সংবিধান প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করেন। বাংলাদেশ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারত এবং পাকিস্তানের সংবিধান এ পদ্ধতিতে তৈরি করা হয়েছে। সংবিধান প্রণয়ন বা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এ পদ্ধতিকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা স্বাভাবিক, গণতান্ত্রিক ও আধুনিক পদ্ধতি বলে অভিহিত করেছেন।

(৩) **বিপ্লবের মাধ্যমে :** বিশ্বের অনেক রাষ্ট্রেই বিপ্লবের মাধ্যমে সংবিধান লাভ করেছে। প্রচলিত শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে জনগণের অসন্তোষকে কাজে লাগিয়ে বিপ্লবের মাধ্যমে শাসক ও শাসনব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটায়। নতুন শাসক গোষ্ঠী বিপ্লবী পরিষদের মাধ্যমে নতুন সংবিধান তৈরি করে। স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে বিপব ঘটিয়ে এরূপ সংবিধান প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন ও ফ্রান্সের সংবিধান এ পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

(৪) **বিবর্তনের মাধ্যমে :** সংবিধান ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। কোন গোষ্ঠীর দ্বারা নয় বরং দেশের প্রচলিত আচার, রীতি-নীতির গভীর প্রভাবে সেগুলো সংবিধানের ধারায় পরিণত হয়। শাসকগোষ্ঠী সেগুলোকে উপেক্ষা করতে পারে না। বরং মেনে চলে। ব্রিটেনের সংবিধান এভাবে গড়ে উঠেছে। তাই বলা হয় যে ব্রিটিশ সংবিধান তৈরি করা হয়নি, গড়ে উঠেছে।

সারসংক্ষেপ

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে সংবিধান গড়ে উঠেছে। কোন দেশে মঞ্জুরি বা অনুমোদন দ্বারা কোথাও আলাপ-আলোচনা বা ইচ্ছাকৃত রচনা দ্বারা, কোন দেশে বিপ্লবের মাধ্যমে আবার কোথাও বিবর্তনের মাধ্যমে সংবিধান গড়ে উঠেছে। কোন একক প্রক্রিয়ায় বিশ্বের কোন দেশে সংবিধান গড়ে উঠেনি। বিভিন্ন দেশের সংবিধান বিভিন্ন প্রক্রিয়ার ফসল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

(ক) নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। গেটেলের মতে সংবিধান প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি হল

(ক) ছয়টি (খ) পাঁচটি

(গ) চারটি (ঘ) সাতটি

২। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ সংবিধান প্রতিষ্ঠার কোন পদ্ধতিকে স্বাভাবিক, গণতান্ত্রিক এবং আধুনিক বলেছেন-

(ক) গণপরিষদ দ্বারা রচনা (খ) মঞ্জুরি বা অনুমোদন

(গ) বিপ্লবের মাধ্যমে (ঘ) বিবর্তনের মাধ্যমে

৩। বিবর্তনের মাধ্যমে গড়ে উঠেছে-

(ক) বাংলাদেশের সংবিধান (খ) রাশিয়ার সবিধান

(গ) ব্রিটেনের সংবিধান (ঘ) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান

(খ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১। সংবিধান প্রতিষ্ঠার পদ্ধতিগুলো কী কী?

২। সংবিধান প্রতিষ্ঠার মঞ্জুরি বা অনুমোদন পদ্ধতি সম্পর্কে কী জানেন?

(গ) রচনামূলক প্রশ্ন

১। সংবিধান প্রতিষ্ঠার পদ্ধতিগুলো আলোচনা করুন।

(ক) উত্তরামালা

১। (গ), ২। (ক), ৩। (গ)

পাঠ-৩ : উত্তম সংবিধানের বৈশিষ্ট্য

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- উত্তম সংবিধানের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

উত্তম সংবিধানের বৈশিষ্ট্য

প্রত্যেক রাষ্ট্র তার পছন্দসই যে জীবন পদ্ধতি বেছে নেয় তা-ই সংবিধান। একটি দেশের সংবিধান যত উত্তম সে দেশের শাসন ব্যবস্থাও তত উন্নত এবং সে জাতিও তত আধুনিক। সংবিধান একটি জাতির ইতিহাস, ভাষা, সাহিত্য, কৃষ্টি, সভ্যতা, আচার-ব্যবহার ইত্যাদির দর্পণ স্বরূপ। তাই প্রত্যেক জাতির সংবিধান উত্তম হওয়া বাঞ্ছনীয়। একটি উত্তম সংবিধানের বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নে আলোচনা করা হলো :

১। **সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট :** উত্তম সংবিধান লিখিত ও সুস্পষ্ট হবে। সংবিধানের প্রয়োজনীয় ধারাগুলো লিপিবদ্ধ থাকবে এবং অর্থের দিক থেকে সুস্পষ্ট হবে। যাতে সংবিধানের অর্থ বা ব্যাখ্যা নিয়ে কোনরূপ মতভেদ সৃষ্টি না হয়। সংবিধানের ধারাসমূহ হবে সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট।

২। **লিখিত :** সংবিধান লিখিত হওয়াই উত্তম। লিখিত সংবিধান অধিকতর সুনির্দিষ্ট।

৩। **সংক্ষিপ্ততা :** উত্তম সংবিধান সংক্ষিপ্ত হবে। অযথা অধিক বিবরণ উত্তম সংবিধানের কাম্য নয়। অবশ্যপালনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ ধারাগুলো শুধু সংবিধানে স্থান পাবে।

৪। **মধ্যম প্রকৃতির :** সংশোধনের দিক থেকে উত্তম সংবিধান মধ্যম অবস্থানে থাকবে। সংশোধন পদ্ধতি অত্যন্ত জটিল অথবা একেবারে সহজ হবে না। জাতীয় প্রয়োজনে সংবিধান যেন সংশোধন করার সহজ ব্যবস্থা থাকে।

৫। **মৌলিক অধিকার সন্নিবেশ :** উত্তম সংবিধান অবশ্যই জনগণের মৌলিক অধিকার সম্বলিত দলিল হবে। মৌলিক অধিকারের উল্লেখ স্বেচ্ছাচারের পথ রোধ করে নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করে। সংবিধান নাগরিক অধিকারের গ্যারান্টি। তাই উত্তম সংবিধানে নাগরিক জীবনের বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় মৌলিক অধিকারগুলো অবশ্য থাকতে হবে।

৬। **যুগোপযোগিতা :** সংবিধানকে যুগোপযোগী হতে হবে। একে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হবে।

৭। **জাতীয় আদর্শ, লক্ষ্য ও মূলনীতির উল্লেখ :** সংবিধান একটি জাতির জীবন-দর্পণ। এজন্য উত্তম সংবিধানে জাতীয় লক্ষ্য ও আদর্শ, রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিসমূহের উল্লেখ থাকবে এবং সমগ্র সংবিধানে তার ছাপ থাকবে।

উপরে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্য কোনো সংবিধানে বিদ্যমান থাকলে তাকে উত্তম সংবিধান বলা যাবে।

সারসংক্ষেপ

কোন দেশের সংবিধান যত উৎকৃষ্ট, সে দেশ ও সে জাতি তত উন্নত। তাই প্রত্যেক দেশে উত্তম সংবিধান হওয়া বাঞ্ছনীয়। উত্তম সংবিধানে সুস্পষ্ট, লিখিত, সংক্ষিপ্ত, মধ্যম প্রকৃতির মৌলিক অধিকার সম্বলিত, যুগোপযোগী এবং জাতীয় আদর্শ ও লক্ষ্য সম্বলিত হওয়া প্রয়োজন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

(ক) নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

(ক) সঠিক উত্তরটি লিখুন

১। রাষ্ট্র যে জীবন পদ্ধতি বেছে নেয় তা-ই সেই রাষ্ট্রের–

(ক) সরকার (খ) আইনসভা

(গ) সংবিধান (ঘ) সার্বভৌমত্ব

২। সুপরিবর্তনীয় ও দুষ্পরিবর্তনীয় এ দুয়ের মাঝামাঝি সংবিধানের পরিচয় হল–

(ক) সংক্ষিপ্ত (খ) মধ্যম-প্রকৃতির

(গ) দীর্ঘ (ঘ) নাতিদীর্ঘ

৩। জাতীয় আদর্শ, লক্ষ্য ও মূলনীতি সংবিধানে উল্লেখ থাকা প্রয়োজনীয় কেননা সংবিধান হল

(ক) অতি প্রয়োজনীয় দলিল (খ) একটি জাতির জীবন-দর্পণ

(গ) নাগরিকগণের অধিকার রক্ষাকারী (ঘ) যুগোপযোগী

(খ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. উত্তম সংবিধান কাকে বলা যাবে?

২. উত্তম সংবিধানের বৈশিষ্ট্য কী কী?

(গ) রচনামূলক প্রশ্ন

১. উত্তম সংবিধানের বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করুন।

(ক) উত্তরমালা

১। (গ), ২। (খ), ৩। (ক)

ইউনিট
১২

রাজনৈতিক দল

ভূমিকা

আধুনিক গণতন্ত্র হল পরোক্ষ বা প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র। এ যুগে বিশালয়তন রাষ্ট্রগুলোর জনগোষ্ঠীর পক্ষে প্রত্যক্ষভাবে রাষ্ট্রের শাসনকাজে অংশগ্রহণ করা সম্ভব নয়। এ কারণে জনগণ প্রতিনিধি নির্বাচন করে তাদের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করে থাকে। এ নির্বাচনকার্য সম্পন্ন হয় দলীয় ভিত্তিতে। বর্তমান প্রতিনিধিত্বমূলক গণতান্ত্রিক সরকারকে তাই দলীয় সরকার বলা হয়। প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের মূল ভিত্তিই হল রাজনৈতিক দল। রাজনৈতিক দল শুধু সরকার গঠনের ক্ষেত্রেই নয়, জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা ও জনগণকে রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ কারণে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলের কার্যপরিধি অত্যন্ত ব্যাপক। 'রাজনৈতিক দল' শীর্ষক ইউনিটের আলোচনা তিনটি পর্বে বিন্যস্ত হলো :

পাঠ-১ : রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য।
পাঠ-২ : রাজনৈতিক দলের কার্যাবলী।
পাঠ-৩ : গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলের গুরুত্ব।

পাঠ-১ : রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা বলতে পারবেন ।
- রাজনৈতিক দলের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন ।

রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা

যখন কোন জনসমষ্টি রাষ্ট্রের সমস্যা সম্পর্কে একমত পোষণ করে, নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় ক্ষমতা আরোহণে আগ্রহী এবং রাজনীতি সচেতন হয়ে সংঘবদ্ধ হয় তখন এই সংঘবদ্ধ একদল লোককে 'রাজনৈতিক দল' বলে ।

এণ্ডমণ্ড বার্ক বলেন, *"রাজনৈতিক দল এরূপ একটি জনসমষ্টি যারা কিছু ঐক্যবদ্ধ নীতির ভিত্তিতে জাতীয় স্বার্থ অর্জনের জন্যে সংঘবদ্ধ হয়েছে ।"*

অধ্যাপক গেটেল বলেন, *"রাজনৈতিক দল বলতে কম-বেশি সংগঠিত একদল লোককে বোঝায়, যারা রাজনৈতিকভাবে এককরূপে কাজ করে এবং ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে সরকার গঠন ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে চায় ।"*

অধ্যাপক ফাইনার বলেন, *"আধুনিক গণতান্ত্রিক শাসন কার্যত রাজনৈতিক দলের শাসন ।"*

ম্যাকাইভার বলেন, *"রাজনৈতিক দল বলতে সেই জনগোষ্ঠীকে বোঝায় যারা সুনির্দিষ্ট নীতির ভিত্তিতে সম্মিলিত এবং নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় সরকার গঠনে প্রয়াসী ।"*

অধ্যাপক সুস্পিটার রাজনৈতিক দলের একটি সংক্ষিপ্ত অথচ উত্তম সংজ্ঞা দিয়েছেন । তিনি বলেন, *"রাজনৈতিক দল এমন একটি সংস্থা যার সদস্যবৃন্দ রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের প্রতিযোগিতায় ঐক্যবদ্ধ ।"*

বস্তুত রাজনৈতিক দল বলতে এমন এক সংঘবদ্ধ জনসমষ্টিকে বোঝায় যারা রাষ্ট্রের সমস্যা সম্পর্কে ঐকমত্য পোষণ করে এবং নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ক্ষমতা দখলের মাধ্যমে গৃহীত কর্মসূচি বাস্তবায়নে এগিয়ে যায় । প্রকৃত রাজনৈতিক দলের কাছে নেতা ও দলের চেয়ে দেশের স্বার্থ বড় ।

রাজনৈতিক দলের বৈশিষ্ট্য

রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা ব্যাখ্যা করলে এর কতগুলো বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় । নিম্নে বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করা হলো ঃ

১ । রাজনৈতিক দল কিছু সংখ্যক মানুষের একটি রাজনৈতিক সংগঠন ।

২ । রাজনৈতিক দলের সদস্যগণ কম-বেশি একইরূপ আদর্শ ও নীতির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে একত্রিত হয় ।

৩ । রাজনৈতিক দল নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে ক্ষমতা দখল করার চেষ্টা করে ।

৪ । জনমতের দিকে লক্ষ্য রেখে রাজনৈতিক দল কর্মসূচি প্রণয়ন ও প্রচার, নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়ন এবং জয়লাভের চেষ্টা করে ।

৫ । রাজনৈতিক দলগুলো নিজ নিজ দলীয় স্বার্থ সংরক্ষণ করে থাকে ।

৬ । রাজনৈতিক দল দলীয় নীতির ভিত্তিতে জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ করতে চায় ।

বস্তুত সংগঠন, কর্মসূচি ও ক্ষমতালাভ রাজনৈতিক দলের মূল বৈশিষ্ট্য ।

সারসংক্ষেপ

রাজনৈতিক দল জনসমষ্টি, ঐক্যবদ্ধনীতি এবং জাতীয় স্বার্থ অর্জনের জন্য সংঘবদ্ধ। রাজনৈতিক দল মূলত একটি সংগঠন। রাজনৈতিক সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করে দলীয় নীতির ভিত্তিতে জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ করে এবং নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত হয়ে রাজনৈতিক দল ক্ষমতা দখল করতে প্রয়াসী হয়। এছাড়া, পরাধীন দেশের রাজনৈতিক দল জনগণকে স্বাধীনতার প্রেরণা দান করে এবং স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালনা করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

(ক) নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। রাজনৈতিক দলের মূল লক্ষ্য কী হওয়া বাঞ্ছনীয়?

(ক) জনগণের কল্যাণ সাধন করা (খ) সরকারের সমালোচনা করা

(গ) সরকারের দুর্বল দিক চিহ্নিত করা (ঘ) রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করা

২। যে জনসমষ্টি সরকার গঠনে প্রয়াসী তাদের বলা হয়–

(ক) এনজিও (খ) স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী

(গ) রাজনৈতিক দল (ঘ) ধর্মীয় সংগঠন

৩। রাজনৈতিক দলের সংক্ষিপ্ত অথচ উত্তম সংজ্ঞা দিয়েছেন–

(ক) অধ্যাপক ফাইনার (খ) জন লক

(গ) এরিস্টটল (ঘ) অধ্যাপক সুম্পিটার

(খ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১। রাজনৈতিক দল কাকে বলে?

২। রাজনৈতিক দলের প্রামাণ্য সংজ্ঞা দিন।

(গ) রচনামূলক প্রশ্ন

১। রাজনৈতিক দলের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।

(ক) উত্তরমালা

১। (ক) ২। (গ), ৩। (ঘ)

পাঠ-২ : রাজনৈতিক দলের কার্যাবলি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- রাজনৈতিক দলের কার্যাবলি আলোচনা করতে পারবেন।

রাজনৈতিক দলের কার্যাাবলি

আধুনিক শাসন ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দল একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। আধুনিককালে রাজনৈতিক দলই সরকার গঠন করে। রাষ্ট্র পরিচালনায় রাজনৈতিক দল বহুমুখী কাজ সম্পাদন করে। তাই রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় সর্বত্রই এর প্রয়োজনীয়তা অত্যধিক। বিশেষ করে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলের ভূমিকা অত্যন্ত ব্যাপক ও সুদূর প্রসারী। নিম্নে রাজনৈতিক দলের কার্যাবলি সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

১। **নীতি নির্ধারণ ও কর্মসূচি প্রণয়ন :** রাজনৈতিক দল কর্মসূচি প্রণয়ন ও নীতি নির্ধারণ করে তার ভিত্তিতেই জনসমর্থন লাভের চেষ্টা চালায়। লোয়েলের মতে, "জনমতকে সবার সামনে উপস্থাপিত করে গণরায় আদায়ের জন্য উপযুক্ত কর্মসূচি প্রণয়ন করা রাজনৈতিক দলের অন্যতম লক্ষ্য। রাজনৈতিক দলের সমর্থকগণ নিজ দলের কর্মসূচির প্রতি অনুগত ও বিশ্বস্ত থাকে।

২। **নির্বাচন-সংক্রান্ত কাজ :** নির্বাচনের সময় রাজনৈতিক দল তাদের দলীয় প্রার্থীদের মনোনয়ন দান করে নির্বাচনী অভিযানের কর্মসূচি প্রণয়ন করে। নির্বাচনে জয়লাভ করার নিমিত্তে দলের সর্বশক্তি নিয়োগ করে এবং সর্বপ্রকার নির্বাচনী কলা-কৌশলকে কাজে লাগায়।

৩। **জনমত গঠন :** দলীয় নীতি ও কর্মসূচির পক্ষে 'জনমত গঠন' করা রাজনৈতিক দলের অন্যতম প্রধান কাজ। রাজনৈতিক দল বক্তৃতা-বিবৃতি ও প্রচারের মাধ্যমে জনমত সৃষ্টি এবং প্রচলিত জনমতকে প্রভাবিত করে।

৪। **রাষ্ট্রীয় সমস্যা নির্ধারণ :** আধুনিক রাষ্ট্রগুলো আয়তনে বিশাল এবং জনসংখ্যাও বিপুল। বেশিরভাগ রাষ্ট্রের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যাও বিচিত্র ধরনের। এসব জটিল সমস্যা নির্ণয় এবং এগুলোর মধ্যে কোন সমস্যার আশু সমাধান প্রয়োজন তা রাজনৈতিক দল নির্ধারণ করে।

৫। **সরকার গঠন :** রাজনৈতিক দলের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হল সরকার গঠন করা। নির্বাচনে যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে, সে দল সরকার গঠন করে।

৬। **বিরোধী ভূমিকা পালন :** গণতন্ত্রে বিরোধী দলের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিরোধী দল সরকারের ভুল-ত্রুটি বা গণবিরোধী পদক্ষেপ সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করে। বিরোধী দলের গঠনমূলক সমালোচনার ভয়ে সরকারি দল জনকল্যাণকর কাজে উদ্যোগী হয়।

৭। **দলীয় শৃঙ্খলা রক্ষা সংক্রান্ত কাজ :** রাজনৈতিক দলের অন্যতম কাজ হল নিজ দলের মধ্যে শৃঙ্খলা বজায় রাখা। এ উদ্দেশ্যে রাজনৈতিক দল দলীয় কর্মীদেরকে দলীয় নীতি ও আদর্শে উদ্বুদ্ধ করে, দলের প্রতি অনুগত রাখে এবং বিভিন্ন প্রকার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে।

৮। **সংযোগ সাধন সংক্রান্ত কাজ :** রাজনৈতিক দল মূলত জনগণ ও সরকারের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে। যে সব রাষ্ট্রে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি কম-বেশি বিদ্যমান সে সব রাষ্ট্রের রাজনৈতিক দল সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সংযোগ সাধনের প্রচেষ্টা চালায়। রাজনৈতিক দলের মাধ্যমেই জনগণ তাদের সমস্যা, অভাব-অভিযোগ সরকারের নিকট তুলে ধরে এবং সরকার সেগুলো অবহিত হয়।

৯। **রাজনৈতিক চেতনা ও শিক্ষা প্রসার সংক্রান্ত কাজ :** দেশের জনগণকে রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা রাজনৈতিক দলের অন্যতম কাজ। নির্বাচনকালীন সময়ে জনসাধারণ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের আলোচনা-সমালোচনা থেকে বিভিন্ন বিষয়ে জানতে ও শিখতে পারে।

১০। **স্বাধীনতার অনুপ্রেরণা সংক্রান্ত কাজ :** যে সকল জাতি আজও পরাধীন, রাজনৈতিক দলের কাজ হল সেক্ষেত্রে এ সকল জাতিকে ধীরে ধীরে স্বাধীনতার দিকে এগিয়ে নেয়া। জনগণকে সে অনুযায়ী সুসংগঠিত করে স্বাধীনতা অর্জন করা।

সারসংক্ষেপ

রাজনৈতিক দলের প্রধান কাজ হল নীতি নির্ধারণ ও কর্মসূচি প্রণয়ন, নির্বাচন, জনমত গঠন, রাষ্ট্রীয় সমস্যা নির্ধারণ, সরকার গঠন, বিরোধী ভূমিকা পালন, দলীয় শৃঙ্খলা রক্ষা, সংযোগ সাধন, রাজনৈতিক চেতনা ও শিক্ষার প্রসার এবং বিভিন্ন জাতিকে স্বাধীনতা সংগ্রাম ও অর্জনে অনুপ্রেরণা দান। এছাড়া, বিশ্বের পরাধীন দেশের রাজনৈতিক দল জনগণকে স্বাধীনতা সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করে এবং স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালনা করে স্বাধীনতা অর্জন করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

(ক) নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বিকল্প বা ছায়া সরকার নামে আখ্যায়িত হয়–

(ক) জনমত (খ) বিচার বিভাগ

(গ) নির্বাচন (ঘ) বিরোধী দল

২। নির্বাচনে যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে সে দল –

(ক) সরকার গঠন করে (খ) রাজপথে আন্দোলন করে

(গ) বিরোধী ভূমিকা নেয় (ঘ) বিপ্লবের প্রস্তুতি নেয়

(খ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১। রাজনৈতিক দলের প্রধান কাজ কী কী?

(গ) রচনামূলক প্রশ্ন

১। রাজনৈতিক দলের কার্যাবলি আলোচনা করুন।

(ক) উত্তরমালা

১। (ঘ), ২। (ক)

পাঠ-৩ ঃ গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলের গুরুত্ব

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলের গুরুত্ব আলোচনা করতে পারবেন।

গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলের গুরুত্ব

আধুনিক প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের মূল ভিত্তিই হল রাজনৈতিক দল। গণতন্ত্রের অপর নাম সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন। জনগণ প্রতিনিধি নির্বাচন করে পরোক্ষভাবে শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করে। অধ্যাপক ফাইনার বলেন, "আধুনিক গণতান্ত্রিক শাসন কার্যত রাজনৈতিক দলের শাসন।" তাই গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলের গুরুত্ব অপরিসীম। গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলের গুরুত্ব ও ভূমিকা নিম্নরূপ–

১। **জনমত গঠন ও রাজনৈতিক সচেতনতা দান :** গণতন্ত্র জনমত দ্বারা পরিচালিত শাসন ব্যবস্থা। বক্তৃতা, বিবৃতি, জনসভা এবং নির্বাচনী প্রচারাভিযানের মাধ্যমে দলীয় কর্মীবৃন্দ জনসাধারণের সামনে দলের কর্মসূচি, আদর্শ ও বক্তব্য তুলে ধরে। এতে জনসাধারণ রাজনৈতিকভাবে সচেতন হয় এবং সুষ্ঠু জনমত প্রদানে সক্ষম হয়। লোয়েলের মতে, "জনমতকে সবার সামনে উত্থাপন করে গণরায় আদায়ের জন্য উপযুক্ত কর্মসূচি প্রণয়ন করা রাজনৈতিক দলের অন্যতম লক্ষ্য।"

২। **সরকার গঠন :** গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় নির্বাচনের সময় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বিভিন্ন কর্মসূচি প্রকাশ করে। জনগণ এ থেকে সবচেয়ে কল্যাণকর ও বাস্তবমুখী কর্মসূচি সম্পন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতি আস্থা ও সমর্থন দান করে। দলীয় ভিত্তিতে জনগণ ভোট প্রদান করে সরকার গঠনে সহায়তা করে। প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের সরকার গঠনে রাজনৈতিক দল জনগণকে সাহায্য করে। রাজনৈতিক দল সরকার ও জনগণের মধ্যে মিলনের সেতু নির্মাণ করে।

৩। **আইন প্রণয়ন ও নীতি নির্ধারণ :** গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আইন প্রণয়ন ও নীতি নির্ধারণ অনেকটাই রাজনৈতিক দলেরই কাজ। কেননা রাজনৈতিক দলই জনমত নির্ণয় করে আবার দলের মাধ্যমেই জনগণ সরকার গঠন, ভাঙন এবং সরকারকে সমর্থন জানাতে পারে। জনগণের সার্বভৌম ক্ষমতার প্রয়োগ রাজনৈতিক দলের মাধ্যমেই হয়ে থাকে।

৪। **শান্তিপূর্ণভাবে সরকার পরিবর্তন :** রাজনৈতিক দল শান্তিপূর্ণ উপায়ে নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তনে সাহায্য করে। সরকার পরিবর্তনের জন্য বিপ্লব বা বিদ্রোহের প্রয়োজন হয় না।

৫। **বিরোধী বিকল্প পক্ষ :** প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল যেন গণবিরোধী কাজে লিপ্ত না হয়, স্বৈরাচারী ও দুর্নীতিপরায়ণ না হয় সেদিকে বিরোধী দলগুলো সতর্ক দৃষ্টি রাখে। প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে বিরোধী দলই 'বিকল্প সরকার'।

৬। **ভিন্নমুখী মতামত একত্রীকরণ :** সাধারণত জনগণ কোন বিষয়ে সহজে একমত হতে পারে না। অধ্যাপক ফাইনারের মতে, "জনগণের মতামত অত্যন্ত ভিন্নমুখী ও বিক্ষিপ্ত।" ভিন্নমুখী ও বিক্ষিপ্ত মতামতকে একমাত্র রাজনৈতিক দলই সংগঠিত করতে পারে। এজন্যই প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের সফলতা নির্ভর করে রাজনৈতিক দলের উপর। তাই রাজনৈতিক দলকে 'স্বার্থ একত্রীকরণ' বলা হয়ে থাকে।

৭। **সংসদীয় সরকারের উপযোগী :** সংসদীয় সরকার মূলত দলীয় সরকার। দলীয় শৃঙ্খলাই সংসদীয় সরকারকে আইন প্রণয়ন ও শাসন পরিচালনায় দৃঢ় ভূমিকা পালনে সাহায্য করে।

৮। **নেতৃত্বের বিকাশ :** রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে দলীয় কর্মীবৃন্দ সংগঠিত হয় এবং নানামুখী কার্যক্রমে নেতৃত্বদানের সুযোগ লাভ করে। ফলে নতুন নেতৃত্বের বিকাশ ঘটে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দল নতুন নেতৃত্ব বিকাশের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে কাজ করে।

মূলত রাজনৈতিক দলের তৎপরতায় গণতন্ত্র প্রকৃত অর্থে জনগণের শাসনে পরিণত হয়। লর্ড ব্রাইস তাই যথার্থই বলেন, "গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলের ভূমিকা জটিল ও সুদূর প্রসারী।"

সারসংক্ষেপ

বর্তমান প্রতিনিধিত্বমূলক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলের গুরুত্ব অপরিসীম। কেননা দলের মাধ্যমেই জনগণ শাসন কাজে অংশগ্রহণ করে। গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলই জনগণের ইচ্ছা ও অভিপ্রায় সরকারের নিকট তুলে ধরে। জনপ্রতিনিধিগণ দলের মাধ্যমেই কাজ করে। রাজনৈতিক দল জনমত গঠন, নীতি নির্ধারণ, রাজনৈতিক চেতনার ও নেতৃত্বের বিকাশ ঘটায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

(ক) নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। আধুনিক প্রতিনিধিত্বমূলক গণন্ত্রের মূল ভিত্তি হল-

(ক) গণমাধ্যম (খ) চাপসৃষ্টিকারী দল

(গ) রাজনৈতিক দল (ঘ) বহু দল

২। "গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলের ভূমিকা জটিল ও সুদূর প্রসারী" বলেছেন-

(ক) গার্নার (খ) এণ্ডমণ্ড বার্ক

(গ) লর্ড ব্রাইস (ঘ) অধ্যাপক ফাইনার

৩. "আধুনিক গণতান্ত্রিক শাসন কার্যত রাজনৈতিক দলের শাসন" বলেছেন-

(ক) গিলক্রাইস্ট (খ) অধ্যাপক গেটেল

(গ) ম্যাকাইভার (ঘ) অধ্যাপক ফাইনার

(খ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১। রাজনৈতিক দল কিভাবে জনমত গঠন করে?

২। জনগণ কিভাবে রাষ্ট্রীয় কাজে অংশগ্রহণ করে?

(গ) রচনামূলক প্রশ্ন

১। প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলের গুরুত্ব বর্ণনা করুন।

(ক) উত্তরমালা

১। গ, ২। গ, ৩। ঘ

ইউনিট
১৩

জনমত ও নির্বাচন

ভূমিকা

আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় জনমতের গুরুত্ব অপরিসীম। জনগণের ইচ্ছাতেই রাষ্ট্র পরিচালিত হয়। রাষ্ট্রের অন্যতম উপাদান হল জনসম্মতি। জনমতের উপর ভিত্তি করেই সরকার গঠন, শাসন পরিচালনা, ক্ষমতায় আরোহণ, অপসারণ এমনকি নতুন সরকারও গঠিত হয়ে থাকে। তাই জনমত সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য জনমতের সংজ্ঞা, বাহনসমূহ, গুরুত্ব, নির্বাচন ও এর প্রকারভেদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা সার্বজনীন ভোটাধিকার ও নির্বাচকমণ্ডলী সম্পর্কে জানা অত্যন্ত জরুরি ও প্রয়োজনীয়।

বর্তমান ইউনিটে নিম্নোক্ত পাঠগুলো আলোচনা করা হলো :

পাঠ-১ : জনমতের সংজ্ঞা ও বাহন।
পাঠ-২ : গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনমতের গুরুত্ব।
পাঠ-৩ : নির্বাচন ও এর প্রকারভেদ।
পাঠ-৪ : নির্বাচনে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা।
পাঠ-৫ : সার্বজনীন ভোটাধিকার ও নির্বাচকমণ্ডলী।

পাঠ-১ : জনমতের সংজ্ঞা ও বাহন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- জনমত কী তা বলতে পারবেন ।
- বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর প্রদত্ত জনমতের প্রামাণ্য সংজ্ঞা দিতে পারবেন ।
- জনমতের বাহনসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন ।

জনমতের সংজ্ঞা

সাধারণ অর্থে কোন সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের মতকে 'জনমত' বলা হয় । এ অর্থে যে কোন বিষয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের সমষ্টিকে জনমত বলা যেতে পারে । কিন্তু পৌরনীতিতে জনমতকে বিশেষ অর্থে আলোচনা করা হয় । সকল মতামতই জনমত নয় । কেবলমাত্র সমাজ, রাষ্ট্র, রাজনীতি, নাগরিক জীবন, সরকার পরিচালনা, অর্থনীতি ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে প্রভাবশালী, যুক্তিযুক্ত, সুস্পষ্ট, পরিচ্ছন্ন, সহজবোধ্য এবং কল্যাণকামী মতামতকে জনমত বলা হয় । 'জনমত' শব্দটি প্রথম ব্যবহৃত হয় ফরাসি দার্শনিক রুশোর লেখনীতে । গণতন্ত্রের বিকাশের সাথে জনমতের ধারণা ও বিকাশ লাভ করে ।

লর্ড ব্রাইস বলেন, "জনমত হল সম্প্রদায়ের স্বার্থ-সংশিষ্ট বিষয়ে জনগণের অভিমতের সমষ্টি ।"

জিনস্ বার্গ বলেন, "জনমত হল সমাজের বিভিন্ন মতের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ফল ।"

ই.এম. সেইট বলেন, "জনমত বলতে আমরা এই বুঝি যে, এটি হল জনসমষ্টির মত, জনগণেরই মত ।"

এল.ডবিউ. ডুব বলেন, "একই সামাজিক সংগঠনের সভ্য হিসেবে জনগণের মতামতই জনমত ।"

কিম্বল ইয়াং বলেন, "একটি নির্দিষ্ট সময়ে জনগণ যে মতামত পোষণ করে, তাই জনমত ।"

লোয়েল বলেন, "জনমত বলে অভিহিত হওয়ার জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ অভিমত হওয়াই যথেষ্ট নয়, আবার সকলের ঐকমত্যেরও প্রয়োজন নেই ।"

জন স্টুয়ার্ট মিল বলেন, "কোন সুনির্দিষ্ট জাতীয় সমস্যার উপর জনগণের সংগঠিত অভিমতের নাম জনমত ।"

অস্টিন রেনি বলেন, "জনমত হল সে সকল মতের সমষ্টি যার প্রতি সরকারি কর্মচারীবৃন্দ বা আমলারা খানিকটা সজাগ এবং সরকারি কার্যাবলি নির্ধারণের সময় তারা এর গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে ।"

উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলো বিশ্লেষণ করলে এটি স্পষ্ট যে, জনমত হচ্ছে কল্যাণকামী, বলিষ্ঠ, যুক্তিভিত্তিক, সুস্পষ্ট মতামত, যা সরকার ও জনগণকে প্রভাবিত করতে সক্ষম ।

জনমতের বাহন

আধুনিক গণতন্ত্র হল প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র । প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের প্রাণ হল জনমত । সুষ্ঠু ও সচেতন জনমতের ওপর প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের সাফল্য নির্ভর করে । জনমত গঠনের বাহনগুলো নিম্নরূপ–

১. **সংবাদপত্র :** সংবাদপত্র জনমত গঠনের অন্যতম বাহন । সংবাদপত্র পাঠের মাধ্যমে জনগণ স্থানীয়, দেশীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক যাবতীয় তথ্য ও সংবাদ জানতে পারে । সংবাদপত্রের মাধ্যমে জনগণ বিভিন্ন অভাব-অভিযোগ, দাবি-দাওয়া সম্পর্কে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকে । সংবাদপত্রের গঠনমূলক সমালোচনার ভয়ে সরকার সংযত থাকে । এজন্য বলা হয়ে থাকে যে, সংবাদ মাধ্যম যেভাবে বলে, জনমত সেভাবে গড়ে ওঠে । তবে মিথ্যা ও বিকৃত সংবাদ পরিবেশন সুষ্ঠু জনমত

গঠনে সহায়ক নয়। অধ্যাপক লাস্কি তাই বলেন, "রাজনৈতিক স্বাধীনতা সংরক্ষণের জন্য সৎ ও অবিকৃত সংবাদ পরিবেশন একান্ত প্রয়োজন।"

২. **পুস্তক-পুস্তিকা ও অন্যান্য প্রচারপত্র :** সংবাদপত্র ছাড়াও পুস্তক-পুস্তিকা, সাময়িকপত্র এবং প্রচারপত্র জনমত গঠনে অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠন ও পেশাজীবী সংগঠনগুলো পত্র-পত্রিকা প্রচারপত্র ও প্রাচীর পত্রের মাধ্যমে জনমত সংগঠনে সচেষ্ট থাকে। তবে শিক্ষিত ও বিত্তবানদের জনমত গঠনে পুস্তক-পুস্তিকার ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

৩. **চলচ্চিত্র এবং রেডিও টেলিভিশন :** চলচ্চিত্র ও রেডিও-টেলিভিশন জনমত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আজকের বিশ্বে চলচ্চিত্র, রেডিও-টেলিভিশন, ইন্টারনেট, ই-মেইলসহ ইনফরমেশন সুপারহাইওয়ে দেশ বিদেশের সর্বশেষ খবরাখবর, সংবাদ পরিক্রমা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতি, টকশো, বিতর্ক সভা, প্রশ্নোত্তর সেশন ইত্যাদির মাধ্যমে জনমত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে।

৪. **সভা সমিতি :** জনমত গঠনে সভা সমিতির গুরুত্ব অপরিসীম। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, পেশাজীবী সংগঠন, বিশেষজ্ঞ এবং বুদ্ধিজীবীগণ সভা-সমিতির মাধ্যমে নিজেদের বক্তব্য প্রকাশ ও প্রচার করে। এর ফলে জনগণ বিভিন্ন দল ও মতের তুলনামূলক আলোচনা ও বিশ্লেষণ করে সঠিক মতামত তৈরি করতে সমর্থ হয়।

৫. **শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ :** শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো জনমত গঠনের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। স্কুল, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে দেশের যুবসমাজ যে শিক্ষা ও আদর্শ লাভ করে পরবর্তীকালে তা তাদের চিন্তা ও মতামত প্রকাশে প্রভাব বিস্তার করে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র সমাজ বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করে। বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন শিক্ষাসংক্রান্ত সমস্যার পাশাপাশি রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ে সভা, শোভাযাত্রা, পোস্টার ও আলোচনার মাধ্যমে যে মতামত ব্যক্ত করে তা জনমত গঠনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

৬. **পরিবার :** ব্যক্তির, নাগরিকের রাজনৈতিক সামাজিকিকরণের সূতিকাগার হল পরিবার। শৃঙ্খলা, নিয়ম-নীতি, নির্দেশনা, আনুগত্য, মতপ্রকাশ, শিষ্ঠাচার, সহনশীলতা, সহমর্মিতা, সহযোগিতা, চিন্তা ও আদর্শ- এ সবই শিশুকাল থেকে শুরু করে সারাজীবন ধরে শেখে এবং অর্জন করে নিজ পরিবার থেকে। রাষ্ট্রে জনমত গঠনে পরিবার তাই প্রাথমিক ও স্থায়ী বাহন।

৭. **ধর্ম প্রতিষ্ঠান ও সেবা সংঘ :** মানুষের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ যেমন– মসজিদ, গির্জা, মন্দির এবং সেবাভিত্তিক সংঘ যেমন– ট্রেড ইউনিয়ন, সমিতি, চেম্বার জনমত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

৮. **রাজনৈতিক দল :** আধুনিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দল জনমত গঠনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাহন। ক্ষমতাসীন ও বিরোধী উভয় দলই জাতি গঠন সংক্রান্ত কর্মসূচি ও কর্মপন্থা জনগণের নিকট উপস্থাপন করে সমর্থন লাভের চেষ্টা করে। নেতৃবৃন্দ নিজদলের কর্মসূচিকে উত্তম এবং অন্য দলের সমালোচনা করে। জনগণ প্রত্যেক দলের বক্তব্য ও প্রচারাভিযানের মাধ্যমে জাতীয় বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছতে পারে এবং সঠিক সিদ্ধান্ত স্থির করতে পারে।

৯. **নির্বাচন :** জনমত গঠনের অন্যতম বাহন নির্বাচন। নির্বাচনকালীন সময়ে রাজনৈতিক দল, উপদল, দলীয় কর্মসূচি ও প্রার্থী নিয়ে প্রচারাভিযানে ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করে। হাটে-মাঠে, ট্রেনে-লঞ্চে, স্টিমার-জাহাজে পথসভা জনসভায় আলোচনা-সমালোচনার, তথ্য প্রদান, যাচাই-বাছাই ইত্যাদির এক ব্যাপক সাড়া জাগে। ফলে জনগণ সচেতন হয় এবং জনমত সংগঠিত হয়, ভাল-মন্দ বাছাই করে আলোচনা ও তর্ক-বিতর্কের মাধ্যমে সমৃদ্ধ হয় নাগরিক সমাজ। নির্বাচনের ফলাফল তাই জনমতেরই ফসল।

১০. **আইনসভা :** বর্তমান বিশ্বে জনমত গঠনের একটি প্রধান মাধ্যম হল আইনসভা। আইনসভায় প্রতিনিধিদের বক্তব্য, তথ্য উপস্থাপন, তর্ক-বিতর্ক ইত্যাদি সংবাদপত্র, পুস্তিকা, বুলেটিনে প্রকাশিত

হয়। এছাড়াও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমেও তা জনসম্মুখে চলে আসে। এ সব থেকে জনমত চিন্তা-ভাবনার সুযোগ পায় এবং জনমত নানাভাবে প্রভাবিত হয়।

সারসংক্ষেপ

জনমতই রাষ্ট্রের নিয়ামক। রাষ্ট্রের ভিত্তি হল জনসম্মতি। সরকার ক্ষমতায় থাকা, শাসন পরিচালনা, ক্ষমতা থেকে অপসারণ এবং নির্বাচনে জনমতই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। জনমতের বাহনসমূহের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য এবং এর ক্রিয়াশীলতার ধরনই এক্ষেত্রে সর্বাধিক বিবেচ্য বিষয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

(ক) নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। 'জনমত' শব্দটি কার লেখনীতে প্রথম ব্যবহৃত হয়?

(ক) লর্ড ব্রাইস (খ) জ্যাঁ জ্যাক রুশো

(গ) ই. এম গেইট (ঘ) কিম্বল ইয়াং

২। 'কোন সুনির্দিষ্ট জাতীয় সমস্যার ব্যাপারে জনগণের সংগঠিত অভিমতের নাম জনমত।' সংজ্ঞাটি কার?

(ক) অষ্টিন রিনে (খ) লাসওয়েল

(গ) জন স্টুয়ার্ট মিল (ঘ) লর্ড ব্রাইস

৩। জনমত গঠনের সুতিকাগার হল–

(ক) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (খ) আইনসভা

(গ) পরিবার (ঘ) নির্বাচন

(খ) রচনামূলক প্রশ্ন

১। জনমতের সংজ্ঞা দিন।

২। জনমতের বাহনসমূহ কিভাবে কাজ করে?

(ক) উত্তরমালা

১। (খ), ২। (গ), ৩। (গ)

পাঠ-২ : গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনমতের গুরুত্ব

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- গণতন্ত্রে জনমতের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনমতের গুরুত্ব

আধুনিক প্রতিনিধিত্বমূলক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা জনমতের উপর নির্ভরশীল। গণতন্ত্র ও জনমত প্রায় সমার্থক শব্দ। গণতন্ত্র হচ্ছে 'জনগণের জন্য, জনগণের দ্বারা জনগণের শাসন।' জনসম্মতির ভিত্তিতেই গণতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। তাই সরকারের উত্থান, পতন, সাফল্য বহুলাংশে জনমতের উপর নির্ভরশীল। জনগণের স্বাধীনতা, অধিকার ও স্বার্থের অতন্দ্র প্রহরী হয়ে কাজ করে জনমত। জনমতকে অগ্রাহ্য করে কোন শাসক দীর্ঘদিন ক্ষমতায় টিকে থাকতে পারে না। গণতন্ত্রে সদা জাগ্রত জনমত সরকারের স্বেচ্ছাচার রোধ করে গণতন্ত্রের স্বরূপ বজায় রাখে।

আধুনিক গণতন্ত্রে জনপ্রতিনিধি নির্বাচন ও সরকার গঠনের ক্ষেত্রে জনমত মুখ্য ভূমিকা পালন করে। সরকার জনকল্যাণ সাধনের জন্য যে কর্মসূচি প্রণয়ন ও কার্যকর করার পদক্ষেপ গ্রহণ করে তা মূলত জনমতের দিকে লক্ষ্য রেখেই করা হয়। জনমতের চাপে সরকার রক্ষণশীল মনোভাব পরিত্যাগ করে। সরকার যুগোপযোগী ও প্রগতিশীল কর্মসূচি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। জনমত যতক্ষণ পর্যন্ত কোন সরকারের অনুকূলে থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত সরকার দক্ষতা ও দ্রুততার সাথে যে কোন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে পারে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আইন প্রণয়নও পরিবর্তনে জনমতের প্রভাব অপরিসীম। সুতরাং জনমত হচ্ছে আধুনিক প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের ভিত্তি বা প্রাণ।

সারসংক্ষেপ

আধুনিক প্রতিনিধিত্বমূলক শাসন ব্যবস্থা জনমতের উপর নির্ভরশীল। গণতন্ত্র ও জনমত প্রায় সমার্থক শব্দ। জনসম্মতির ভিত্তিতেই গণতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। সদাজাগ্রত জনমত সরকারের স্বেচ্ছাচার রোধ করে এবং গণতন্ত্রের স্বরূপ বজায় রাখে। জনমত জনগণের স্বাধীনতা, অধিকার ও স্বার্থের অতন্দ্র প্রহরী হয়ে কাজ করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

(ক) নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। আধুনিক প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের ভিত্তি বা প্রাণ–
(ক) সরকার (খ) গণতন্ত্র
(গ) জনমত (ঘ) জনগণ

২। জনমত সরকারের স্বেচ্ছাচার রোধ করে বজায় রাখে-
(ক) গণতন্ত্রের স্বরূপ (খ) সরকারের সাফল্য
(গ) আইনের স্বরূপ (ঘ) শাসন ব্যবস্থার সাফল্য

৩। আধুনিক গণতন্ত্রের সরকারের সাফল্য, ব্যর্থতা ও উত্থান ইত্যাদি বহুলাংশে নির্ভরশীল-
(ক) রাজনীতির উপর (খ) জনমতের উপর
(গ) স্থায়ীত্বের উপর (ঘ) শাসন ব্যবস্থার উপর

(খ) রচনামূলক প্রশ্ন

১। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় জনমতের গুরুত্ব আলোচনা করুন।

(ক) উত্তরমালা

১। (গ), ২। (ক), ৩। (খ)

পাঠ-৩ : নির্বাচন ও এর প্রকারভেদ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- নির্বাচন কি এবং নির্বাচনের গুরুত্ব আলোচনা করতে পারবেন।
- নির্বাচনের প্রকারভেদ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- ভোটাধিকার ভিত্তির উপর নির্ভর করে যে নির্বাচনের ধরন পরিবর্তন আসে তা লিখতে পারবেন।

নির্বাচন ও নির্বাচনের গুরুত্ব

নির্বাচন হল জনগণ কর্তৃক প্রতিনিধি বাছাইয়ের সাংবিধানিক প্রক্রিয়া। আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সরকার গঠন, স্থানীয়, আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে শাসনকার্যে পরিচালনার জন্য প্রতিনিধি বাছাই, প্রতিনিধি নির্ধারণের সাংবিধানিক প্রক্রিয়াকে নির্বাচন বলা হয়। নির্বাচনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো হচ্ছে– প্রতিনিধিদের ধরন, নির্বাচনী এলাকা, নির্বাচন কমিশন, নির্বাচনী তফসিল, নির্বাচন প্রক্রিয়া, নির্বাচনী প্রচার ও অংশগ্রহণ, ভোট ও ভোটাধিকার, নির্বাচন কেন্দ্র, ব্যালট পেপার, নির্বাচনী ফলাফল, প্রতিনিধিত্ব সুনির্দিষ্টকরণ ইত্যাদি।

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সরকার গঠনের জন্য বিভিন্ন স্তরে প্রতিনিধি বাছাইয়ের উদ্দেশ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনের মাধ্যমে জনমত প্রকাশ পায় এবং সরকার জনসাধারণের প্রয়োজন অনুযায়ী শাসন সংক্রান্ত কর্মসূচি গ্রহণ করে। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জন এবং অবাঞ্ছিত রাজনৈতিক দলের বিলোপ ঘটাতে নির্বাচনের গুরুত্ব অপরিসীম। নির্বাচনের কর্মতৎপরতায় বিভিন্ন দলের মধ্যে সমঝোতার সৃষ্টি হয় এবং সচেতন রাজনীতির বিকাশ ঘটে। নির্বাচন, সরকার ও জনগণের মধ্যে সংযোগসাধনের সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে। সর্বোপরি নির্বাচনের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ ঘটে, রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি পায় এবং রাজনৈতিক কৃষ্টি অর্জিত হয়।

নির্বাচনের প্রকারভেদ

প্রতিনিধিত্বমূলক গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় দু'ধরনের নির্বাচন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়; যথা-

(ক) প্রত্যক্ষ নির্বাচন ও (খ) পরোক্ষ নির্বাচন।

(ক) প্রত্যক্ষ নির্বাচন : যেখানে নির্বাচকমণ্ডলী বা ভোটদাতাগণ সরাসরি ভোট দানের দ্বারা প্রতিনিধি নির্বাচন করে সেই নির্বাচনকে প্রত্যক্ষ নির্বাচন বলে। প্রত্যক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থায় সাধারণ ভোটার ও নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ভিতর আর কোন মধ্যবর্তী ভোটার বা 'ইলেকটোরাল কলেজ' থাকে না। বর্তমান যুগে রাষ্ট্রের আয়তন বিশাল এবং জনসংখ্যা অধিক হওয়ায় জনসাধারণ এখন আর প্রত্যক্ষভাবে শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করতে পারে না।

(খ) পরোক্ষ নির্বাচন : আধুনিক যুগে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনগণ পরোক্ষভাবে ভোট প্রদানের মাধ্যমে প্রতিনিধি নির্বাচন করে যে সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করে তাকে পরোক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থা বলে। পরোক্ষ নির্বাচন পদ্ধতিতে নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ জনগণের পক্ষে শাসনকার্য পরিচালনা করে। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের যোগ্যতা ও দক্ষতার উপর শাসনকার্যের সফলতা ও উৎকৃষ্টতা নির্ভর করে। পরোক্ষ নির্বাচনের ক্ষেত্রে মধ্যবর্তী প্রতিনিধি ভোটার থাকে; যেখানে সরাসরি মূল প্রতিনিধি নির্বাচন করতে পারে না। বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের সংসদ সদস্যগণ প্রত্যক্ষ নির্বাচন পদ্ধতিতে সরাসরি নির্বাচকমণ্ডলীর ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হন। কিন্তু জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত মহিলা আসনের সদস্যগণ এবং রাষ্ট্রপতি পরোক্ষ পদ্ধতিতে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে নির্বাচিত হন। বাংলাদেশের অন্যান্য স্থানীয় নির্বাচনে প্রত্যক্ষ নির্বাচন পদ্ধতি প্রচলিত আছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট পরোক্ষ নির্বাচনে মধ্যবর্তী ইলেকটোরাল কলেজের দ্বারা নির্বাচিত হন।

ভোটাধিকারের ভিত্তির উপর নির্ভর করে নির্বাচনের ধরনের পরিবর্তন

ভোটাধিকারের ভিত্তির বিভিন্নতার উপর নির্বাচনের ধরন অনেক ক্ষেত্রে নির্ভরশীল। নির্বাচন, সর্বজনীন প্রাপ্ত বয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে হতে পারে আবার সীমিত ভোটাধিকারের ভিত্তিতেও হতে পারে। নারীর ভোটাধিকার, সম্পত্তির ভিত্তিতে ভোটাধিকার ইত্যাদিও দীর্ঘকাল ধরে বিভিন্ন দেশের নির্বাচনকে প্রভাবিত করেছে, বর্তমানেও তা কোথাও কোথাও বহাল রয়েছে। যেমন- বেলজিয়াম এবং মধ্যপ্রাচ্যের কোন কোন দেশে এখনও নারীর ভোটাধিকারও কোন পদে নির্বাচিত হবার সুযোগ নেই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯২০ সালে, সুইজারল্যাণ্ড ১৯৭০ সালে বহু আন্দোলন সংগ্রামের পর নারীর ভোটাধিকার স্বীকার করে নেয়।

ভোটদান পদ্ধতির উপরও নির্বাচনের প্রকৃতি নির্ভরশীল। ভোট প্রকাশ্য হতে পারে আবার গোপন ব্যালটেও হতে পারে। প্রতিনিধিত্বের পদ্ধতির বিভিন্নতার উপরও নির্বাচনের বৈশিষ্ট্য নির্ভর করে। এক ভোট ও এক সদস্য এলাকা ভিত্তিতে ভোটদান পদ্ধতি, সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রতিনিধিত্ব, সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্ব (পৃথক নির্বাচন), আঞ্চলিক প্রতিনিধিত্ব, সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব, পেশাগত প্রতিনিধিত্ব ইত্যাদি বিভিন্নতা নির্বাচনের প্রকৃতির উপর প্রভাব বিস্তার করে।

সারসংক্ষেপ

আধুনিক প্রতিনিধিত্বমূলক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নির্বাচন অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। রাষ্ট্র ব্যবস্থার সর্ব পর্যায়ের প্রতিনিধিত্ব, সরকার গঠন এবং জনমত নির্ধারণের সর্বস্বীকৃত উপায় হচ্ছে নির্বাচন। নির্বাচন হচ্ছে প্রতিনিধি বাছাইয়ের একটি সাংবিধানিক প্রক্রিয়া। বিভিন্নভাবে নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পদ্ধতি রয়েছে। নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্বের ধরন, নির্বাচনী এলাকা, নির্বাচন কমিশন, নির্বাচনী তফশিল, প্রচার ও অংশগ্রহণ, ভোটাধিকার কেন্দ্র, ব্যালট পেপার, ফলাফল গণনা ও ঘোষণা, প্রতিনিধিত্ব সুনির্দিষ্ট করা এবং ফলাফল মেনে নেয়ার মত সহনশীলতার সংস্কৃতি ইত্যাদি বিবেচনার বিষয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

(ক) নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। নির্বাচন হচ্ছে প্রতিনিধি বাছাইয়ের–
   (ক) সরকারি প্রক্রিয়া (খ) সাংবিধানিক প্রক্রিয়া
   (গ) দলীয় প্রক্রিয়া (ঘ) স্বেচ্ছাধীন প্রক্রিয়া

২। নির্বাচনের দুটি পদ্ধতি হচ্ছে-
   (ক) খোলা ও গোপন পদ্ধতি (খ) সরকারি ও বেসরকারি পদ্ধতি
   (গ) প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ পদ্ধতি (ঘ) জাতীয় ও আঞ্চলিক পদ্ধতি

৩। আধুনিক বিশ্বে বহুল প্রচলিত নির্বাচনের ধরন হচ্ছে-
   (ক) পেশাভিত্তিক ভোটাধিকার (খ) সর্বজনীন ভোটাধিকার
   (গ) সমানুপাতিক ভোটাধিকার (ঘ) পরোক্ষ ভোটাধিকার

(খ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১। নির্বাচন বলতে কি বোঝেন?

২। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নির্বাচন কাকে বলে?

(গ) রচনামূলক প্রশ্ন

১। নির্বাচনের সংজ্ঞা দিন। এর প্রকারভেদ আলোচনা করুন।

২। ভোটাধিকারের বিভিন্ন ভিত্তি আলোচনা করুন।

(ক) উত্তরমালা

১। (খ), ২। (গ), ৩। (খ)

পাঠ-৪ : নির্বাচনে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- নির্বাচনের সঙ্গে রাজনৈতিক দলের সম্পর্ক বর্ণনা করতে পারবেন।
- নির্বাচনে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা আলোচনা করতে পারবেন।

নির্বাচনে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা

আধুনিক বিশ্বে নির্বাচন প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক দলের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। কেননা বর্তমানকালে নির্বাচনের অর্থই হল রাজনৈতিক দলের নির্বাচন। অর্থাৎ সকল স্তরের নির্বাচন দলীয় ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনের প্রস্তুতি, প্রার্থী মনোনয়ন, নির্বাচনী কর্মসূচি প্রণয়ন, নির্বাচনী প্রচার ও ভোট সংগ্রহ সবই রাজনৈতিক দলের ও দলীয় কর্মীদের দ্বারা সম্পাদিত হয়ে থাকে। মূলত রাজনৈতিক দল ছাড়া প্রতিনিধিত্বশীল সরকার চলতে পারে না। প্রতিনিধিত্বশীল সরকার গঠিত হয় নির্বাচনের প্রক্রিয়ায় জনগণের ভোটের মাধ্যমে। আর নির্বাচন ও সরকার গঠনের মধ্যে সত্যিকার সেতুবন্ধন করে রাজনৈতিক দল। নির্বাচনে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা নিম্নরূপ-

ক. **নির্বাচন প্রস্তুতি :** রাজনৈতিক দল সাধারণ নির্বাচনে যাবার জন্য নির্বাচনী তফসিল ঘোষণার ব্যবস্থাগ্রহণ করে। নির্বাচন যাতে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হয় সেজন্য নির্বাচনী নীতিমালা ঘোষণা করে। এ ব্যাপারে রাজনৈতিক দল সজাগ ও সতর্ক দৃষ্টি রাখে।

রাজনৈতিক দল নির্বাচনে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে জনগণের সম্মুখে দলীয় আদর্শ, নীতিমালা, কর্মসূচি ও কর্মপন্থার সমন্বয়ে একটি নির্বাচনী মেনিফেস্টো বা ইশতেহার উপস্থাপন করে। দলীয় ইশতেহার বহুল প্রচারের মাধ্যমে জনমতকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে।

খ. **প্রার্থী মনোনয়ন :** নির্বাচনের জয়-পরাজয়কে সামনে রেখে রাজনৈতিক দল উপযুক্ত ও যোগ্য প্রার্থী বাছাই করে মনোনয়ন দান করে।

গ. **কর্মসূচি প্রণয়ন ও নির্বাচনী প্রচার :** রাজনৈতিক দলসমূহ তাদের নিজ নিজ দলের কর্মসূচি তৈরি করে নির্বাচক মণ্ডলীর নিকট উপস্থাপন করে, দেশের প্রধান প্রধান সমস্যাকে কেন্দ্র করে নির্বাচনী কর্মসূচি তৈরি করা হয়। রাজনৈতিক দলের কর্মীগণ সভা, শোভাযাত্রা, পোস্টার, লিফলেট এবং অন্যান্য গণমাধ্যমে তাদের কর্মসূচি প্রচার করে।

ঘ. **ভোট সংগ্রহ :** রাজনৈতিক দলের মূল লক্ষ্য নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় ক্ষমতা দখল করা। সে লক্ষে দল তার প্রার্থীকে বিজয়ী করার জন্য ভোট সংগ্রহের ব্যবস্থাগ্রহণ করে। ব্যাপক প্রচার এবং সভা-সমাবেশের মাধ্যমে প্রার্থীদের পক্ষে ভোট সংগ্রহের জন্য অভিযান চালানো হয়। এভাবে রাজনৈতিক দল নির্বাচনে অনবদ্য ভূমিকা পালন করে।

লাসওয়েল তাই বলেন, "রাজনৈতিক দল নির্বাচনে ধারণারাজির প্রবর্তক হিসেবে কাজ করে।" নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক দল জনশিক্ষার এক শ্রেষ্ঠ সংস্থা। রাজনৈতিক দল জনগণের বিভিন্ন অংশের মধ্যে সেতুবন্ধন রচনা করে এবং বিভিন্ন স্বার্থের সংরক্ষণ করে। জাতীয় সংহতি এবং একাত্মতা গঠনে সাহায্য করে।

সারসংক্ষেপ

আধুনিক প্রতিনিধিত্বমূলক শাসনব্যবস্থার সরকার গঠিত হয় নির্বাচন প্রক্রিয়ায় জনগণের ভোটের মাধ্যমে। নির্বাচন ও রাজনৈতিক দল ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই রাজনৈতিক দল নির্বাচন ও সরকার গঠনের মধ্যে সেতুবন্ধন রচনা করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

(ক) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১। নির্বাচন ও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সম্পর্ক লিখুন।

(খ) রচনামূলক প্রশ্ন

২। নির্বাচনে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা আলোচনা করুন।

পাঠ-৫ : সার্বজনীন ভোটাধিকার ও নির্বাচকমণ্ডলী

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- প্রতিনিধিত্বশীল সরকার গঠনে নির্বাচনের গুরুত্ব বলতে পারবেন।
- নির্বাচক মণ্ডলী কীভাবে সরকারের চতুর্থ অঙ্গে রূপ পেয়েছে তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

সার্বজনীন ভোটাধিকার ও নির্বাচকমণ্ডলী

ভোটাধিকার মানুষের রাজনৈতিক অধিকার। সর্বজনীন ভোটাধিকারের অর্থ প্রাপ্তবয়স্ক সকলের ভোট দেয়া ও ভোট পাওয়ার অধিকার। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নারী-পুরুষ, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে, প্রাপ্ত বয়স্ক সকল নাগরিককে যখন ভোটাধিকার প্রদান করা হয় তখন তাকে সার্বজনীন ভোটাধিকার বলে। বর্তমানে প্রায় সকল রাষ্ট্রেই সার্বজনীন ভোটাধিকারকে নির্বাচনের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

রাষ্ট্রকর্তৃক যে সমস্ত নাগরিকদেরকে নির্বাচনে ভোট দেয়ার ক্ষমতা প্রদান করা হয় তাদেরকে ভোটার বা নির্বাচক বলে। সরকার গঠনের জন্য রাষ্ট্রের সাংবিধানিক আইন মোতাবেক যারা প্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষমতা লাভ করে তাদেরকে সমষ্টিগতভাবে নির্বাচকমণ্ডলী বলা হয়। বর্তমান প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের মূল ভিত্তিই হচ্ছে নির্বাচন ও নির্বাচকমণ্ডলী।

প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার ব্যবস্থার শর্ত হচ্ছে নির্বাচন। আর নির্বাচনের সাফল্যের মূলে নির্বাচকমণ্ডলী। রাষ্ট্রে জনগণের ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে সাধারণ নির্বাচনে নির্বাচক তৈরি, ভোটদান ও রায় প্রদানের মাধ্যমে। এজন্য নির্বাচকমণ্ডলীর আস্থা-অনাস্থার উপর প্রতিনিধিত্বশীল সরকারের টিকে থাকা না থাকা সর্বাংশে নির্ভরশীল। জনগণের ক্ষমতার প্রয়োগ নির্বাচকমণ্ডলীর ভোটদানের ভিতর দিয়েই হয়ে থাকে। অবশ্য সমর্থন প্রত্যাহার, গণভোট, গণউদ্যোগের মাধ্যমে নির্বাচকমণ্ডলী নীতি-নির্ধারণ, আইন-প্রণয়ন, সংবিধান সংশোধন এবং প্রতিনিধি ও সরকারকে নিয়ন্ত্রণের কাজ করতে পারে।

নির্বাচকমণ্ডলী ভোটাধিকার প্রয়োগ করে সৎ ও যোগ্য প্রতিনিধি নির্বাচন করে থাকে। এদের দ্বারা নির্বাচিত যোগ্য ব্যক্তিবর্গের দ্বারা সরকার গঠন ও সরকার পরিচালিত হয়। নির্বাচকমণ্ডলী আইন ও সংবিধান প্রণয়ন ও সংশোধন করে থাকে।" নির্বাচকমণ্ডলী সুষ্ঠু জনমত গঠনে সাহায্য করে, এতে সরকারি নীতিমালা প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি যেমন– গণভোট, গণউদ্যোগ, পদচ্যুতির মাধ্যমে নির্বাচকমণ্ডলী সরকারের নীতি নির্ধারণে অংশগ্রহণ করে থাকে।

এছাড়া সংবাদপত্র ব্যবহার করে, বেতার-টিভিকে কাজে লাগিয়ে, জনসভা-শোভাযাত্রা করে, বিতর্ক গড়ে তোলে, স্বাক্ষরতা অভিযান চালিয়ে, বিক্ষোভ প্রদর্শন করে, আইন বহির্ভূত নিয়ন্ত্রণও সরকারের উপর আরোপ করতে পারে নির্বাচকমণ্ডলী। নির্বাচকমণ্ডলীর গুরুত্ব আলোচনা করতে গিয়ে অধ্যাপক গেটেল তাই যথার্থই বলেন, "নির্বাচকমণ্ডলী হল সরকারের একটি স্বতন্ত্র ও শক্তিশালী বিভাগ।" এজন্যেই নির্বাচকমণ্ডলী আধুনিক বিশ্বে সরকারের চতুর্থ অঙ্গে পরিণত হয়েছে।

সারসংক্ষেপ

রাষ্ট্র শাসনের মূল ভিত্তি হল নির্বাচন ও সার্বজনীন ভোটাধিকার। নির্বাচকমণ্ডলীই প্রতিনিধিত্ব বাছাইকরণ এবং সরকার গঠনে নিয়ামক ভূমিকা পালনকারী। সচেতনভাবে ব্যালটের প্রয়োগ ও গণরায় জানিয়ে দিয়ে নির্বাচকমণ্ডলী দেশে দেশে সরকারের চতুর্থ অঙ্গে পরিণত হয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

(ক) নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। জনগণের ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে

(ক) বিপ্লবের মাধ্যমে (খ) নির্বাচনের মাধ্যমে

(গ) জনমতের মাধ্যমে (ঘ) সংগ্রামের মাধ্যমে

২। প্রত্যাহার, গণভোট, গণউদ্যোগের কাজ কি?

(ক) প্রতিনিধি ও সরকার নিয়ন্ত্রণ করা (খ) প্রতিবাদ জানানো

(গ) বিদ্রোহ ঘোষণা (ঘ) সম্মিলিত রায় ঘোষণা

(খ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১। নির্বাচকমণ্ডলী কাকে বলে?

২। সার্বজনীন ভোটাধিকার কী?

(গ) রচনামূলক প্রশ্ন

১। সার্বজনীন ভোটাধিকারের প্রেক্ষাপটে নির্বাচকমণ্ডলীর গুরুত্ব ও ভূমিকার বর্ণনা দিন।

(ক) উত্তরমালা

১। (গ), ২। (ক)

ইউনিট
১৪

ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব ও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা

ভূমিকা

১৯৪০ সালের ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলিম জনগোষ্ঠীর স্বাধীনতা, আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার এবং সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠায় সাম্প্রদায়িক চিন্তাপ্রসূত একটি উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক প্রস্তাব। লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলেও দীর্ঘ ২৪ বছর পর শোষণ ও বঞ্চনার কাঠামো ছিন্ন করে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। বর্তমান ইউনিটে নিম্নোক্ত পাঠগুলো আলোচনা করা হলো :

পাঠ-১ : লাহোর প্রস্তাবের পটভূমি ও বিষয়বস্তু।
পাঠ-২ : ১৯৪৭ সালের ভারতীয় স্বাধীনতা আইন ও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা।

পাঠ-১ : লাহোর প্রস্তাবের পটভূমি ও প্রস্তাবনা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- লাহোর প্রস্তাবের পটভূমি ও প্রস্তাবনা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

লাহোর প্রস্তাবের পটভূমি

হাজার বছরের ঐতিহাসিক ঘটনাক্রম পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, এ জনপদ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক অঞ্চলে বিভক্ত ছিল। এ জনপদ বিদেশী বিভিন্ন শাসক যেমন– পাল বংশ, সেন বংশ, তুর্কি বংশোদ্ভূত সুলতান, মোঘল ও ইংরেজ দ্বারা বিভিন্ন সময়ে শাসিত হয়েছে।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনকালে ভারতবর্ষে শিক্ষা প্রসারের পাশাপাশি পাশ্চাত্যের আধুনিক রাষ্ট্রীয় চিন্তা ও দর্শনের প্রসার ঘটেছে। এর প্রভাবে জনগণের মধ্যে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও জাতীয়তাবোধের সঞ্চার ঘটে। জনগণের স্বকীয় চিন্তা ও স্বাতন্ত্র্য বোধ জাতীয়তাবোধকে আরো গভীর করে তোলে। তবে দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য এই যে, শুরু থেকেই জাতীয়তাবোধের এ চেতনা সাম্প্রদায়িক চিন্তাচেতনা দ্বারা কলুষিত হয় যার পরিণতিতে ১৯৪০ সালে মুসলিম লীগ লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন করে।

এ প্রস্তাবের মাধ্যমে মুসলিম লীগ ভারতবর্ষে মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্র সৃষ্টির দাবি করে। ভারতের রাজনীতিতে মুসলমান সম্প্রদায়ের এই অবস্থান একদিনে সৃষ্টি হয়নি। এটি ছিল ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের ফল। ব্রিটিশ শাসনাধীনে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের অসম বিকাশ, চাকরিতে হিন্দু-মুসলমান প্রতিদ্বন্দ্বিতা, হিন্দু ও মুসলমান পুনর্জাগরণ, ইসলামি সংস্কার আন্দোলন, ব্রিটিশের 'ভাগ কর ও শাসন কর' নীতি ইত্যাদি উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িক চিন্তা চেতনাকে জাগিয়ে তোলে। উত্তর ভারতে স্যার সৈয়দ আহমদ খান (১৮১৭-১৮৯৮)-এর আলীগড় আন্দোলন, নবাব আব্দুল লতিফ (১৮২৮-১৮৯৩) ও সৈয়দ আমির আলী (১৮৮৯-১৮২৮)-এর মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবাদী ধ্যানধারণা, ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ ও বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন, ১৯০৬ সালে লিখিত ভারত মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা, ১৯০৯ সাল থেকে মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা, কংগ্রেসের (১৮৮৫) একটি অংশের রক্ষণশীল ও নেতিবাচক মনোভাব এবং কংগ্রেসের প্রতি অধিকাংশ মুসলমানের সন্দেহ ও অবিশ্বাস মুসলমানদের রাজনীতিতে স্বাতন্ত্র্যবাদী ধারাকে এগিয়ে নেয়। এতে সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি এই স্বাতন্ত্র্যবাদী ধারাকে আরও প্রবল করে। ১৯১৬ সালের লক্ষ্ণৌ চুক্তিভিত্তিক হিন্দু-মুসলিম সমঝোতা খুব একটা কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারেনি। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন বহাল থাকা পর্যন্ত তা সম্ভবও ছিল না। খিলাফত-অসহযোগ আন্দোলন (১৯২০-২২), ১৯২৮ সালে 'নেহেরু রিপোর্ট' এবং ১৯২৯ সালে জিন্নাহর 'চৌদ্দ দফা' ছিল হিন্দু-মুসলমান দ্বন্দ্ব নিরসনের নিষ্ফল প্রচেষ্টা। এমনি পটভূমিতে আসে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন।

ভারতের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দাবির পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৩৫ সালে ভারত শাসন আইন প্রণয়ন করা হলেও তা ভারতের হিন্দু ও মুসলমানদের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে ব্যর্থ হয়। ফলে উভয় সম্প্রদায় উক্ত আইনটিকে প্রত্যাখ্যান করে। কিন্তু তবুও উক্ত আইনের ধারা বলে ১৯৩৭ সালে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত নির্বাচনে মুসলিম লীগ উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করতে ব্যর্থ হয়। অন্যদিকে নির্বাচনে জয়লাভ করে ভারতীয় কংগ্রেস এককভাবেই ভারতের ১১টি প্রদেশের মধ্যে ৭টিতে মন্ত্রিসভা গঠন করে। হিন্দুপ্রধান কংগ্রেসশাসিত প্রদেশে মুসলমানদের মধ্যে দ্রুত বিচ্ছিন্নতাবোধ জন্ম নিতে থাকে। মুসলমানরা এই সমস্ত প্রদেশে তাদের প্রতি নির্যাতন ও বৈষম্যমূলক আচরণের অভিযোগ আনে। এ পটভূমিতে ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ লাহোরে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক যে প্রস্তাব উত্থাপন করেন তা ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং তা গৃহীত হয়।

লাহোর প্রস্তাব না

১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ লাহোরে নিখিল ভারত মুসলিম-লীগের বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে শাসনতান্ত্রিক ও সাম্প্রদায়িক সংকট মোকাবিলা এবং ভারতের মুসলমানদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের উদ্দেশ্যে শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক যে প্রস্তাব উত্থাপন করেন তা-ই ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব নামে খ্যাত।

লাহোর প্রস্তাবে বলা হয় যে, 'নিখিল ভারত মুসলিম লীগের এ অধিবেশনে তারা এমন ধারণা অভিব্যক্ত করেন যে, ভারতে কোন শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনা কার্যকর করা যাবে না, বা মুসলমানদের নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না, যদি না তা নিম্নলিখিত মূলনীতির ওপর গঠন করা হয়। যথা–

ক. ভৌগোলিক অবস্থান অনুযায়ী সংলগ্ন স্থানসমূহকে অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত করতে হবে।

খ. এসব অঞ্চল এমনভাবে গঠন করতে হবে যাতে ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের জন্য স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ গঠন করা যায়।

গ. এসব স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের 'ইউনিট' বা অঙ্গরাজ্যগুলো হবে 'স্বায়ত্তশাসিত ও সার্বভৌম'।

প্রস্তাবে আরও বলা হয় যে, "সকল অঞ্চলের সংখ্যালঘুদের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অন্যান্য অধিকার ও স্বার্থ রক্ষার জন্য তাদের সঙ্গে পরামর্শক্রমে শাসনতন্ত্রে পর্যাপ্ত কার্যকরী ও বাধ্যতামূলক বিধান রাখতে হবে।"

লাহোর প্রস্তাবের মূল কথাই ছিল মুসলিম স্বাতন্ত্র্য, তাদের আলাদা রাষ্ট্রসমূহ গঠন।

তবে মূল লাহোর প্রস্তাব সংশোধন করে 'একাধিক স্বাধীন রাষ্ট্রের' দাবির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা হয়। ১৯৪৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জিন্নাহ্ সর্বপ্রথম ঘোষণা করেন যে, মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলো নিয়ে 'একটি মুসলিম রাষ্ট্র' গঠিত হবে। ১৯৪৬ সালে দিল্লিতে আইন সভার মুসলিম লীগ সদস্যদের এক বিশেষ কনভেনশনে, 'একাধিক স্বাধীনতা রাষ্ট্রসমূহ কথাটি সংশোধন করে 'একটি স্বাধীন স্বার্বভৌম রাষ্ট্র' গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। কিন্তু বাংলার মুসলিম লীগ নেতা আবুল হাশিম এর সমালোচনা করেন এবং বলেন, "অন্য একটি রাষ্ট্রের প্রায় এক হাজার মাইল ভূ-ভাগ দ্বারা বিচ্ছিন্ন দুটি অঞ্চল নিয়ে কখনও একটি রাষ্ট্র গঠিত হতে পারে না"। মি: জিন্নাহ্ বলেন, টাইপের ভুলে লাহোর প্রস্তাবে 'State' শব্দটির সাথে 's' অক্ষরটি যুক্ত হয়েছিল। তবে লাহোর প্রস্তাব পরীক্ষা করে দেখা যায়, বার বার States শব্দটি ব্যবহৃত হয়। এভাবেই পূর্ব পরিকল্পিত ও ষড়যন্ত্রমূলকভাবে লাহোর প্রস্তাব সংশোধনপূর্বক এককেন্দ্রিক পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠন করা হয়।

সারসংক্ষেপ

লাহোর প্রস্তাবের মূল বক্তব্য ছিল উপমহাদেশে একাধিক স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র গঠন। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রটি সৃষ্টির মাধ্যমে এর খণ্ডিত বাস্তবায়ন ঘটে। ১৯৭১-র স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে লাহোর প্রস্তাবের মূল সাম্প্রাদায়িক চেতনা প্রত্যাখ্যান করে পূর্ববাংলার জনগণ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বাস্তবায়ন করেন। যার প্রতিফলন ১৯৭২-এর বাংলাদেশ সংবিধান ঘটে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

(ক) নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব কখন গৃহীত হয়-

(ক) ১৯৪১ সালের মে মাসে (খ) ১৯২৪ সালের মার্চ মাসে

(গ) ১৯৪০ সালের মার্চ মাসে (ঘ) ১৯১৬ সালের জুন মাসে

২. মুসলিম লীগের সম্মেলনে লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন করেন?

(ক) শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক (খ) মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ্

(গ) আব্দুল হাশিম (ঘ) হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী

(খ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. লাহোর প্রস্তাব কি?

(গ) রচনামূলক প্রশ্ন

১. লাহোর প্রস্তাবের পটভূমি সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

২. লাহোর প্রস্তাবের মূল প্রস্তাবনা ব্যাখ্যা করুন।

(ক) উত্তরমালা

১। (গ), ২। (ক)

পাঠ-২ : ১৯৪৭ সালের ভারতীয় স্বাধীনতা আইন ও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- ১৯৪৭ সালের ভারতীয় স্বাধীনতা আইনের বৈশিষ্ট্য লিখতে পারবেন

১৯৪৭ সালের ভারতীয় স্বাধীনতা আইন

ভারতের রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক সংকট দূর করার লক্ষে ১৯৪৭ সালের ৩ জুন ব্রিটিশ সরকার ভারত বিভাগ পরিকল্পনা গ্রহণ করে। উক্ত পরিকল্পনা মোতাবেক ১৯৪৭ সালের ১৮ জুলাই ব্রিটিশ পার্লামেন্ট কর্তৃক ভারত স্বাধীনতা আইন পাস করা হয়। ভারত স্বাধীনতা আইনের বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নে উলেখ করা হলো–

(১) এ আইন অনুযায়ী ভারতকে বিভক্ত করে ভারতীয় ইউনিয়ন ও পাকিস্তান নামে দুটি রাষ্ট্র (ডোমিনিয়ন) সৃষ্টি করা হয়।

(২) এ আইনের ফলে ভারতবর্ষের উপর থেকে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটে এবং ভারত সম্রাট উপাধি লোপ পায়।

(৩) ভারত ও পাকিস্তানের গণপরিষদ নিজ নিজ দেশের জন্য সংবিধান রচনা করার ক্ষমতা লাভ করে।

(৪) রাষ্ট্র দুটি ব্রিটিশ কমনওয়েলথভুক্ত থাকবে কি না নিজ নিজ দেশের গণপরিষদ তা নির্ধারণ করবে।

(৫) এ আইন অনুযায়ী দেশিয় রাজ্যগুলোর ওপর হতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটে। তারা ইচ্ছা করলে স্বাধীন থাকতে পারবে অথবা পাকিস্তান বা ভারতের সঙ্গে যোগ দিতে পারবে।

(৬) এই আইনে উল্লেখ করা হয় যে, নতুন সংবিধান রচিত ও প্রবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত উভয় রাষ্ট্রকে নিম্নোক্ত বিধানগুলো মেনে চলতে হবে।

  (ক) নিজ নিজ রাষ্ট্রের (ডোমিনিয়নের) মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শক্রমে ব্রিটিশরাজ গভর্নর জেনারেল নিয়োগ করবেন।

  (খ) মন্ত্রিসভার পরামর্শক্রমে গভর্নর জেনারেল প্রাদেশিক গভর্নর নিয়োগ করবেন।

  (গ) এ আইন অনুযায়ী গভর্নর জেনারেল ও গভর্নরের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা, বিচারবুদ্ধিজনিত ক্ষমতা এবং বিশেষ দায়িত্বের অবসান ঘটবে।

  (ঘ) ব্রিটিশ পার্লামেন্টের আইনের সঙ্গে সংগতি নেই এই অজুহাতে রাষ্ট্র দুটির কোনো আইন নাকচ করা যাবে না।

১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইন উপমহাদেশের এক ঐতিহাসিক ঘটনা। এ আইন ব্রিটিশ ভারতে রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক সংকটের অবসান ঘটায়।

সারসংক্ষেপ

১৯৪৭ সালের ভারতীয় স্বাধীনতা আইনের কাঠামো ও নীতিমালার ভিত্তিতেই ভারত ও পাকিস্তান স্বাধীন হয়। পরবর্তী পাকিস্তান এই আইনের মধ্যদিয়েই জন্ম লাভ করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

(ক) নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

(ক) শুদ্ধ উত্তরটি লিখুন

১। ভারতীয় উপমহাদেশে বৃটিশ শাসনের অবসান ঘটে

(ক) ১৯৪৭ সালে (খ) ১৯৪৫ সালে

(গ) ১৯৪২ সালে (ঘ) ১৯৪৬ সালে

(খ) রচনামূলক প্রশ্ন

১। ১৯৪৭ সালের ভারতীয় স্বাধীনতা আইনের বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা করুন।

(ক) উত্তরমালা

১। (ক)।

ইউনিট
১৫

পাকিস্তানি শাসন, শোষণ এবং পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধিকার আন্দোলন

ভূমিকা

১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট এক হাজার মাইলের অধিক ব্যবধান এবং বিচ্ছিন্নতাসহ পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তান নিয়ে গঠিত হয়েছিল পাকিস্তান নামক রাষ্ট্র। পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির শুরু থেকেই পূর্ব বাংলা প্রদেশকে পাকিস্তানের একটি উপনিবেশে পরিণত করার প্রচেষ্টা চালায়। পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী অত্যন্ত সুকৌশলে পূর্ববাংলার প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন শুরু করে। যার ফলে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে সৃষ্টি হয় ব্যাপক বৈষম্যের পাহাড়। পাকিস্তানি অপশাসন ও শোষণের ফলে পূর্ব বাংলার সম্পদ পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হতে থাকে। পাকিস্তানের দুই অংশের উন্নয়ন ও বাস্তব পরিস্থিতিতে ভারসাম্যহীনতা তৈরি হয়। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর অপশাসন ও শোষণের অভিঘাতে পূর্ববাংলা প্রথমে স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধিকারের দাবি তোলে। অতঃপর ১৯৭০ এর সাধারণ নির্বাচন, ফলাফল বানচাল এবং পরবর্তী অসহযোগ আন্দোলনের পথ ধরে সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমান ইউনিটে নিম্নোক্ত পাঠগুলো আলোচনা করা হলো –

পাঠ-১	:	পাকিস্তানি অপশাসন ও শোষণের বিভিন্ন পর্যায় ও প্রক্রিয়া।
পাঠ-২	:	ভাষা আন্দোলন ও এর তাৎপর্য।
পাঠ-৩	:	১৯৫৪ সালের নির্বাচন, যুক্তফ্রন্ট গঠন ও এর তাৎপর্য।
পাঠ-৪	:	বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৬ দফা, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ও ১৯৬৯ এর গণ-অভ্যুত্থান।
পাঠ-৫	:	মার্চের অসহযোগ আন্দোলন এবং একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধ।

পাঠ-১ : পাকিস্তানি অপশাসন ও শোষণের বিভিন্ন পর্যায় ও প্রক্রিয়া

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- পাকিস্তানি শাসনের বিভিন্ন পর্যায় সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- পূর্ব পাকিস্তানের উপর বৈষম্যের চিত্র বর্ণনা করতে পারবেন।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মুসলমানদের আত্মনিয়ন্ত্রাধিকার এবং সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র সংরক্ষণের জন্য। কিন্তু একদিকে প্রশাসনে স্বেচ্ছাচারী শাসন আর অন্যদিকে পূর্ববাংলার উপর শোষণ, বঞ্চনা আর স্বৈরাচারী শাসন ও শোষণ প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্রের মধ্যে পূর্ব বাংলা পরিণত হয় পশ্চিম পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ উপনিবেশে। এছাড়া সামরিক শাসনের ছত্রচ্ছায়ায় পূর্ববাংলাকে নির্দয়ভাবে অবদমন করা হয়। পাকিস্তানি উপনিবেশিক শাসন ও শোষণের ফলে পূর্ববাংলার সম্পদ পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হয়ে যায়। শাসকগোষ্ঠীর বিমাতাসুলভ আচরণের ফলে পূর্ববাংলার ভাষা, কৃষ্টি, সংস্কৃতির বিকাশে এবং রাজনীতি ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে ব্যাপক বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই স্বেচ্ছাচারী শাসন কায়েম হয়। গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ ১৯৫৩ সালের ১৬ এপ্রিল নাজিমুদ্দিন মন্ত্রিসভাকে বাতিল করেন। মোহাম্মদ আলীকে কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে স্বেচ্ছাচারিতার ভিত্তিতে নতুন প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করেন। ১৯৫৫ সালের ৮ নভেম্বর গণপরিষদ বাতিল করা হয়। পূর্ব বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠতা মোকাবেলার জন্য পূর্ব ও পশ্চিমের সব প্রদেশ সংযুক্ত করে এক ইউনিট গঠন করে সংখ্যা সাম্যনীতি গ্রহণ করা হয়। জন্মলাভের নয় বছর পর ১৯৫৬ সালের ২৩ মার্চ পাকিস্তানে প্রথম সংবিধান রচনা করা হয়। ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর ইস্কান্দার মির্জা সামরিক শাসন জারি করেন। পাকিস্তানের সেনাপ্রধান জেনারেল আইয়ুব খান ২০ দিনের মাথায় তাকে সরিয়ে নিজে ক্ষমতায় আসীন হন এবং সংবিধান বাতিল করে দেন। ১৯৬২ সালে আইয়ুব খান মৌলিক গণতন্ত্র পদ্ধতি নির্ভর সংবিধান প্রণয়ন করেন। ১৯৬৯ এর মার্চে পূর্ববাংলার গণ আন্দোলনে টিকতে না পেরে সেনাপ্রধান জেনারেল ইয়াহিয়ার হাতে ক্ষমতা দিয়ে তিনি রাজনীতি থেকে বিদায় নেন। জেনারেল ইয়াহিয়া পুনরায় সামরিক শাসন জারি করেন। এইভাবে পাকিস্তানের আইন পরিষদকে অকার্যকর এবং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করা হয়। দীর্ঘ ২৪ বছরই সামরিক চক্র ও আমলারা দেশ শাসন করেন।

১৯৪৭ থেকে ১৯৬৬ পর্যন্ত পাকিস্তানের উভয় অংশের অর্থনৈতিক বৈষম্য ছিল প্রকট। ১৯৪৭-৪৮ সালে জাতীয় আয়ের প্রায় ৫২ ভাগই ছিল পূর্ববাংলার অবদান। কিন্তু ১৯৫৯-৬০ সালে তা কমে যায় এবং পশ্চিম পাকিস্তানের আঞ্চলিক আয় বৃদ্ধি পায়। ১৯৪৯-৫০ সালে পূর্ব ও পশ্চিম অংশের বৈষম্যের মাত্রা ছিল ১৯ ভাগ। কিন্তু ১৯৫৯-৬০ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় শতকরা ৩২ ভাগে এবং ১৯৬৫-৬৬ সালে তা আরও বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় শতকরা ৫৫ ভাগে। ১৯৪৭-৬৬ সালের বৈদেশিক সাহায্যের মাত্র ৩৪ ভাগ ব্যয় করা হয় পূর্ব বাংলায়, যদিও জনসংখ্যার দিক থেকে পূর্ব বাংলা ছিল শতকরা ৫৬ ভাগ। ১৯৬৬ সালের দিকে শিল্পের শতকরা ৬৬ ভাগ, ব্যাংকের শতকরা ৮০ ভাগ এবং বীমার শতকরা ৯৭ ভাগই পশ্চিম পাকিস্তানের মাত্র ২২টি পরিবারের হাতে চলে যায়। এ সময় পূর্ব বাংলা মূলত পশ্চিম পাকিস্তানের কাঁচামালের যোগানদাতাও বাজারে পরিণত হয়।

১৯৪৭-৬৭ পর্যন্ত মোট বৈদেশিক মুদ্রা আয় হয় ৩৯৯৯ কোটি টাকা। পূর্ব বাংলার অর্জন ছিল এর মধ্যে ২২৪০ কোটি টাকা এবং পশ্চিম পাকিস্তানের অর্জন ছিল ১৭৫৯ কোটি টাকা। অথচ ১৯৪৭-৬১ পর্যন্ত শাসন খাতে মোট ব্যয় ২২১৬ কোটির মধ্যে পূর্ব বাংলা মাত্র ২৬৯ কোটি টাকা আর পশ্চিম পাকিস্তানে ১৯৪৭ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়। ১৯৫০-১৯৭০ পর্যন্ত পাকিস্তানে উন্নয়ন খাতে মোট ব্যয় করা হয় ৭৫০৯ কোটি টাকা। এর মধ্যে পূর্ব বাংলায় ব্যয় করা হয় ২১১৪ কোটি টাকা আর পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় করা হয় ৫৩৯৫ কোটি টাকা। ১৯৪৭-৬৯ সালে সামরিক খাতে মোট ব্যয় হয় ২৪২৪ কোটি টাকা কিন্তু পূর্ব বাংলায় ব্যয় হয় ২২৪ কোটি টাকা আর পশ্চিম

পাকিস্তানে ব্যয় করা হয় ২২০০ কোটি টাকা। ১৯৪৭-১৯৬০ পর্যন্ত বৈদেশিক সাহায্য ও ঋণ থেকে প্রাপ্ত মোট ৫৪২১৫ কোটি টাকার মধ্যে পূর্ব বাংলা পায় ৯৩.৮৯ কোটি টাকা আর পশ্চিম পাকিস্তান পায় ৪৪৮.২৫ কোটি টাকা। সামরিক ও বেসামরিক খাতে মোট ব্যয় ৩১৫৯ কোটি টাকার মধ্যে পূর্ব বাংলায় ব্যয় হয় ৪২৪ কোটি টাকা এবং পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় করা হয় ২৭৩৫ কোটি টাকা।

পাকিস্তানের স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনীতে বাঙালি প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে মারাত্মকভাবে বঞ্চনার শিকার হন। ১৯৪৭-১৯৭১ পর্যন্ত পূর্ববাংলার প্রতিনিধিত্ব ছিল যথাক্রমে শতকরা ৫ ভাগ, ১০ ভাগ এবং ১৬ ভাগ। ১৯৬৬ সালে পাকিস্তানি শাসন ব্যবস্থায় প্রথম শ্রেণীর মোট ২৮১৬ জনের মধ্যে পূর্ব বাংলার ৭৩২ জন শতকরা ২৩ ভাগ বাকি ৭৭ ভাগ ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের দখলে। দ্বিতীয় শ্রেণীর মোট ৫৯১৬ জনের মধ্যে শতকরা ২৬ ভাগ পূর্ব বাংলার এবং ৭৪ ভাগ পশ্চিম পাকিস্তানের। ঠিক একই ভাবে তৃতীয় শ্রেণীর মোট ৭০,০০০ হাজার কর্মচারীর মধ্যে পূর্ব বাংলা শতকরা ২৭ ভাগ আর পশ্চিম পাকিস্তান ৭৩ ভাগ। চতুর্থ শ্রেণীর মোট ২৬,০০০ হাজার কর্মচারীর মধ্যে পূর্ব বাংলার শতকরা ৩০ ভাগ এবং ৭০ ভাগ পশ্চিম পাকিস্তানের।

উপরিউক্ত তথ্যে প্রমাণিত হয় যে, পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক, প্রশাসনিক সাংস্কৃতিক সকল ক্ষেত্রেই ব্যাপক বৈষম্য বিদ্যমান ছিল, যার পরিণতি পূর্ব বাংলা রুখে দাঁড়ায়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের অন্যতম প্রধান দুটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল পূর্ব বাংলার অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক, সামাজিক স্বার্থ সংরক্ষণ (Protection of Interests) এবং বাঙালি জাতি-পরিচিতি সংরক্ষণ ((Preservation of Identity)। ১৯৫২ এর ভাষা আন্দোলন থেকে ১৯৭১ এর স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের সূচনাকাল অবধি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে রেকর্ডকৃত সকল আন্দোলন, অভ্যুত্থান, প্রতিবাদ-প্রতিরোধ, দ্রোহ ও যুদ্ধে এই সত্যই প্রমাণিত হয়।

সারসংক্ষেপ

ভৌগোলিক ব্যবধান, বাঙালি-জাতির পরিচিতি ও ভাষা-সংস্কৃতির উপর আগ্রাসন, পশ্চিমাদের স্বেচ্ছাচারী শাসন, অর্থনৈতিক শোষণ, বঞ্চনা এবং বাঙ্গালিসহ সকল ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর নিরবচ্ছিন্ন আন্দোলন-সংগ্রাম ও সর্বোপরি স্বাধীনতাযুদ্ধই বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটির বাস্তবরূপ দান করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

(ক) নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। পাকিস্তানে প্রথম সংবিধান প্রণীত হয়-
   (ক) ১৯৫৬ সনের ২৩ মার্চ (খ) ১৯৫৬ সনের ২১ ফেব্রুয়ারি
   (গ) ১৯৫৬ সনের ২৯ সেপ্টেম্বর (ঘ) ১৯৫৬ সনের ২ মার্চ

২। ফিল্ড মার্শাল মোঃ আইয়ুব খান গণ অভ্যুত্থানে টিকতে না পেরে ক্ষমতা দেন-
   (ক) খাজা নাজিমুদ্দিনকে (খ) টিক্কা খানকে
   (গ) ইয়াহিয়া খানকে (ঘ) জুলফিকার আলী ভুট্টোকে

৩। পাকিস্তানের ইতিহাসে সর্বজনীন প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে একমাত্র সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়-
   (ক) ১৯৫৪ (খ) ১৯৭০
   (গ) ১৯৬২ (ঘ) ১৯৬৬

(খ) রচনামূলক প্রশ্ন

১। পূর্ব বাংলার উপর পাকিস্তানি শাসন-শোষণের প্রক্রিয়া আলোচনা করুন।

উত্তরমালা

১। (ক), ২। (গ), ৩। (খ)

পাঠ ২ : ভাষা আন্দোলন ও এর তাৎপর্য

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।
- বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে ভাষা আন্দোলনের প্রভাব বর্ণনা করতে পারবেন।

ভাষা আন্দোলন (১৯৪৮-১৯৫২)

বাংলাদেশের স্বাধীনতার বীজ সৃষ্টিতে ১৯৪৮ এবং ১৯৫২ এ দুটি পর্যায় রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে বাংলা ভাষাকে প্রতিষ্ঠার জন্য পূর্ব বাংলার ছাত্র-জনতার আন্দোলন এক যুগান্তকারী ঘটনা। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানভিত্তিক শাসকগোষ্ঠী পূর্ব বাংলার জনগণের ভাষা ও সংস্কৃতির বিনাশ সাধনের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। ১৯৪৭ সালেই করাচিতে অনুষ্ঠিত শিক্ষা সম্মেলনে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব করা হয়। এর বিরুদ্ধে অধ্যাপক আবুল কাশেমের নেতৃত্বে তমুদ্দুন মজলিস, ১৯৪৭ সালে প্রথমে নূরুল হক ভূঁইয়া পরে সামছুল হকের নেতৃত্বে ১৯৪৮ সালে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। এ পরিষদ পূর্ব বাংলার শিক্ষার মাধ্যম ও অফিস-আদালতে সর্বত্র বাংলা ভাষার ব্যবহার এবং সমগ্র পাকিস্তানে উর্দুর পাশাপাশি বাংলাকেও সমগ্র পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মর্যাদা দানের দাবি তোলে। ১৯৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি বিষয়টি গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে উত্থাপিত হয়। তখন সমগ্র পূর্ব বাংলাব্যাপী ছাত্র ধর্মঘট, শোভাযাত্রা এবং প্রবল দাবির মুখে পূর্ব বাংলার প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন ভাষার দাবি মেনে নেন এবং ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে এক চুক্তি করেন।

কিন্তু ১৯৪৮ সালের ২১ মার্চ রেসকোর্সে এবং ২৪ মার্চ কার্জন হলের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব ঘোষণা করেন। এতে পূর্ববাংলার শিক্ষার্থী, শিক্ষক, পেশাজীবী, জনতা বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। ১৯৫০ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান কর্তৃক গণপরিষদে পেশকৃত 'মূলনীতি কমিটির' রিপোর্টে উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে উল্লেখ করা হয়। এতে গণপরিষদের বাঙালি সদস্যগণ এবং পূর্ববাংলার জনগণ বিক্ষুব্ধ হন। ১৯৫২ সালের ২৬ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন ঢাকার পল্টন ময়দানে এক জনসভায় উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা প্রদান করলে সমগ্র পূর্ববাংলায় তীব্র বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ শুরু হয়ে যায়। কেননা ১৯৫১ সালে ভাষার ভিত্তিতে পাকিস্তানের জনগণের শতকরা হার অনুযায়ী বাংলা ছিল ৫৬.৪০ ভাগ আর উর্দু ছিল ৩.২৭ ভাগ।

খাজা নাজিমুদ্দিনের ঘোষণার প্রতিক্রিয়ায় ৩০ জানুয়ারি ঢাকায় প্রতিবাদ দিবস পালিত হয়। ৩১ জানুয়ারি সর্বদলীয় কর্মী সমাবেশে 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কার্যকরী পরিষদ' গঠিত হয়। এ সভায় স্থির হয় ২১ ফেব্রুয়ারি প্রদেশব্যাপী রাষ্ট্রভাষা দিবস পালন করা হবে। রাষ্ট্রভাষা দিবস কর্মসূচি সফল করে তোলার জন্য ৪ ফেব্রুয়ারি 'হরতাল' এবং ১১ ও ১৩ ফেব্রুয়ারি 'পতাকা দিবস' পালিত হয়। কারাগারে আটক অবস্থায় ১৯৫২ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা' ও 'বন্দীমুক্তির' দাবিতে শেখ মুজিবুর রহমান এবং আওয়ামী লীগ নেতা মহিউদ্দিন আহমদ আমরণ অনশন ধর্মঘট শুরু করেন।

সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের আহ্বানে সমগ্র পূর্ব বাংলায় ধর্মঘট, সভা, শোভাযাত্রা চলতে থাকে। নূরুল আমীনের মুসলিম লীগ সরকার ২০ ফেব্রুয়ারি বিকেল থেকে এক মাসের জন্য ঢাকা শহরে ১৪৪ ধারা জারি করে এবং সভা, সমাবেশ ও শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবনের আমতলায় এক ঐতিহাসিক সভায় বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে প্রাদেশিক পরিষদ ভবনে (বর্তমানে জগন্নাথ হল মিলনায়তন) গমনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ সালে ঢাকায় ছাত্র-জনতা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিল করলে মেডিকেল কলেজের হোস্টেলের সামনে লাঠি চার্জ, কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপের পর পুলিশ গুলি চালায়। পুলিশের গুলিতে সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার ও পরে শফিউদ্দিন নিহত হন। এই বর্বর হত্যার প্রতিবাদে পূর্ব বাংলার ছাত্র, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, পেশাজীবীসহ সর্বস্তরের

জনতা প্রচণ্ড বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে শহীদদের স্মৃতিকে অম্লান করে রাখার জন্য মেডিকেল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণে রাতারাতি ছাত্রজনতা গড়ে তোলে শহীদ মিনার যা ২৪ ফেব্রুয়ারি উদ্বোধন করেন শহীদ শফিউদ্দিনের পিতা। ২১ ফেব্রুয়ারির বর্বর হত্যার প্রতিবাদে বিক্ষোভের প্রচণ্ডতার কাছে পরাজয় স্বীকার করে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার দাবিকে মেনে নেয়।

পরে ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের প্রথম সংবিধানে তা অন্তর্ভুক্ত করে। বাংলাদেশের জনগণের এই ভাষা জাগরণই 'ভাষা আন্দোলন' নামে পরিচিত।

ভাষা আন্দোলনের তাৎপর্য

ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়েই পূর্ব-বাংলার বাঙালি জনগোষ্ঠীর জাতীয় চেতনার সর্বপ্রথম বহিঃপ্রকাশ ঘটে। ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য নিম্নরূপ :

১. ভাষা আন্দোলন ছিল বাঙালির স্বাধিকার এবং জাতীয়তাবাদী চিন্তা-চেতনা উন্মেষের আন্দোলন। এ আন্দোলন বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির আন্দোলন হলেও ভাষার দাবি পূরণের জন্য রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্তের প্রয়োজন ছিল। তাই এ আন্দোলন রাজনৈতিক রূপ পরিগ্রহ করে।

২. ভাষা আন্দোলন বাঙালি জনগণের মধ্যে ভাষা ভিত্তিক বাঙালি জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটায়। এ আন্দোলনের মধ্য দিয়েই বাঙালিরা সর্বপ্রথম নিজেদের স্বতন্ত্র স্বত্তা, স্বতন্ত্র অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। একমাত্র ধর্ম ছাড়া পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে বাঙালিদের অন্য কোন সম্পর্ক নেই তা বাঙালিরা প্রথমবারের মত উপলব্ধি করতে সক্ষম হন।

৩. ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাঙালি জনগণ নিজেদের অধিকার এবং ন্যায়সঙ্গত দাবি আদায়ে সচেতন হয়ে ওঠেন।

৪. ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাঙালি জনগণ উপলব্ধি করে যে, সংগ্রামের মাধ্যমেই তাদের দাবি-দাওয়া আদায় করতে হবে এবং মুক্তির পথ খুঁজে বের করতে হবে।

৫. ভাষা আন্দোলনে সৃষ্ট জাতীয়তাবাদী চিন্তা-চেতনা বাঙালি জনগণকে স্বতন্ত্র স্বার্থ, স্বতন্ত্র অস্তিত্ব এবং স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে পশ্চিম পাকিস্তানিদের থেকে পৃথক করতে শেখায়।

৬. ভাষা আন্দোলনের পর থেকে ছাত্রসমাজের গুরুত্ব ও মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। পূর্ব বাংলার ছাত্রসমাজ একটি প্রভাবশালী রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয়।

১৯৯৯ সালে জাতিসংঘ ২১ ফেব্রুয়ারি 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' ঘোষণা করে। বাংলাভাষা আন্তর্জাতিক মর্যাদা লাভ করে। ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃত হয়।

বাঙালিদের অধিকারবোধ, স্বাতন্ত্র্যের সচেতনতা ও জাতীয় চেতনার ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধিকারের পথ ধরে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় ভাষা আন্দোলন উদ্বুদ্ধ করে। ২১শের চেতনা থেকেই বাঙালি জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটে। এই জাতীয়তাবাদী চেতনা থেকেই উদ্ভব হয় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। সুতরাং আমাদের জাতীয় জীবনে ভাষা আন্দোলনের তাৎপর্য অসীম।

সারসংক্ষেপ

ভাষা আন্দোলন আমাদের জাতীয় চেতনার উন্মেষ ঘটায় এবং রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপ লাভ করে। কেননা বাঙালি এই ভাষা আন্দোলনের পথ ধরেই বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার প্রেরণা পায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

(ক) নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। রেসকোর্স ময়দানে এবং কার্জন হলে 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা' বলেন-

(ক) খাজা নাজিমুদ্দিন (খ) লিয়াকত আলী খান

(গ) মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ (ঘ) আবুল কাশেম

২। ভাষা আন্দোলন সংগঠিত ভাবে সর্বপ্রথম শুরু করে-

(ক) তমুদ্দন মজলিশ (খ) কৃষক প্রজাপার্টি

(গ) তফসিল ফেডারেশন (ঘ) মুসলিম লীগ

(খ) রচনামূলক প্রশ্ন

১। ভাষা আন্দোলনের পটভূমি ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।

(গ) উত্তরমালা

১। (গ), ২। (ক)

পাঠ-৩ : ১৯৫৪ সালের নির্বাচন, যুক্তফ্রন্ট গঠন ও এর তাৎপর্য

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের পটভূমি বর্ণনা করতে পারবেন।
- যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের ফলাফল ও তাৎপর্য বর্ণনা করতে পারবেন।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকেই পূর্ব বাংলার প্রতি পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর বিমাতাসুলভ ও বৈষম্যমূলক আচরণের ফলে এ অঞ্চলের মানুষ প্রকৃত অর্থে স্বাধীনতা ও উন্নয়ন থেকে নানাভাবে বঞ্চিত হয়। ফলে পূর্ব ও পশ্চিম উভয় অঞ্চলের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা বাড়তে থাকে। পূর্ব বাংলার জনগণের প্রতিবাদ ও ক্ষোভ তীব্র হয়ে ওঠে। ১৯৪৬ সালের পর ১৯৫১ সালে প্রদেশগুলোতে নির্বাচন হবার কথা ছিল। কিন্তু পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশগুলোতে নির্বাচন দিলেও পূর্ব বাংলায় মুসলিম লীগের সম্ভাব্য পরাজয়ের ভয়ে নির্বাচন দেয়নি। ১৯৫৪ সালে পূর্ব বাংলায় সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে পূর্ব বাংলার কয়েকটি রাজনৈতিক দল, যেমন– আওয়ামী লীগ, কৃষক প্রজাপার্টি, নেজামে ইসলাম, গণতন্ত্রী দল এক জোট হয়ে 'যুক্তফ্রন্ট' গঠন করে। যুক্তফ্রন্ট ২১ দফা কর্মকসূচি নিয়ে নির্বাচনে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। যুক্তফ্রন্টের প্রধান নেতারা ছিলেন শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এবং মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী।

১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনের ফলাফল

দল	প্রাপ্ত আসন
যুক্তফ্রন্ট	২৩৬
মুসলিম লীগ	০৯
খিলাফত-ই রাব্বানী	০১
কংগ্রেস দল	২৪
তফসিলী ফেডারেশন	২৭
খ্রিস্টান	০১
বৌদ্ধ	০২
কমিউনিস্ট পার্টি	০৪
নির্দলীয়	০৫
মোট	৩০৯

নির্বাচনে মুসলিম লীগের চরম পরাজয় ঘটে। শেরে বাংলা একে ফজলুল হকের নেতৃত্বে ফ্রন্টের অন্যান্য শরীক দলের প্রতিনিধি নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। কিন্তু পাকিস্তানি শাসকরা যুক্তফ্রন্টকে বেশিদিন ক্ষমতায় থাকতে দেয়নি। মাত্র ৫৬ দিনের মাথায় ১৯৫৪ সালের ২৯ মে পূর্ব বাংলায় গভর্নর জেনারেল এক রুল জারি করেন। ৯২ (ক) ধারা জারি করে মন্ত্রিসভা ভেঙে দিয়ে পূর্ব বাংলায় কেন্দ্রের শাসন বলবৎ করে।

যুক্তফ্রন্ট গঠন এবং নির্বাচনের ফলাফলের তাৎপর্য

১৯৫৪ সালের ১১ মার্চের নির্বাচনে হক-ভাসানী-সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট গঠন এবং এর আহ্বানে নির্বাচনে তৎকালীন প্রাদেশিক শাসকগোষ্ঠীর ভরাডুবি এবং যুক্তফ্রন্টের বিশাল বিজয়ের মধ্য দিয়ে এর কতগুলো তাৎপর্য ফুটে ওঠে।

পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর অভ্যন্তরীণ কোন্দল, ইসলামি শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থতা এবং সাংস্কৃতিক আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থতা, প্রদেশে বিশেষ করে পূর্ব বাংলায় তল্পিবাহকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া, পূর্ব বাংলার উপর অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ভাষাগত শোষণ ও বৈষম্য ইত্যাদি কারণে একদিকে মুসলিম লীগের পরাজয় ঘটে অন্যদিকে যুক্তফ্রন্ট জয়লাভ করে। মুসলিম লীগ শাসক গোষ্ঠীর লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার দাবি অস্বীকার, জমিদার-জোতদার, ধনী-অভিজাত মুসলিম লীগের নেতৃত্বের গণ-বিচ্ছিন্নতা, বাংলাভাষার বিরোধিতা, সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ব বাংলার উপর জোর করে সংখ্যাসাম্য নীতি চাপানো, হক, ভাসানী, সোহরাওয়ার্দীর মতো নেতৃবর্গকে মুসলিম লীগে ঠাঁই না দেয়া এবং রাষ্ট্রপরিচালনার স্বেচ্ছাচার বৈষম্য, পক্ষপাত, কেন্দ্রের অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ এসবের বিরুদ্ধেই জনগণ নির্বাচনে গণরায় প্রদান করে 'যুক্তফ্রন্ট'কে বিজয়ী করেন।

যুক্তফ্রন্ট গঠন এবং নির্বাচনে গণরায়ের মধ্য দিয়ে পূর্ব বাংলার মানুষের ভাষা ও ভূখণ্ডগত স্বাতন্ত্র্য চেতনা স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং জাতীয় চেতনাকে জাগরিত করে। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের ২১ দফার অনুকূলে অভূতপূর্ব গণরায় ইঙ্গিত দেয় যে, পাকিস্তানে পূর্ববাংলা সকল ক্ষেত্রে ন্যায্য অধিকার আদায়ে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই চালাতে প্রস্তুত। এতে পূর্ববাংলার স্বায়ত্তশাসনের গতি তীব্রতর হয়। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠা দানে বাধ্য করা হয়। পূর্ববাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রভাব বৃদ্ধি বাঙালি জাতীয়তাবাদ, অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিকাশ, স্বায়ত্তশাসনের দাবি রাজনৈতিক সচেতনতা, যুক্তফ্রন্ট গঠন ও নির্বাচনে জয়লাভের ফলেই বিকাশ লাভ করে। স্বায়ত্তশাসনের দাবি স্বাধিকারের পথ ধরে স্বাধীনতার দিকে ধাবিত হয়। বাঙালি জনগণের রাজনৈতিক অগ্রগতিতে ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনের গুরুত্ব অপরিসীম। এ নির্বাচনের ফলেই বাঙালি জাতীয়তাবাদ আরো সুদৃঢ় হয়।

যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা কর্মসূচি

১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট নেতাগণ ২১ ফেব্রুয়ারি ভাষা শহীদের স্মৃতিকে অম্লান রাখার জন্য শ্রদ্ধাভরে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী কর্মসূচিকে ২১টি দফায় লিপিবদ্ধ করে। যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা অন্তর্ভুক্ত ছিল নিম্নরূপ কার্যাবলি সম্পাদন করা :

১. বাংলা হবে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা।
২. বিনা খেসারতে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ, মধ্যমস্বত্বের বিলোপ সাধন এবং ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে উদ্বৃত্ত জমি বণ্টন, ভূমি রাজস্বকে ন্যায়সঙ্গত স্তরে নামিয়ে আনা এবং সার্টিফিকেট প্রথা বাতিল।
৩. পাট ব্যবসা জাতীয়করণ ও পাটের ন্যায্য মূল্য প্রদান করা হবে। মুসলিম লীগ আমলের পাট কেলেংকারীর তদন্ত করে দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি প্রদান এবং তাদের অবৈধ উপায়ে অর্জিত সম্পদ বাজেয়াপ্ত।
৪. সমবায় কৃষি ব্যবস্থা প্রবর্তন করা; কুটির শিল্পের বিকাশ ও শ্রমজীবীদের অবস্থার উন্নয়ন সাধন।
৫. পূর্ব বাংলাকে লবণের ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে কুটির ও বৃহৎ পর্যায়ে লবন শিল্প প্রতিষ্ঠা।
৬. অবিলম্বে বাস্তুহারাদের পুনর্বহাল।
৭. সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং দেশকে বন্যা ও দুর্ভিক্ষের কবল থেকে রক্ষা।
৮. পূর্ব বাংলাকে শিল্পায়িত করা এবং আই. এল. ও. (আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থা) কনভেশন অনুযায়ী শিল্প শ্রমিকদের জন্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান।
৯. অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন ও শিক্ষকদের জন্য ন্যায্য বেতন ও ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা।
১০. সরকারি ও বেসরকারি বিদ্যালয়গুলোর মধ্যে বিভেদ বিলোপ করে সমগ্র মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্গঠন এবং মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম নির্ধারণ।

১১. বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কিত সকল প্রতিক্রিয়াশীল কালাকানুন বাতিল করে একে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর।
১২. প্রশাসনিক ব্যয় সংকোচ করা এবং উচ্চ ও নিম্ন বেতনভোগী সরকারি কর্মচারীদের বেতনের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান। যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রীগণের এক হাজার টাকার বেশি বেতন গ্রহণ না করার নীতি নির্ধারণ।
১৩. দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও ঘুষখোরী উচ্ছেদ করা, এই উদ্দেশ্যে ১৯৪৭ সালের পর হতে সকল সরকারি কর্মকর্তা ও ব্যবসায়ী কর্তৃক অর্জিত সম্পত্তির হিসাব গ্রহণ এবং সকল অবৈধ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার ব্যবস্থা।
১৪. বিভিন্ন নিরাপত্তা আইন ও অর্ডিন্যান্স বলে আটকৃত সকল নিরাপত্তা বন্দিকে মুক্তিদান এবং সমিতি ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এবং বাক-স্বাধীনতার নিশ্চয়তা বিধান।
১৫. শাসন বিভাগ হতে বিচার বিভাগকে পৃথকীকরণ।
১৬. 'বর্ধমান' হাউসকে আপাতত ছাত্রাবাস এবং পরে বাংলা ও সাহিত্যের গবেষণাগার হিসেবে প্রতিষ্ঠা।
১৭. বাংলাভাষা ও সাহিত্যের জন্য যারা প্রাণ উৎসর্গ করেছেন, তাদের পবিত্র স্মৃতিকে রক্ষা করার জন্য শহীদ মিনার নির্মাণ।
১৮. একুশে ফেব্রুয়ারিকে শহীদ দিবস ঘোষণা ও একে ছুটির দিন হিসেবে পালন।
১৯. লাহোর প্রস্তাব অনুযায়ী পূর্ব বাংলার জন্য পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা এবং প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র, মুদ্রা কেন্দ্রের হাতে রেখে অন্য সকল বিষয়ে পূর্ব বাংলার নিয়ন্ত্রণ আনয়ন, সেনা বাহিনীর সদর দফতর পশ্চিম পাকিস্তানে রেখে নৌবাহিনীর সদর দফতর পূর্ব বাংলায় স্থানান্তর, প্রতিরক্ষার ব্যাপারে পূর্ব বাংলাকে স্বয়ম্ভর করার জন্য এখানে অস্ত্র কারখানা স্থাপন করা এবং আনসার বাহিনীকে পূর্ণাঙ্গ মিলিশিয়া হিসেবে গড়ে তোলা।
২০. যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা কোনোক্রমেই আইনসভার আয়ু বর্ধিত করবে না। সাধারণ নির্বাচনের ছয় মাস পূর্বে মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করবে এবং নির্বাচন কমিশনের মাধ্যমে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা।
২১. আইনসভার কোনো আসন শূন্য হওয়ার তিন মাসের মধ্যে উপ নির্বাচনের মাধ্যমে এটা পূরণ করা হবে এবং যুক্তফ্রন্ট প্রার্থীরা পরপর তিনটি উপনির্বাচনে পরাজিত হলে মন্ত্রিসভা থেকে স্বেচ্ছায় পদত্যাগ ব্যবস্থা গ্রহণ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

(ক) নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। যুক্তফ্রন্ট গঠিত হওয়ার তারিখ-
(ক) ১৯৫২ সালের, ২১ মার্চ (খ) ১৯৫৩ সালের, ২৪ জুন
(গ) ১৯৫৪ সালের, ১১ মার্চ (ঘ) ১৯৫৪ সালের, ২৬ মার্চ

২। যুক্তফ্রন্টের কর্মসূচি ছিল-
(ক) ৬ দফা (খ) ১১ দফা
(গ) ১০ দফা (ঘ) ২১ দফা

(খ) রচনামূলক প্রশ্ন

১। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট গঠন ও এর তৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।
২। যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা কর্মসূচি বর্ণনা করুন
৩। ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের গুরুত্ব ও ফলাফল লিখুন।

(ক) উত্তরমালা

১। (খ), ২। (ঘ)

পাঠ-৪ : বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৬ দফা, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ও ১৯৬৯ এর গণ-অভ্যুত্থান

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ছয় দফা সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা এবং ১৯৬৯ এর গণ-অভ্যুত্থান সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

১৯৬৬ সালের ঐতিহাসিক ছয় দফা আন্দোলনের পটভূমি

'পাকিস্তান' রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়েছিল লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে। লাহোর প্রস্তাবে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের কথা বলা হলেও পাকিস্তানে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই পূর্ব বাংলার জনগণের উপর শুরু হয় পশ্চিমা শাসক গোষ্ঠীর শোষণ, বঞ্চনা ও নির্যাতন। ফলে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক বৈষম্য পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে প্রকট আকার ধারণ করে। পশ্চিমা শাসক গোষ্ঠীর অপশাসনের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধ শুরু হলে পূর্ব পাকিস্তান সম্পূর্ণ অরক্ষিত হয়ে পড়ে। সামরিক দিক থেকে পূর্ব পাকিস্তানের অসহায় অবস্থা এবং অর্থনৈতিক বৈষম্য থেকে মুক্তির লক্ষে শুরু হয় স্বাধিকারের আন্দোলন। শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ এ আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।

১৯৬৬ সালের ৫-৬ ফেব্রুয়ারি লাহোরে বিরোধী দলের এক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। উক্ত সম্মেলনে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে শেখ মুজিবুর রহমান ঐতিহাসিক 'ছয় দফা' কর্মসূচি পেশ করেন। এরপর তিনি জনমত সৃষ্টি করতে ছয় দফা দেশবাসীর সামনে তুলে ধরেন। ছয় দফা কর্মসূচিকে তিনি 'পূর্ব বাংলার বাঁচার দাবি' বলে অভিহিত করেন। বাঙালী জনগণ কর্তৃক উক্ত কর্মসূচি দ্রুত সমাদৃত হয়।

ছয় দফা কর্মসূচি

পশ্চিমা শাসক গোষ্ঠী কর্তৃক পূর্ব বাংলাকে শোষণের বিরুদ্ধে ছয় দফা কর্মসূচি ছিল তীব্র প্রতিবাদ আর বাঙালির অধিকার আদায়ের সনদ বা মুক্তিসনদ। ছয় দফা কর্মসূচি ছিল নিম্নরূপ :

১ম দফা : লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পাকিস্তানের জন্য সত্যিকার অর্থে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করতে হবে। সরকার হবে সংসদীয় পদ্ধতির। সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সকল প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটে জাতীয় ও প্রাদেশিক আইনসভাগুলো গঠিত হবে।

২য় দফা : যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের হাতে থাকবে দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্র বিষয়। অবশিষ্ট সকল বিষয় প্রদেশের হাতে থাকবে।

৩য় দফা : দেশের দুই অঞ্চলের জন্য দুটি পৃথক অথচ সহজ বিনিময়যোগ্য মুদ্রা চালু থাকবে অথবা দেশের দুই অঞ্চলের জন্য একই মুদ্রা থাকবে। তবে সংবিধানে এমন ব্যবস্থা রাখতে হবে যাতে এক অঞ্চলের মুদ্রা ও মূলধন অন্য অঞ্চলে পাচার হতে না পারে।

৪র্থ দফা : সকল প্রকার ট্যাক্স, খাজনা ও কর ধার্য এবং আদায়ের ক্ষমতা প্রাদেশিক সরকারের হাতে থাকবে তবে কেন্দ্রিয় সরকারের ব্যয় নির্বাহের জন্য আদায় কৃত অর্থের একটি অংশ কেন্দ্রিয় সরকার পাবে।

৫ম দফা : বৈদেশিক বাণিজ্যি ও বৈদেশিক মুদ্রার উপর প্রাদেশিক সরকারের ক্ষমতা থাকবে। সকল প্রকার বৈদেশিক চুক্তি ও সহযোগিতার ব্যাপারে প্রাদেশিক সরকার দায়িত্ব পালন করবে। তবে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা যুক্তিযুক্ত হারে উভয় সরকার কর্তৃক মেটানো হবে।

৬ষ্ঠ দফা : আঞ্চলিক নিরাপত্তার জন্য আঞ্চলিক সরকারগুলো স্বীয় কর্তৃত্বাধীন আধা সামরিক বাহিনী (প্যারা মিলিশিয়া) গঠন ও পরিচালনা করতে পারবে।

ছয় দফা কর্মসূচির মূল আবেদন ছিল পূর্ব পাকিস্তান শুধু একটি প্রদেশ নয় বরং একটি স্বতন্ত্র স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল। সকল প্রকার শোষণ ও বঞ্চনার অবসান ঘটানোই ছিল এর লক্ষ্য।

ছয় দফা আন্দোলন

ছয় দফা কর্ম সূচি পূর্ব বাংলার অবহেলিত ও স্বাধিকারকামী মানুষের নিকট দ্রুত সমাদৃত হয়। ছয় দফা কর্মসূচির জনপ্রিয়তা অর্জন ক্রমশ একটি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে রূপ লাভ করে। স্বৈরাচারী আইয়ুব খানের দোসর মোনায়েম সরকার ছয় দফা আন্দোলনকে 'রাষ্ট্রবিরোধী আন্দোলন' বলে অভিহিত করে। শেখ মুজিবসহ আওয়ামী লীগ নেতাদের বিরুদ্ধে দেশের বিভিন্ন আদালতে মামলা দায়ের করা হয়। বন্দি নেতাকর্মীদের মুক্তির দাবিতে দেশব্যাপী আন্দোলন ও হরতাল শুরু হয়। সভা ও শোভাযাত্রা বন্ধের জন্য সরকার ১৪৪ ধারা জারি করে। শেখ মুজিব সহ আওয়ামী লীগ নেতাগণ প্রতিটি মামলায় মুক্তি লাভ করেন। এতে আইয়ুব সরকার ক্ষিপ্ত হয়ে আওয়ামী লীগ নেতাদের বিশেষ করে শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে নিত্য নতুন মামলা রুজু করে কারাগারে প্রেরণ করে। ১৯৬৬ সালের ৭ জুন পূর্ব বাংলায় হরতাল আহ্বান করা হয়। ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে জনগণ স্বত:স্ফূর্তভাবে ছয় দফার পক্ষে সভা ও শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করে। এ আন্দোলনে প্রায় এক হাজার আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মী গ্রেফতার এবং পুলিশের গুলিতে শত শত লোক আহত এবং ১২ জন নিহত হয়। ১৬ জুন পূর্ব বাংলার মুখপাত্র 'ইত্তেফাক' নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয় এবং এর সম্পাদক তোফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া)-কে গ্রেফতার করা হয়। এতসব সত্ত্বেও সরকার ছয় দফা ভিত্তিক আন্দোলন দমন করতে ব্যর্থ হয়। আন্দোলনের ফলে ছয় দফা জনগণের ম্যাণ্ডেট লাভ করে। শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালি জনগণের নিকট নির্ভীক, আপোসহীন ও ত্যাগী নেতায় পরিণত হন।

ছয় দফার গুরুত্ব ও তাৎপর্য

ছয় দফা কর্মসূচিকে পাকিস্তানের শাসক জেনারেল আইয়ুব খান বিচ্ছিন্নতাবাদী কর্মসূচি বলে আখ্যায়িত করেন এবং প্রবক্তাদের ওপর হয়রানি ও জুলুম শুরু করে। ছয় দফা কর্মসূচি ছিল বাঙালিদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের সনদ। ছয় দফা ভিত্তিক আন্দোলনে সরকারের নির্যাতনমূলক ব্যবস্থা বাঙালিদের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। ছয় দফা আন্দোলনে অনেক নির্যাতন এবং অনেক তাজা রক্ত ঝরেছে। অনেক মায়ের বুক খালি হয়েছে। ছয় দফা এতই প্রবল ছিল যে অনেক অত্যাচার, নির্যাতন সত্ত্বেও বাঙালিরা আন্দোলন থেকে সরে যান নাই বরং আরও বেশি সংগঠিত হয়েছেন। যার ফলশ্রুতিতে ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বাঙালি জনতা অকুণ্ঠ চিত্তে আওয়ামী লীগকে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করে। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের প্রবল প্রেরণা আসে ছয় দফার ঐক্য থেকে। তাই ছয় দফাকে বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ বলা যায়।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা

বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্য স্বৈরাচারী আইয়ুব-মোনায়েম সরকার নির্ভীক সাংবাদিক তোফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া) কে গ্রেফতার, তার 'প্রিন্টিং প্রেস' বাজেয়াপ্ত, 'ইত্তেফাক' প্রকাশনা বন্ধ ঘোষণা এবং আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দকে গণহারে গ্রেফতার শুরু করে। ১৯৬৭ সালের, ২৩ জুন তথ্য ও বেতার মন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দিন জাতীয় পরিষদে বাঙালি সংস্কৃতি বিরোধী এই অজুহাতে রবীন্দ্র সংগীত বেতার ও টেলিভিশনে প্রচারের উপর নিষেধাজ্ঞা ঘোষণা করেন। এ সিদ্ধান্ত ঘোষণার সাথে সাথে প্রতিবাদের ঝড়

এবং আইয়ুব-মোনায়েম বিরোধী আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে ওঠে। তখন সরকার শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগকে কিভাবে চিরতরে ধ্বংস করা যায় তার গোপন ষড়যন্ত্র করতে থাকে। এক পর্যায়ে সরকার ছয় দফা আন্দোলনের জন্য 'রাষ্ট্রদ্রোহিতার' অভিযোগে অভিযুক্ত ও দেশরক্ষা আইনে আটক শেখ মুজিবুর রহমানকে ১৯৬৮ সালের ১৭ জানুয়ারি বেকসুর খালাস প্রদান করে। কিন্তু ১৮ জানুয়ারি পুনরায় গ্রেফতার করে কুর্মিটোলা সেনানিবাসে নিয়ে যাওয়া হয়। এক সরকারি প্রেসনোটে বলা হয়, "শেখ মুজিবসহ গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিরা ঢাকার ভারতীয় হাই কমিশনারের সাথে যোগাযোগ রক্ষা এবং পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার লক্ষ্যে সংঘবদ্ধ হচ্ছিল। শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর সহযোগিরা ভারতের আগরতলায় গোপন বৈঠক করে সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন করার ষড়যন্ত্র করছিল।"

এই অভিযোগে অভিযুক্ত করে শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রধান আসামি করে মোট ৩৫ ব্যক্তির বিরুদ্ধে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' তৈরি করা হয়। ১৯৬৮ সালের ২১ এপ্রিল সুপ্রীমকোর্টের সাবেক বিচারপতি এম. এ. রহমানের নেতৃত্বে অর্ডিন্যান্সে নং ৫-১৯৬৮ নামে একটি বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করে। এই আইনে রায়ের বিরুদ্ধে কোন আপিল করার সুযোগ ছিল না। ১৯৬৮ সালের ১৯ জুন কুর্মিটোলা সেনানিবাসে কঠোর নিরাপত্তায় 'রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিব ও অন্যদের মামলা' শুরু হয়। শেখ মুজিবকে রাষ্ট্রদ্রোহী প্রমাণ করে ফাঁসি দেওয়াই ছিল এই মামলার লক্ষ্য। কিন্তু একদিকে আইয়ুব-মোনায়েমের পাতানো ষড়যন্ত্রমূলক ও প্রসহনের মামলা চলতে থাকে অন্যদিকে গোটা দেশে সমগ্র জনগণের প্রতিবাদী শ্লোগান পৌঁছে যেতে থাকে বাংলাদেশের গ্রামে-গঞ্জে প্রত্যন্ত প্রান্তে। ১৪৪ ধারা, গুলি, নির্যাতন, গ্রেফতার সবকিছু উপেক্ষা করে বাঙালি জনগণ ধোঁকাবাজ, ষড়যন্ত্রকারী, লুটেরা শাসকদের মুখোশ উন্মোচন করে দেন। প্রহসনমূলক ও সাজানো এই 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' বাঙালি জনগণকে আরও ঐক্যবদ্ধ করে তোলে। অতি দ্রুত শেখ মুজিবুর রহমান জনগণের একমাত্র নেতা এবং আওয়ামী লীগ সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় সংগঠনে পরিণত হয়।

১৯৬৮ সালের ৭ ডিসেম্বর ঢাকা শহরে স্বতঃস্ফূর্ত হরতাল পালিত হয়। হরতালে ৪ জন নিহত, ৩০ জন আহত এবং তিন শতাধিক লোক গ্রেফতার হয়। পুলিশী নির্যাতনের বিরুদ্ধে ১৩ ডিসেম্বর হরতাল এবং জনতার 'ঘেরাও আন্দোলন' শুরু হয়। ১৯৬৯ সালের ৪ জানুয়ারি ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ১১ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করলে আন্দোলনের গতি তীব্র আকার ধারণ করে। ৮ জানুয়ারি বিরোধী দলগুলো 'গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করে। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ এবং গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদ যৌথভাবে একের পর এক আন্দোলনের কর্মসূচিতে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে আইয়ুব মোনায়েম নতি স্বীকার করে জনতার কাছে। ১৫ ফেব্রুয়ারি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামি সার্জেন্ট জহুরুল হককে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। ১৬ ফেব্রুয়ারি আন্দোলনের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। আন্দোলনের মুখে ২১ ফেব্রুয়ারি আইয়ুব খান শেখ মুজিবকে প্যারোলে মুক্তিদানের কথা ঘোষণা করেন। কিন্তু ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ এবং রাজনৈতিক নেতৃবর্গের চাপে সরকার ২২ ফেব্রুয়ারি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করে। শেখ মুজিবসহ সকল রাজবন্দিকে নিঃশর্ত মুক্তি প্রদান করা হয়। ২৩ ফেব্রুয়ারি ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে রেসকোর্স ময়দানে সংবর্ধনা সভায় শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

১৯৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থান

১৯৪৭ থেকে ১৯৬৮ পর্যন্ত তৎকালীন পাকিস্তানের পশ্চিম ও পূর্ব বাংলার মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করা হয়েছিল, পূর্ব বাংলাকে রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বে, সামারিক বাহিনীতে, বেসামরিক প্রশাসনে এবং অর্থনীতিতে ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল। মৌলিক গণতন্ত্র, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা এবং আইয়ুব শাহীর নির্যাতনের বিরুদ্ধে ১৯৬৯ সালে হরতাল, ১৪৪ ধারা ভঙ্গ, সংগ্রাম, মিছিল-মিটিং, ঘেরাও আন্দোলনের মাধ্যমে ছাত্র জনতার ব্যাপক এক গণ-অভ্যুত্থান সংগঠিত হয়। বাংলাদেশের রাজনীতিতে এটাই '৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থান নামে খ্যাত।

মৌলিক গণতন্ত্রের প্রহসন, ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধে পূর্ব বাংলা সম্পূর্ণ অরক্ষিত অবস্থা, ছেষট্টির ছয় দফা আন্দোলন, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ গঠন এবং গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদের ভূমিকা, ছাত্রদের ১১ দফা দাবি ১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থানের পটভূমি তৈরি করেছিল। ১১ দফা কর্মসূচিতে শিক্ষার

সুযোগ বৃদ্ধি, আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন, প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকার, বাক-স্বাধীনতা, বৃহৎ শিল্প জাতীয়করণ, কৃষক শ্রমিকের সুযোগ-সুবিধাবৃদ্ধি, নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি, জরুরি নিরাপত্তা আইন প্রত্যাহার, রাজবন্দিদের মুক্তি প্রভৃতি দাবি অন্তর্ভুক্ত ছিল। পশ্চিম পাকিস্তানে পুলিশের গুলিতে কয়েকজন ছাত্র নিহত হয়। এই ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে শুরু হয় সারাদেশে গণ-আন্দোলন। বিরোধী দলগুলো দেশব্যাপী তীব্র আন্দোলন শুরু করে। ডাকসুর সহসভাপতি ও ছাত্রনেতা তোফায়েল আহমদের নেতৃত্বে দেশের ছাত্রসমাজ ১১ দফা কর্মসূচি নিয়ে গণ-আন্দোলনে শরিক হয়।

আইয়ুব খানের পদত্যাগ, ১৯৬২ সালের সংবিধান বাতিল, এক ব্যক্তি এক ভোটের মাধ্যমে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার প্রভৃতি দাবিতে দেশব্যাপী প্রচণ্ড আন্দোলন গণ-অভ্যুত্থানে রূপ নেয়। আন্দোলনের ভয়ে ভীতি হয়ে আইয়ুব খান আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করেন এবং শেখ মুজিবসহ সকল রাজবান্দিদের নিঃশর্ত মুক্তি প্রদান করেন। বন্দি অবস্থা থেকে মুক্তিলাভের পর ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ সালে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (সোহরাওয়ার্দী উদ্যোন) এক বিশাল ছাত্র-জনতার সভায় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ বাঙালিদের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। এদিকে দেশের রাজনৈতিক শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা দূর করার লক্ষে সরকার ১৯৬৯ সালে রাওয়ালপিন্ডিতে সর্বদলীয় নেতৃবৃন্দের গোলটেবিল বৈঠক ডাকেন। উক্ত বৈঠকে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তগুলো গ্রহণ করা হয়।

ক. প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হবে।

খ. যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন পদ্ধতির প্রবর্তন করা হবে এবং

গ. মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার প্রতিষ্ঠা করা হবে।

এ তিনটি বিষয়ে সকলেই একমত হন। কিন্তু ছয় দফার ভিত্তিতে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের দাবি না মানায় আওয়ামী লীগ গোলটেবিল বৈঠক বর্জন করে এবং আন্দোলন অব্যাহত রাখে। ফলে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটে। পরিস্থিতি সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। ১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ আইয়ুব খান সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল ইয়াহিয়া খানের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে রাজনীতি থেকে বিদায় গ্রহণ করেন।

সারসংক্ষেপ

পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই পূর্ব বাংলার জনগণের উপর শুরু হয় শোষণ, বঞ্চনা ও নির্যাতন। পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর অপশাসনের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৬৬ সালের ৬ দফা আন্দোলন এবং ১৯৬৮-এর ১১ দফা আন্দোলনের পথ ধরে ১৯৬৯ এ গণ-অভ্যুৎত্থান রূপলাভ করে। এ গণ-অভ্যুত্থানের মধ্যদিয়েই স্বৈরাচারি সামরিক সরকারের পতন এবং ১৯৭০ এর নির্বাচন অনুষ্ঠানে পথ প্রশস্ত হয়। ১৯৭০ সালের নির্বাচনের উপর ভিত্তি করে স্বাধীনতা যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

(ক) নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। ঐতিহাসিক ৬ দফা কর্মসূচি কে কোথায় ঘোষণা করেন-

(ক) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান লাহোরে বিরোধী দলের সম্মেলনে

(খ) খাজা নাজিমুদ্দিন ঢাকাতে মুসলিম লীগের মিটিং-এ

(গ) আইয়ুব খান করাচিতে গোলটেবিল বৈঠকে

(ঘ) মাওলানা ভাসানি ঢাকার জনসভায়

২। ৬ দফাকে বাঙালির মুক্তির সনদ বলার কারণ এটি-

(ক) ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণা

(খ) বাঙালির ন্যায্য অধিকারের সনদ

(গ) মৌলিক অধিকারের ভিত্তি

(ঘ) বাঙালির যুদ্ধের্ প্রেরণা

৩। ছয় দফার কোন দফায় লাহোর প্রস্তাবকে ভিত্তি করা হয়েছে-

(ক) ২য় দফায় (খ) ১ম দফায়

(গ) ৫ম দফায় (ঘ) ৬ষ্ঠ দফায়

(খ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা কী?

(গ) রচনামূলক প্রশ্ন

১। ১৯৬৬ এর ছয় দফাগুলো বর্ণনা করুন।

২। ১৯৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থান সম্পর্কে আলোচনা করুন।

(ক) উত্তরমালা

১। (ক), ২। (খ), ৩। (খ)

পাঠ-৫ : মার্চের অসহযোগ আন্দোলন এবং একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধ সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

অসহযোগ আন্দোলন-১৯৭১

১৯৭০ সালে পাকিস্তানের ইতিহাসে সর্বপ্রথম প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ উভয় পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করে। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান ৩ মার্চের মধ্যে ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনুষ্ঠানের কথা বলেন। অপর দিকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যাতে ক্ষমতায় যেতে না পারেন সেজন্য আমলা, শিল্পপতি, সেনানায়করা এক ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন এবং নির্বাচনের গণরায়কে অর্থাৎ বাঙালির বিজয়কে নস্যাত করার চক্রান্তে লিপ্ত হন। ১ মার্চ সামরিক শাসক ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করেন এবং ২ ও ৩ মার্চ সান্ধ্য আইন জারি করেন। এর প্রতিবাদে ২ মার্চ ঢাকায় এবং ৩ মার্চ সারাদেশে স্বত:স্ফূর্তভাবে হরতাল পালিত হয়। সারাদেশ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। স্বাধিকারের আন্দোলন এবার বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ও দিক নির্দেশনায় স্বাধীনতা আন্দোলনে রূপ নেয়। সরকার এই আন্দোলন দমনের জন্য ১৪৪ ধারা জারি এবং সেনাবাহিনী নিয়োগ করে। সেনাবাহিনীর গুলিতে জয়দেবপুরে বেশ কয়েকজন লোক মারা যান। আন্দোলনের গতি আরও বেগবান হয়। বঙ্গবন্ধু জয়দেবপুর হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ৩ মার্চ ঢাকার পল্টন ময়দানের জনসভায় অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। তিনি ঘোষণা করেন আজ থেকে শান্তিপূর্ণ অসহযোগ আন্দোলন চলবে। কলকারখানা, ব্যাংক, অফিস-আদালত, রেলগাড়ি সব বন্ধ থাকবে। খাজনা-ট্যাক্স দেওয়া চলবে না। জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে বাংলার এই অবিসংবাদিত জননেতার ডাকে সাড়া দিয়ে সারা দেশে শান্তিপূর্ণভাবে অসহযোগ আন্দোলন কর্মসূচি পালন করে। ফলে পূর্ব বাংলায় কেন্দ্রিয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ অচল হয়ে পড়ে। সকল কার্যক্রম বঙ্গবন্ধুর নির্দেশেই পরিচালিত হতে থাকে। ইয়াহিয়া খান সমস্যা নিরসনের লক্ষে ১০ মার্চ ঢাকায় সকল নেতৃবৃন্দের এক গোল টেবিল বৈঠক আহ্বান করেন। বঙ্গবন্ধু এ আহ্বান প্রত্যাখ্যান করে বলেন, 'বাঙালির তাজা রক্ত মাড়িয়ে আমি কোন সম্মেলনে বসতে পারি না।"

পরিস্থিতি খারাপ দেখে ৬ মার্চ ইয়াহিয়া খান পুনরায় ২৫ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বানের ঘোষণা দিয়ে নতুন কৌশল গ্রহণ করেন। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে অনুষ্ঠিত বিশাল জনসভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এক ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। এ ভাষণ বাঙালি জাতির ইতিহাসে এক স্মরণীয় দলিল। পৃথিবীর রাজনৈতিক ইতিহাসে সর্বকালের অন্যতম সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষণ হিসেবে খ্যাত। তিনি লাখ লাখ জনতার উদ্দেশ্যে স্বাধীনতার প্রস্তুতি নেওয়ার আহ্বান জানান। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, "...ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে। ..... তিনি আরও বলেন, "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম; এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম; রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরও দেব; তবু এদেশকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশালাহ।" বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের পর অসহযোগ আন্দোলন থেকে স্বাধীনতা সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ হয়ে বাঙালিরা মিছিলে মিছিলে সারা দেশ প্রকম্পিত করে তোলেন। শ্লোগান ওঠে 'তোমার আমার ঠিকানা– পদ্মা মেঘনা যমুনা', 'ছয় দফা নয় এক দফা, স্বাধীনতা, স্বাধীনতা' বীর বাঙালি অস্ত্রধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর। প্রকৃতপক্ষে ৭ মার্চের ভাষণে বঙ্গবন্ধু, যাকে বহির্বিশ্বের সাংবাদিক পক্ষ "Poet of Politics" বা রাজনীতির কবি বলে অভিহিত করেছিলেন, বাঙালিদের স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের আহ্বান জানান। এভাবেই বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনের পথ ধরে অসহযোগ আন্দোলন পরিণত হয় স্বাধীনতা আন্দোলনে।

একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধ

১৯৭১ সালের ১৫ মার্চ ইয়াহিয়া খান ঢাকায় আসেন। ১৬ মার্চ থেকে ঢাকায় মুজিব-ইয়াহিয়া বৈঠক শুরু হয়। পরবর্তিতে পাকিস্তান পিপলস পার্টির (পিপিপি) নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো ও পশ্চিম পাকিস্তানের শীর্ষস্থানীয় নেতাগণ আলোচনায় যোগ দেন। আলোচনার পাশাপাশি আওয়ামী লীগের অসহযোগ আন্দোলনও চলতে থাকে। কিন্তু ইয়াহিয়া, ভুট্টো আলোচনার নাম করে গোপনে পূর্ব বাংলায় সামরিক সরঞ্জামসহ সেনাবাহিনী আনার কাজটি সুসম্পন্ন করেন। ১৭ মার্চ জেনারেল টিক্কা খান সামরিক বৈঠকে বাঙালি হত্যার নীল নকশা প্রণয়ন করেন। ১৯ মার্চ সামরিক বাহিনী জয়দেবপুরে গুলিবর্ষণ ও কারফিউ জারি করে। ১৯৭১ সালের ২৩ মার্চ পাকিস্তান প্রজাতন্ত্র দিবসে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের আহ্বানে বাংলাদেশের ঘরে ঘরে স্বাধীন বাংলার জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে ছাত্রলীগ নেতারা পাকিস্তানের পতাকার পরিবর্তে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করে। আওয়ামী লীগ 'প্রতিরোধ দিবস' পালন করে। ২৪ মার্চ আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ সংকট সমাধানের লক্ষে শেষ চেষ্টা করেন। কিন্তু ২৫ মার্চ ইয়াহিয়া খান কোনরকম ঘোষণা না দিয়েই সদলবলে ঢাকা ত্যাগ করেন এবং ঐ রাতেই পাকিস্তানি সেনাবাহিনী নিরস্ত্র বাঙালিদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। পাকিস্তানি বাহিনী ঢাকাসহ অন্যান্য শহরে হাজার হাজার নিরীহ নিরস্ত্র বাঙালিকে নির্মমভাবে হত্যা করে। ২৫ মার্চ মধ্যরাতে বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানি সৈন্যদের হাতে বন্দি হওয়ার পূর্বেই ওয়ারলেসের মাধ্যমে চট্টগ্রামের ঘনিষ্ঠ সহকর্মীদের নিকট বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা পৌঁছে দেন এবং তা প্রচারের নির্দেশ দেন। বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণাটি ছিল ইংরেজিতে। আওয়ামী লীগ নেতা এম. এ. হান্নান স্বাধীনতার ঘোষণা বার্তার বাংলা অনুবাদ করেন। স্বাধীনতা ঘোষণার বঙ্গানুবাদ নিম্নরূপ–

"পাকিস্তানের সেনাবাহিনী অতর্কিতে পিলখানার ই.পি.আর ঘাঁটি ও রাজারবাগ পুলিশ ফাঁড়ি আক্রমণ করেছে এবং শহরের লোকদের হত্যা করেছে। ঢাকা ও চট্টগ্রামের রাস্তায় রাস্তায় যুদ্ধ চলছে। আমি বিশ্বের জাতিসমূহের কাছে সাহায্যের আবেদন করছি। আমাদের যোদ্ধারা বীরত্বের সঙ্গে মাতৃভূমি মুক্ত করার জন্য শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করছে। সর্বশক্তিমান আল্লাহর নামে আপনাদের কাছে আমার আবেদন ও আদেশ দেশকে স্বাধীন করার জন্য শেষ রক্তবিন্দু থাকা পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যান। কোন আপস নেই। জয় আমাদের হবেই। আমাদের পবিত্র মাতৃভূমি থেকে শত্রুকে বিতাড়িত করুন। সকল আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মী এবং অন্যান্য দেশপ্রেমিক ও স্বাধীনতা প্রিয় লোককে এ সংবাদ পৌঁছে দিন। আল্লাহ্ আপনাদের মঙ্গল করুন। জয় বাংলা। (*New York Times*, 16th January, 1972)।

ঘোষণা বার্তাটি চট্টগ্রাম শহরে রাতেই বিলি করা হয় এবং মাইকে প্রচার করা হয়। ২৬ মার্চ সকালেই স্বাধীনতার এই ঘোষণা চট্টগ্রাম শহরের সর্বত্র এবং গ্রামেও প্রচারিত হয়। পাকিস্তানি সৈন্যদের হাতে গ্রেফতার হওয়ার পূর্বেই মধ্যরাতের পর ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা করেন। ২৬ মার্চ চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে ঘোষণাটি বঙ্গবন্ধুর নামে আওয়ামী লীগ নেতা এম. এ. হান্নান প্রচার করেন। চট্টগ্রামের কয়েকজন বেতার-কর্মী ও শিল্পী কালুরঘাট অস্থায়ী বেতারকেন্দ্রে চালু করেন। উক্ত বেতার কেন্দ্র থেকে (আগ্রাবাদ) ২৬ মার্চ সর্বপ্রথম এম. এ হান্নান বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেন।

স্বাধীনতা যুদ্ধের কৌশলগত কারণে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা একজন সামরিক কর্মকর্তার দ্বারা পাঠ করার গুরুত্ব অনুধাবন করেন। ঐ সময় চট্টগ্রামে কর্মরত নিকটস্থ সামরিক কর্মকর্তার মধ্যে মেজর জিয়াউর রহমানকে এ ব্যাপারে অনুরোধ করা হয়। ১৯৭১ সালের ২৭ মার্চ সন্ধ্যায় কালুরঘাট স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে মেজর জিয়া বঙ্গবন্ধুর পক্ষে ইংরেজিতে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেন। এ ব্যাপারে বাংলাদেশে নানারূপ তর্ক-বিতর্ক ও বিভ্রান্তিকর আলোচনা বর্তমান। যার পরিপ্রেক্ষিতে ২০০৮ সালে হাইকোর্ট বঙ্গবন্ধুকে স্বাধীনতার ঘোষক হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে আইনগতভাবে বৈধতা প্রদান এবং সৃষ্ট বিতর্কের অবসান ঘটান।

১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল মুজিবনগরে (মেহেরপুর জেলার বৈদ্যনাত তলার আম্রকানন) আওয়ামী লীগের নির্বাচিত গণ প্রতিনিধিরা বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা এর আদেশনামা জারি করে এবং স্বাধীন গণপ্রজাতন্ত্রী

বাংলাদেশের 'প্রবাসী সরকার' গঠন করেন। ১৭ এপ্রিল নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার শপথ গ্রহণ করে। প্রবাসী সরকার গঠনের সাথে সাথে বাংলাদেশের জনগণ পালিয়ে নানা প্রতিকূল পথ ধরে দলে দলে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ।

মুজিবনগর অস্থায়ী সরকারের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা হলেন :

১. রাষ্ট্রপতি–বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
২. উপরাষ্ট্রপতি–সৈয়দ নজরুল ইসলাম (অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি)
৩. প্রধানমন্ত্রী–তাজউদ্দিন আহমেদ
৪. পররাষ্ট্র দপ্তর–খন্দকার মোশতাক আহমেদ
৫. অর্থ দপ্তর–ক্যাপ্টেন (অব:) মনসুর আলী
৬. স্বরাষ্ট্র ও পুনর্বাসন–এ.এইচ.এম. কামরুজ্জামান
৭. সেনাবাহিনী প্রধান–কর্নেল (অব:) এম. এ. জি. ওসমানী
৮. সেনাবাহিনীর উপপ্রধান–কর্নেল (অব:) এ. রব

অস্থায়ী সরকারের প্রতি অনুগত থেকে মুক্তিযোদ্ধারা ক্রমান্বয়ে সংগঠিত হয়ে রণাঙ্গণে পাক হানাদার বাহিনী এবং তাদের এদেশের দোসরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। গেরিলা যুদ্ধ, সম্মুখ যুদ্ধ, চোরাগোপ্তা হামলা প্রভৃতি নানা কৌশলের সমন্বয় করে সেনাপ্রধান আতাউল গনি ওসমানীর নেতৃত্বে যুদ্ধ চলে। পানিতে, আকাশে লড়াই চলে। সুষ্ঠু ও সুসংগঠিতভাবে যুদ্ধ পরিচালনার জন্য বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে বিভক্ত করা হয়। প্রত্যেক সেক্টরের একজন করে সেক্টর কমাণ্ডারের নির্দেশনায় যুদ্ধ পরিচালিত হয়। ১৯৭১ সালের নভেম্বরে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীও গড়ে ওঠে আনুষ্ঠানিকভাবে। নিয়মিত সেনা ব্যাটালিয়ান, সেক্টর ট্রুপস, মুক্তিবাহিনী, মুক্তিফৌজ, গেরিলা বাহিনী, নামে এরা মুক্তিযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। এর মধ্যে গেরিলা বাহিনীর ভূমিকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রশংসনীয়। গেরিলাদের মধ্যে ছাত্র-ছাত্রী- কৃষক-শ্রমিকের সংখ্যাই ছিল সবচেয়ে বেশি। এদের রণকৌশলও ছিল অভিনব ও নানামুখি।

এছাড়াও বাংলাদেশের ছাত্র, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, কবি-সাহিত্যিক লেখকের লেখনী, প্রচার, বক্তৃতা বিশ্বব্যাপী আলোড়ন তোলে। রেডিও, পত্র-পত্রিকা ও গোপন প্রচার পুস্তিকা মারফত দেশের ভিতরে এবং বিদেশে জনমত মুক্তিযুদ্ধের অনুকূলে ও হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীর বিপক্ষে যেতে থাকে। এভাবে প্রচার সংগঠন, জনমতের জোয়ার বিবিসি'র সংবাদ, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অব্যাহত প্রচার এবং গেরিলা ও সম্মুখ যুদ্ধে পর্যুদস্ত হয়ে পড়ে পাক হানাদার বাহিনী এবং তাঁদের এদেশীয় দোসররা। শুরু হয় বাংলাদেশকে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বিভিন্ন দেশের স্বীকৃতি প্রদান। মিত্র দেশ ভারত ৬ ডিসেম্বর 'বাংলাদেশ'কে স্বীকৃতি দিয়ে মুক্তিবাহিনীর সাথে যৌথভাবে পাকিস্তানি আক্রমণের জবাবে পাল্টা আক্রমণ শুরু করে। ফলে পাকিস্তানিরা এক পর্যায়ে আত্মসমর্পন করতে বাধ্য হয়। এভাবেই ৩০ লক্ষ শহীদের প্রাণের বিনিময়ে, ২ লাখ মা-বোনের সম্ভ্রম হারানোর বিনিময়ে, বিস্তর সহায় সম্পদ হারানোর বিনিময়ে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করে। বিশ্বের মানচিত্রে বাংলাদেশ স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। পাক হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে ১৬ ডিসেম্বর বাঙালির বিজয় দিবসে পরিণত হয়।

সারসংক্ষেপ

২৪ বছরের ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ, অত্যাচার, নিপীড়ন, বঞ্চনা বাঙালিদের ক্ষুব্ধ বিক্ষুব্ধ করে তোলে। তাই বাঙালিরা প্রতিবাদ, প্রতিরোধ, আন্দোলন সংগ্রামের পথ ধরে সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীনতা যুদ্ধ পরিচালনা করে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে দেশ স্বাধীন করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

(ক) নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। ১৯৭১ সালে প্রকৃতপক্ষে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়–

(ক) ১২ জানুয়ারি (খ) ৩ মার্চ

(গ) ১ ফেব্রুয়ারি (ঘ) ১ মার্চ

২। ১৯৭১ সালে পাক হানাদার বাহিনী নিরস্ত্র বাঙালির উপর গণ-হত্যা শুরু করে-

(ক) ২৬ মার্চ (খ) ২৭ মার্চ

(গ) ২৫ মার্চ (ঘ) ২ মার্চ

৩। স্বাধীন বাংলার 'অস্থায়ী সরকার' গঠিত হয়–

(ক) ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল (খ) ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ

(গ) ১৯৭১ সালের ১২ এপ্রিল (ঘ) ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ

(খ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১। বঙ্গবন্ধু কর্তৃক ঘোষিত স্বাধীনতার বাণীটি লিখুন।

(গ) রচনামূলক প্রশ্ন

১। ১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিন।

২। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ সম্পর্কে বর্ণনা করুন।

(ক) উত্তরমালা

১। খ, ২। গ, ৩। ক

ইউনিট
১৬

বাংলাদেশের সংবিধান

ভূমিকা

সংবিধান হচ্ছে রাষ্ট্রের প্রতিচ্ছবি। কেননা একটি রাষ্ট্রকে তার সংবিধান দ্বারা জানা যায়। রাষ্ট্রের স্বরূপ, সরকারের ধরন এবং নাগরিকের অধিকারের প্রকৃতি জানার জন্য সংবিধান পাঠ আবশ্যক। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করে। ১৯৭২ সালের ২৩ মার্চ বাংলাদেশের জন্য একটি সংবিধান রচনার লক্ষ্যে ১০ এপ্রিল ৪৩০ জন সদস্য বিশিষ্ট গণ-পরিষদের প্রথম অধিবেশন বসে। এদের মধ্য থেকে ৩৪ জন সদস্য নিয়ে একটি খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটি গঠন করা হয়। ১৯৭২ সালে ১২ অক্টোবর খসড়া সংবিধান বিল গণ-পরিষদের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে পেশ করা হয়। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় পাঠের পর ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান বলবৎ করা হয়।

বর্তমান ইউনিটে নিম্নোক্ত পাঠসমূহ আলোচনা করা হলো :

পাঠ-১ : বাংলাদেশের সংবিধান ও রাষ্ট্রীয় মূলনীতি।
পাঠ-২ : বাংলাদেশ সংবিধানে মৌলিক অধিকার।
পাঠ-৩ : বাংলাদেশ সংবিধানে রাষ্ট্রীয় কাঠামো সরকার ব্যবস্থা ও জাতীয় সংসদ।
পাঠ-৪ : বাংলাদেশের সংবিধানের সংশোধন সমূহ।

পাঠ-১ : বাংলাদেশের সংবিধান ও রাষ্ট্রীয় মূলনীতি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- ১৯৭২ সালের মূল সংবিধানের বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।
- বাংলাদেশ রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

১৯৭২ সালের মূল সংবিধানের বৈশিষ্ট্য

১৯৭২ সালের মূল সংবিধান গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের একটি মূল দলিল। এ সংবিধানটি উৎকৃষ্ট এবং বিভিন্ন দিক দিয়ে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। এর প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ–

১. **লিখিত দলিল** : মূল সংবিধান একটি সুলিখিত দলিল। এতে ১টি প্রস্তাবনা, ৪টি তফসিল, ১১টি ভাগ এবং ১৫৩টি অনুচ্ছেদ আছে।

২. **দুষ্পরিবর্তনীয়** : বাংলাদেশের সংবিধান দুষ্পরিবর্তনীয়। তবে সংশোধন পদ্ধতি খুব কঠিন নয়। সংসদের দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে সংবিধানে প্রয়োজনীয় সংশোধনী প্রস্তাব পাস করানো যায়।

৩. **রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি** : সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগে জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা-এই চারটি মূলনীতিকে সংবিধানের মূল স্তম্ভ হিসেবে উল্লেখ করা হয়।

৪. **মৌলিক অধিকার** : সংবিধানের জনগণের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। রাষ্ট্রের নাগরিকদের ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য সংবিধানে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

৫. **এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র** : সংবিধানে বাংলাদেশকে একটি এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। কেন্দ্রিয় সরকারই সব ক্ষমতার অধিকারী। কেন্দ্রিয় আইনসভাই সার্বভৌম আইন প্রণয়নকারী সংস্থা।

৬. **প্রজাতন্ত্র** : বাংলাদেশ একটি প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র। রাষ্ট্রপতি হবেন রাষ্ট্রপ্রধান এবং তাঁর নামে রাষ্ট্রের শাসন কার্য পরিচালিত হবে। রাষ্ট্রপ্রধান জাতীয় সংসদের সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত হবেন।

৭. **এক-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা** : সংবিধানে দেশের জন্য একটি এক-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার বিধান করা হয়। ৩০০ জন নির্বাচিত ও ১৫ জন সংরক্ষিত মহিলা আসনসহ মোট ৩১৫ জন সদস্য নিয়ে জাতীয় সংসদ গঠিত হবে। পরবর্তীতে সংরক্ষিত মহিলা আসন বৃদ্ধি করে ৩০ জন এবং চতুর্দশ সংশোধনীতে বৃদ্ধি করে তা ৪৫ করায় বর্তমানে সংসদ সদস্য সংখ্যা ৩৪৫ জন।

৮. **সংসদীয় পদ্ধতির সরকার** : মূল সংবিধানে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের প্রধানকে প্রধানমন্ত্রী করে তার মন্ত্রিপরিষদকে দেশের প্রকৃত শাসক করা হয়। মন্ত্রিপরিষদ সকল কাজের জন্য সংসদের নিকট জবাবদিহি করবে।

৯. **বিচার বিভাগের স্বাধীনতা** : সংবিধানে বাংলাদেশের জন্য একটি সর্বোচ্চ আদালত গঠনের ব্যবস্থা করা হয়। সুপ্রীম কোর্ট হবে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালত। এই আদালত সংবিধানের প্রাধান্য নিশ্চিত করবে এবং তার স্বাধীনতা সংরক্ষণ করবে।

১০. **ন্যায়পাল** : সরকারি যে কোন কর্তৃপক্ষের কাজের নিরপেক্ষ তদন্তের জন্য সংবিধানে ন্যায়পালের পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। ন্যায়পাল যে কোন বিষয়ে নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করতে পারবেন।

১১. **সাংবিধানিক প্রাধান্য** : সংবিধান রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন। প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ এবং জনগণের পক্ষে ঐসব ক্ষমতার প্রয়োগ কেবল সংবিধানের অধীনে ও কর্তৃত্বে কার্যকর হবে।

১৯৭২ সালের মূল সংবিধান একটি উত্তম সংবিধান। ১৯৭২ থেকে বর্তমান পর্যন্ত ১৪ বার এ সংবিধান সংশোধন করা হয়েছে। বর্তমানে পঞ্চম সংশোধনী আদালত কর্তৃক বাতিল হওয়ায় মূল সংবিধান অনেকটাই পূর্বের বৈশিষ্ট্য ফিরে পাবে।

রাষ্ট্রীয় মূলনীতি

ভারত এবং আয়ারল্যাণ্ডের ন্যায় বাংলাদেশের সংবিধানেও রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য কতগুলো মৌলিক নীতি নির্ধারণ করা হয়েছে। এ নীতিগুলো রাষ্ট্র শাসনের মূলসূত্র। সরকারের কর্তব্য হলো রাষ্ট্রীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে এগুলো প্রয়োগ করা। মূল সংবিধানের 'দ্বিতীয় ভাগে' রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি শিরোনামে ৮ থেকে ২৫ অনুচ্ছেদ পর্যন্ত মূলনীতিগুলো লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এগুলো হল জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা। নিম্নে মূলনীতিগুলো আলোচনা করা হলো :

ক. **জাতীয়তাবাদ :** মূল সংবিধানের ৯নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে যে, "ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ বাঙালি জাতি ঐক্যবদ্ধ ও সংকল্পবদ্ধ সংগ্রাম করে জাতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জন করেছে। বাঙালি জাতির সেই ঐক্য ও সংহতি হবে বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তি।" বাঙালি জাতি তাদের ভাষা ও সংস্কৃতির দ্বারা ঐক্যবদ্ধ একটি আলাদা জনগোষ্ঠী। এ স্বাতন্ত্র্যবোধ সম্পর্কে সচেতন বাঙালি জাতি ঐক্যবদ্ধভাবে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বিশ্বের মানচিত্রে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র গড়ে তুলেছে। বাঙালি জাতীয়তাবাদ বাঙালির পথপ্রদর্শক ও অগ্রগতির প্রেরণা।

খ. **সমাজতন্ত্র :** মূল সংবিধানের ১০ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "মানুষের উপর মানুষের শোষণের অবসান ঘটিয়ে ন্যায়ানুগ সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে শোষণহীন সমাজ কায়েম করা হবে।"

সমাজতন্ত্রকে রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করার লক্ষ্য ছিল মূলত মেহনতি মানুষকে সকল প্রকার শোষণ হতে মুক্তি দেয়া। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে গণতান্ত্রিক পথে। এজন্য শ্রেণীসংগ্রাম কিংবা বিপ্লবের প্রয়োজন নেই। আইনের আরোপিত সীমার মধ্যে ব্যক্তিগত মালিকানা থাকবে।

গ. **গণতন্ত্র :** সংবিধানের ১১ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ হবে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। যেখানে মৌলিক মানবাধিকার, স্বাধীনতার নিশ্চয়তা এবং মানবসত্তার মর্যাদার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত হবে। রাষ্ট্রীয় সকল কাজে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করাই ছিল এর উদ্দেশ্য। প্রাপ্তবয়স্কদের সর্বজনীন ভোটাধিকারের মাধ্যমে সরকার নির্বাচিত হবে। সমাজজীবন হতে সর্বপ্রকার বৈষম্য দূরীভূত করে নাগরিকদের মৌলিক মানবিক অধিকার এবং ব্যক্তি স্বাধীনতার নিশ্চয়তা বিধান করা হবে।

ঘ. **ধর্ম নিরপেক্ষতা :** সংবিধানের ১২ নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে যে, "রাষ্ট্র কর্তৃক কোন ধর্মকে রাজনৈতিক মর্যাদা, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে কোন ধর্মের ব্যবহার, কোন বিশেষ ধর্ম পালনকারী ব্যক্তির বৈষম্য বা তার উপর উৎপীড়ন করা হবে না।"

মানুষ যাতে নিজ নিজ ধর্ম পালন করতে পারে এবং কেউ যাতে কারো ধর্ম-পালনে বাধা সৃষ্টি করতে না পারে সেজন্য ধর্মনিরপেক্ষতাকে রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করা হয়। রাষ্ট্রের দৃষ্টিতে সকল ধর্ম সমান। জনগণের পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা থাকবে। ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাই যাতে নিজ নিজ ধর্ম পালন, প্রচার ও অনুশীলন করতে পারে। সে ব্যাপারে রাষ্ট্রের নিশ্চয়তা প্রদানের লক্ষে ধর্ম নিরপেক্ষতাকে সংবিধানের মূলনীতি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ ধর্মকে অস্বীকার করা নয়, ধর্মহীনতাও নয়।

এছাড়াও বাংলাদেশ সংবিধানের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে অর্থনৈতিক নীতি সংক্রান্ত ১৪, ১৭ ও ১৮ অনুচ্ছেদে সামাজিক নীতি সংক্রান্ত ২০, ২২, ২৩ ও ২৪ অনুচ্ছেদে আইন ও শাসন ব্যবস্থা নীতি সংক্রান্ত এবং ২৫ অনুচ্ছেদে পররাষ্ট্রনীতি সংক্রান্ত মূলনীতি উল্লেখ রয়েছে।

রাষ্ট্রীয় মালিকানা নীতি, কৃষক শ্রমিকের মুক্তি, মৌলিক প্রয়োজনের ব্যবস্থা, গ্রামীণ উন্নয়ন ও কৃষি বিপ্লব অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য ও নৈতিকতা, সুযোগের সমতা, নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য রূপে কর্ম, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, জাতীয় সংস্কৃতি ও জাতীয় স্মৃতি ও নিদর্শন সংরক্ষণ এবং আন্তর্জাতিক নীতি ইত্যাদি নীতিসমূহকেও রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে সংবিধানে উল্লেখ রয়েছে।

রাষ্ট্রীয় মূলনীতির সংশোধনী

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট এক সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করার পর ১৯৭৯ সালের ৬ এপ্রিল পর্যন্ত বাংলাদেশে সমারিক আইন বলবৎ ছিল। এ সময়ের মধ্যে প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান আদেশ, অধ্যাদেশ, ঘোষণা ও সামরিক আইন-বিধি এবং অন্যান্য আইন ও আদেশের মাধ্যমে সংবিধানের কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধন করেন। ১৯৭৯ সালের জাতীয় সংসদে 'পঞ্চম সংশোধনীর' মাধ্যমে এগুলো বৈধ করে নেওয়া হয়। এই পঞ্চম সংশোধনীতে সংবিধানের অন্যান্য পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রীয় মূলনীতির ক্ষেত্রেও ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করা হয়। পরিবর্তনগুলো নিম্নরূপ–

ক. ১৯৭২ সালের মূল সংবিধানে বাংলাদেশে শোষণমুক্ত সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সমাজতন্ত্রকে রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে সংবিধানে উল্লেখ করা হয়েছিল। কিন্তু পঞ্চম সংশোধনীতে 'সমাজতন্ত্রের' ব্যাখ্যা দেওয়া হয় 'সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার'।

খ. রাষ্ট্রীয় মূলনীতি 'ধর্ম নিরপেক্ষতার' স্থলে 'সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস' এ কথাগুলো সবিধানে সংযোজন করা হয়।

গ. মূল সংবিধানের অন্যতম মূলনীতি 'বাঙালি জাতীয়তাবাদের' পরিবর্তে 'বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ' শব্দটি সংবিধানে সংযোজন করা হয়।

২০০৫ সালের ২৯ আগস্ট সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী অবৈধ ও বাতিল ঘোষণা করে হাইকোর্ট এক রায় প্রদান করে। আপিল বিভাগ ২০১০ সালের ২ ফেব্রুয়ারি কিছু পযর্বক্ষেণ ও সংশোধনের কথা বলে হাইকোর্টের রায় বহাল রাখে। হাইকোর্ট এবং আপিল বিভাগের রায়ের প্রেক্ষিতে রাষ্ট্রীয় মূলনীতি অনেকটাই পূর্বের অবস্থায় চলে গিয়েছে।

সারসংক্ষেপ

১৯৭২ সনের মূল সংবিধানে রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতি ঘোষণার মধ্য দিয়ে জাতির আদর্শের প্রতিফলন ঘটেছে। সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে পরিবর্তিত রাষ্ট্রীয় মূলনীতি পুনরায় পঞ্চম সংশোধনী বাতিলের ফলে পুনঃস্থাপিত হয়েছে এবং বাংলাদেশের গণ মানুষের সামগ্রিক আকাঙ্ক্ষা ও ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

(ক) নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বাংলাদেশের মূল সংবিধান কার্যকর হয়–

(ক) ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর (খ) ১৯৭০ সালের ১৪ ডিসেম্বর

(গ) ১৯৭৩ সালের ২৬ মার্চ (ঘ) ১৯৭২ সালের ২৫ মার্চ

২। বাংলাদেশ সংবিধানে রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতিসমূহের উল্লেখ রয়েছে–

(ক) সংবিধানের চতুর্থ ভাগে (খ) সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগে

(গ) সংবিধানের প্রথম ভাগে (ঘ) সংবিধানের পঞ্চম ভাগে

(খ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। রাষ্ট্রীয় মূলনীতিগুলো কী কী?

(গ) রচনামূলক প্রশ্ন

১। বাংলাদেশের সংবিধানের বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করুন।

২। সংশোধনীসহ রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিসমূহ আলোচনা করুন।

(ক) উত্তরমালা

১। (ক), ২। (খ)।

পাঠ-২ : বাংলাদেশ সংবিধানে মৌলিক অধিকার

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- বাংলাদেশ সংবিধানে বর্ণিত মৌলিক অধিকারের বিবরণ দিতে পারবেন।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, ভারত প্রভৃতি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে মৌলিক অধিকারসমূহ সংবিধানে সন্নিবেশিত রয়েছে। তেমনি বাংলাদেশ সংবিধানের তৃতীয় ভাগে ২৭ অনুচ্ছেদ থেকে ৪৭ অনুচ্ছেদ পর্যন্ত মৌলিক অধিকারগুলো লিপিবদ্ধ রয়েছে। সংবিধানে উল্লেখিত মৌলিক অধিকারসমূহ নিম্নে বর্ণিত হল–

১। **আইনের চোখে সমতা :** সকল নাগরিক আইনের চোখে সমান এবং সকলেই আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী।

২। **ধর্ম প্রভৃতি কারণে বৈষম্যহীনতা :** ধর্ম, বর্ণ, গোষ্ঠী, লিঙ্গ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করবে না। রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী-পুরুষ সমান অধিকার লাভ করবে।

৩। **সরাকারি নিয়োগ লাভে সুযোগের সমতা :** প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ-লাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকবে। ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষ বা জন্মস্থানের কারণে নাগরিকদের প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগের সুযোগের সমতার ক্ষেত্রে বৈষম্য প্রদর্শন করা যাবে না।

৪। **উপাধি, সম্মান ও ভূষণের বিলোপসাধন :** রাষ্ট্র কোন উপাধি, সম্মান বা ভূষণ প্রদান করবে না। তবে সাহসিকতার জন্য পুরস্কার বা একাডেমিক পুরস্কার গ্রহণের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য হবে না।

৫। **আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার :** আইনের আশ্রয় লাভ করার অধিকার বাংলাদেশের সকল নাগরিকের এবং সাময়িকভাবে বাংলাদেশে অবস্থানরত অপরাপর ব্যক্তির অবিচ্ছেদ্য অধিকার। এজন্য আইনানুযায়ী কোন ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা, দেহ, সুনাম বা সম্পত্তির হানি ঘটে এরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে না।

৬। **জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতার রক্ষণ :** আইনানুযায়ী জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতা হতে কোন ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা যাবে না।

৭। **গ্রেপ্তার ও আটক সম্পর্কে রক্ষাকবচ :** কোন গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তারের কারণ জ্ঞাপন না করে আটক রাখা যাবে না।

৮। **জবরদস্তি শ্রম নিষিদ্ধকরণ :** সকল প্রকার জবরদস্তি শ্রম নিষিদ্ধ এবং এ বিধান কোনভাবে লঙ্ঘিত হলে তা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য হবে।

৯। **বিচার ও দণ্ড সম্পর্কে রক্ষণ :** সংবিধানের ৩৫ নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ রয়েছে এক অপরাধের জন্য কোন ব্যক্তিকে একাধিকবার গ্রেফতার কিংবা দণ্ড দেয়া যাবে না।

১০। **চলাফেরার স্বাধীনতা :** জনস্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধা-নিষেধ সাপেক্ষে বাংলাদেশের সর্বত্র অবাধ চলাফেরা, এর যে কোন স্থানে বসবাস এবং বাংলাদেশ ত্যাগ ও বাংলাদেশে পুনঃপ্রবেশ করার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকবে।

১১। **সমাবেশের স্বাধীনতা :** জনশৃঙ্খলা বা জনস্বাস্থ্যের স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধা-নিষেধ সাপেক্ষে শান্তিপূর্ণভাবে ও নিরস্ত্র অবস্থায় সমবেত হবার এবং জনসভা ও শোভাযাত্রায় যোগদান করার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকবে।

১২। **চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা এবং বাকস্বাধীনতা :**

ক. চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়,

খ. প্রত্যেক নাগরিকের বাকস্বাধীনতা ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতা থাকবে এবং

গ. সংবাদপত্রের স্বাধীনতা থাকবে।

১৩। **সম্পত্তির অধিকার :** আইনের দ্বারা আরোপিত বাধা-নিষেধ সাপেক্ষে প্রত্যেক নাগরিকের সম্পত্তি অর্জন, ধারণ, হস্তান্তর ও অন্যভাবে বিধি-ব্যবস্থা করার অধিকার থাকবে। আইনের কর্তৃত্ব ব্যতীত কোন সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ, রাষ্ট্রায়ত্ত বা দখল করা যাবে না।

১৪। **মৌলিক অধিকার বলবৎকরণ :** মৌলিক অধিকারসমূহ বলবৎ করার জন্য সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদের (১) দফা অনুযায়ী সুপ্রিম কোর্টের নিকট মামলা রুজ্জু করার অধিকার নিশ্চিত করা হয়।

১৫। **ধর্মীয় স্বাধীনতা :** আইন, জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতার সাপেক্ষে প্রত্যেক নাগরিকের যে কোন ধর্ম-অবলম্বন, পালন ও বা প্রচারের অধিকার থাকবে।

১৬। **পেশা ও বৃত্তির স্বাধীনতা :** আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধা-নিষেধ সাপেক্ষে প্রত্যেক নাগরিকের যে কোন আইনসঙ্গত পেশা বা বৃত্তি গ্রহণ এবং ব্যবসা পরিচালনার অধিকার থাকবে।

বাংলাদেশ সংবিধানের উপরিউক্ত মৌলিক অধিকারগুলো ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশে এবং বহুমুখী প্রতিভার স্ফুরণে সহায়ক। ব্যক্তির নৈতিকতা ও সামাজিক মূল্যবোধ বজায় রাখা, মানবিক জীবনকে সম্ভব করতে অনুকূল পরিবেশ ও সম্ভাবনা গড়ে তোলে। তবে সংবিধানের মৌলিক অধিকারগুলো নিরঙ্কুশ নয়। এর উপর নানা বাধা নিষেধ ও সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এছাড়াও জরুরি অবস্থায় মৌলিক অধিকার খর্ব করা যায়।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশ সংবিধানে প্রণীত মৌলিক অধিকারসমূহ আইনের শাসন, নাগরিক সমতা, সুযোগের সাম্য, মানবিকতা, মৌলিক চাহিদাসমূহের পরিপূরণ, ব্যক্তিসত্তার বিকাশ, সামাজিক মূল্যবোধ, বহুমুখী প্রতিভার বিকাশ এবং আধুনিক ও নিরাপদ জীবন যাপনে সহায়ক হতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

(ক) নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বাংলাদেশ সংবিধানের মৌলিক অধিকারসমূহের বর্ণনা রয়েছে-

(ক) ৭ থেকে ১৫ অনুচ্ছেদে (খ) ২৭ থেকে ৪৭ অনুচ্ছেদে

(গ) ১৭ থেকে ২২ অনুচ্ছেদে (ঘ) ৪৮ থেকে ৫৮ অনুচ্ছেদে

(খ) রচনামূলক প্রশ্ন

১। বাংলাদেশ সংবিধানে প্রদত্ত মৌলিক অধিকারসমূহের বর্ণনা দিন।

(ক) উত্তরমালা

১। (খ)

পাঠ-৩ : বাংলাদেশ সংবিধানে রাষ্ট্রীয় কাঠামো, সরকার ব্যবস্থা ও জাতীয় সংসদ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ও সরকার কাঠামোর বর্ণনা দিতে পারবেন।
- বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থা তথা সরকার পদ্ধতির বিবরণ দিতে পারবেন।
- বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের সদস্য সংখ্যা, গঠন ও কার্যাবলি সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

বাংলাদেশ একটি গণ-প্রজাতন্ত্র (Peoples Republic)। বাংলাদেশে এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়েছে। সংবিধান অনুসারে বাংলাদেশে রাষ্ট্র পরিচালনার সকল ক্ষমতা কেন্দ্রিয় সরকারের হাতে ন্যস্ত। বাংলাদেশের কোন অঙ্গরাজ্য, প্রদেশ বা জেমিনিয়ন নেই। বাংলাদেশে হাইকোর্টও এককেন্দ্রিক। এর কোন শাখা নেই। সম্পদের মালিকানার ক্ষেত্রে এদেশে ব্যক্তিগত, যৌথ (সমবায়) ও রাষ্ট্রীয় মালিকানা স্বীকৃত। সংবিধান অনুযায়ী বাংলাদেশে বিচার বিভাগ, শাসন বিভাগ থেকে পৃথক ও স্বাধীন।

রাষ্ট্রপতি (President) বাংলাদেশের শীর্ষ ক্ষমতাসীন ব্যক্তি। ওয়ারেন্ট অব প্রেসিডেন্স অনুযায়ীও রাষ্ট্রপতি সর্বোচ্চ সম্মানের অধিকারী। প্রজাতন্ত্রের সকল কর্মকাণ্ড রাষ্ট্রপতির নামে সম্পাদিত হয়। তিনি জাতীয় সংসদের সদস্যদের ভোটে পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হন। সাধারণ পন্থায় রাষ্ট্রপতিকে অপসারণ করা সম্ভব নয়। রাষ্ট্রপতিকে অপসারণের জন জন্য/ইমপিচমেন্ট দুই-তৃতীয়াংশ সংসদ সদস্যের ভোটে প্রয়োজন। সত্যিকার অর্থে বাংলাদেশে রাষ্ট্রপতি নামমাত্র শাসনতান্ত্রিক প্রধান। তিনি প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীসভার পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করেন। দেশে যুদ্ধাবস্থা বা আইন-শৃঙ্খলার চরম অবনতির প্রশ্নে রাষ্ট্রপতি 'জরুরি অবস্থা' ঘোষণা করতে পারেন। তবে সেক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ বা অনুরোধ থাকতে হবে। বাংলাদেশে রাষ্ট্রপতির পদমর্যাদা ভারতের রাষ্ট্রপতি বা ব্রিটেনের রানীর মতো।

বাংলাদেশে সংসদীয় সরকার পদ্ধতি বিদ্যমান। ১৮ বছর এবং তদুর্ধ বয়সের জনগণ জাতি-ধর্ম-বর্ণ-পেশা নির্বিশেষে ভোটাধিকার প্রয়োগ করে ৩০০ জন সংসদ সদস্য নির্বাচন করেন। এর বাইরে সংবিধানে সংরক্ষিত ৪৫টি আসনে নারী সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। জাতীয় সংসদে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের আসনের অনুপাতে নারী সংসদ সদস্যদের মনোনীত করে সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দল। ফলত জাতীয় সংসদে সর্বমোট আসন ৩৪৫টি। সংসদ সদস্যদের মেয়াদকাল তথা সংসদের মেয়াদকাল পাঁচ বছর। সংসদ সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। অর্থাৎ বাংলাদেশে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী উভয়ই পরোক্ষ পদ্ধতিতে নির্বাচিত। প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রীসভার অন্য মন্ত্রীদের মনোনয়ন দেন। প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে মন্ত্রীসভার সদস্যরা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন। দেশের শাসনভার নির্বাহী বিভাগের কাছে ন্যাস্ত। নির্বাহী বিভাগের প্রধান হিসাবে প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রিপরিষদকে নেতৃত্ব দেন। প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীসভা কার্যত শাসন বিভাগের সমস্ত ক্ষমতা ভোগ করেন। তারাই সরকার পরিচালনা করেন। মন্ত্রীসভা যৌথভাবে আইন বিভাগ তথা সংসদের কাছে দায়বদ্ধ। প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করলে সংসদ বিলুপ্ত হয়ে যায়।

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ এক কক্ষ (Uni-cameral) বিশিষ্ট আইনসভা। ইণ্ডিয়া কিংবা যুক্তরাষ্ট্রের মতো তা দ্বিকক্ষ (Bi-cameral) বিশিষ্ট নয়। জাতীয় সংসদ পরিচালনার জন্য স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার রয়েছেন। জাতীয় সংসদ আইন প্রণয়ন ছাড়াও শাসন সংক্রান্ত কিছু কার্যাবলি সম্পাদন করে। জাতীয় সংসদ মূলত সংসদীয় কমিটি দ্বারা ক্রিয়াশীল থাকে। জাতীয় সংসদ, সসদ্যদের দুই-তৃতীয়াংশ এর সমর্থনের ভিত্তিতে সংবিধান সংশোধন করতে পারে। তবে সংবিধানের মৌল কাঠামো (Basic structure) পরিবর্তনের ক্ষেত্রে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে সংশোধনী প্রস্তাব পাস হতে হবে। আবার সংবিধানের মূল চেতনার পরিপন্থী হলে জাতীয় সংসদ কর্তৃক গৃহীত সংশোধনী সুপ্রীম কোর্ট 'বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা (Judicial Review)' দ্বারা বাতিল করতে

পারে। এভাবে বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থা শাসন বিভাগ, আইন বিভাগ ও বিচার বিভাগের মধ্যে কিছুটা সাম্য প্রতিষ্ঠা হয়েছে। জাতীয় সংসদ সংবিধান সংশোধন, সংরক্ষণ ছাড়াও যুদ্ধ ঘোষণা এবং চুক্তি অনুমোদন সংক্রান্ত কাজ করে থাকে।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশে জাতীয় সংসদের মোট আসন সংখ্যা ৩৪৫টি। ৩০০ জন সদস্য জনগণের ভোটে নির্বাচিত হন। বাকিরা মনোনীত। সংসদ সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। বাংলাদেশের শাসন ক্ষমতা মূলত প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন মন্ত্রীসভার ওপর ন্যস্ত। রাষ্ট্রপতি নামমাত্র শাসনতান্ত্রিক প্রধান। তিনি প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীসভার পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করেন। তবে শাসনতান্ত্রিক সমস্ত কার্যাবলি রাষ্ট্রপতির নামে সম্পাদিত হয়। সংবিধান সংশোধনের একমাত্র ক্ষমতা জাতীয় সংসদের ওপর ন্যাস্ত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

(ক) নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বাংলাদেশ একটি –

(ক) গণতন্ত্র (খ) গণ-প্রজাতন্ত্র
(গ) অভিযানতন্ত্র (ঘ) শ্রমিকতন্ত্র

২। জাতীয় সংসদের সর্বমোট আসন

(ক) ৩০০ (খ) ৩৩০
(গ) ৩৪৫ (ঘ) ৩১০

৩। বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ

(ক) দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট (খ) তিন বক্ষ বিশিষ্ট
(গ) এক কক্ষ বিশিষ্ট (ঘ) কোনটি নয়

৪। বাংলাদেশের সরকার ব্যবস্থার ধরন

(ক) সংসদীয় (খ) রাষ্ট্রপতি শাসিত
(গ) রাজতন্ত্র (ঘ) মিশ্র

(খ) এক কথায় উত্তর দিন

১। সরাসরি ভোটে কতজন সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন?
২। সংবিধান কিভাবে সংশোধন করা যায়?
৩। মন্ত্রীপরিষদ কার নিকট দায়বদ্ধ?
৪। সমস্ত কর্মকাণ্ড কার নামে সম্পাদিত হয়?
৫। চুক্তি অনুমোদন করে কে?
৬। বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থা কেমন?

(গ) রচনামূলক প্রশ্ন

১। বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় কাঠামো, সরকার ব্যবস্থা ও সংসদ সম্পর্কে যা জানেন লিখুন।
২। বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করুন।

উত্তরমালা

১। (ক), ২। (গ), ৩। (গ), ৪। (ক)।

পাঠ-৪ : বাংলাদেশের সংবিধানের সংশোধনসমূহ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- বাংলাদেশ সংবিধানের সংশোধনীগুলো আলোচনা করতে পারবেন।
- সংবিধান সংশোধনের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য বর্ণনা করতে পারবেন।

সংবিধান সংশোধন প্রতিটি রাষ্ট্রেই একটি অনিবার্য বিষয়। সময়ের প্রয়োজনে সংবিধানে সংশোধনী আনা হয়। সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে সংবিধান সংশোধন না করে কোন উপায় থাকে না। বাংলাদেশের সংবিধান পরিবর্তনশীল, তবে তা দুষ্পরিবর্তনীয় প্রকৃতির। বিভিন্ন রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ সংবিধানে এ পর্যন্ত ১৪টি সংশোধনী আনা হয়েছে। জাতীয় সংসদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোটে সংবিধান সংশোধন করা যায়। নিম্নে বাংলাদেশে এ যাবৎকাল গৃহীত সংশোধনীসমূহ আলোচনা করা হলো :

প্রথম সংশোধনী

যুদ্ধপরাধীদের বিচারের জন্য বাংলাদেশ সংবিধানের প্রথম সংশোধনী গৃহীত হয়। সংবিধান কার্যকরের ৭ মাস পর ১৯৭৩ সালের ১৫ জুলাই প্রথম সংশোধনী বিল পাস হয়। এই সংশোধন অনুযায়ী গণহত্যা কিংবা মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের জন্য আইন প্রণয়নের বিধান রাখা হয়।

দ্বিতীয় সংশোধনী

এই সংশোধনীর দ্বারা দেশে 'জরুরি অবস্থা' জারির বিধান করা হয়। ১৯৭৩ সালের ২২ সেপ্টেম্বর এটি পাস হয়। এই সংশোধনীতে সংবিধানের ৩৩ অনুচ্ছেদ সংশোধন করে বিনা বিচারে যে কাউকে আটকের বিধান করা হয়। মূলত এ সংশোধনীর মাধ্যমে শাসন বিভাগ তথা নিরাপত্তা বাহিনীর ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

তৃতীয় সংশোধনী

এই সংশোধনীর মাধ্যমে বাংলাদেশ ভারতকে বেরুবাড়ি হস্তান্তর করে। এ হস্তান্তরের শর্ত ছিল ভারত দহগ্রাম-আঙ্গরপোতায় যাবার জন্য বাংলাদেশকে তিন বিঘা করিডোর প্রদান করবে। ১৯৭৪ সালের ২৮ নভেম্বর জাতীয় সংসদে এ সংশোধনী পাস হয়।

চতুর্থ সংশোধনী

চতুর্থ সংশোধনী বাংলাদেশের সাংবিধানিক ইতিহাসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই সংশোধনীর মাধ্যমে সংসদীয় গণতন্ত্রের বদলে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা চালু হয়। দেশে একটি জাতীয় রাজনৈতিক দল সৃষ্টি করা হয়। যার নাম ছিল বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক লীগ (বাকশাল)। ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী গৃহীত হয়।

পঞ্চম সংশোধনী

এই সংশোধনীর লক্ষ্য ছিল সামরিক সরকারকে বৈধতা দান। মূলত ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট থেকে ১৯৭৯ সালের ৬ এপ্রিল পর্যন্ত জারিকৃত সকল ফরমান, আদেশ ও সরকারের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের বৈধতা দেয়া হয় ৫ম সংশোধনীর মাধ্যমে। এই সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানের প্রস্তাবনায় বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম সংযোজন করা হয়। সংবিধানের চারটি মূলনীতিতেও পরিবর্তন আনা হয়। বাঙালি জাতীয়বাদের বদলে 'বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ' ধর্মনিরপেক্ষতার বদলে 'সর্বশক্তিমান আলাহর ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস' প্রতিস্থাপন করা হয়। এছাড়া সমাজতন্ত্রের বদলে 'অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায় বিচার অর্থে সমাজতন্ত্র' সংযোজন করা হয়।

ষষ্ঠ সংশোধনী

প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের মৃত্যু পরবর্তী রাজনৈতিক পরিস্থিতি মোকাবেলার সংবিধানের ষষ্ঠ সংশোধনী আনা হয়। এই সংশোধনীর মাধ্যমে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবদুস সাত্তারের রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচনের সুযোগ সৃষ্টি হয়। সংশোধনীতে রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতির দুটো অলাভজনক পদ বলে ঘোষণা দেয়া হয়। ১৯৮১ সালের ১ জুলাই এই সংশোধনী প্রস্তাব আনা হয়।

সপ্তম সংশোধনী

সামরিক একনায়ক হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের ক্ষমতা গ্রহণ ও শাসনকে বৈধতা দেয়ার জন্য সপ্তম সংশোধনী গৃহীত হয়। মূলত এই সংশোধনীর দ্বারা ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ থেকে ১৯৮৬ সালের ১০ নভেম্বর পর্যন্ত সামরিক সরকার ঘোষিত সকল ফরমান, আদেশ, অধ্যাদেশসহ সামরিক সরকারের গৃহীত যাবতীয় কর্মকাণ্ড বৈধতা পায়। ১৯৮৬ সালের ১০ নভেম্বর এ সংশোধনী গৃহীত হয়।

অষ্টম সংশোধনী

অষ্টম সংশোধনীর মাধ্যমে ইসলামকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ঘোষণা করা হয়। একই সঙ্গে হাইকোর্টের বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়। চট্টগ্রাম, বরিশাল, সিলেট, কুমিল্লা, যশোর ও রংপুরে হাইকোর্ট বিভাগের একটি করে স্থায়ী বেঞ্চ রাখার ব্যবস্থা করা হয়। হাইকোর্ট বিকেন্দ্রীকরণের বিধানটি পরবর্তীতে সুপ্রীম কোর্ট এক রায়ে বাতিল করে দেয়। ১৯৮৮ সালের ৭ জুন অষ্টম সংশোধনী গৃহীত হয়।

নবম সংশোধনী

নবম সংশোধনীর মাধ্যমে জনগণের সরাসরি ভোটে উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়। এর আগে রাষ্ট্রপতি সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হয়ে উপরাষ্ট্রপতিকে মনোনয়ন দিতেন। এ সংশোধনীর মাধ্যমে এ ব্যবস্থা বাতিল করা হয়। রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনের একই তারিখে ভোট গ্রহণের কথা বলা হয়।

দশম সংশোধনী

নারী সংসদ সদস্যদের সংরক্ষিত আসনের মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার প্রেক্ষাপটে জাতীয় সংসদের ৩০টি মহিলা আসন পুনরায় সংরক্ষণের বিধান করা হয়। একইসঙ্গে রাষ্ট্রপতির পদের মেয়াদ শেষ হবার ১৮০ দিনের মধ্যে রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচনের বিধান করা হয়। ১৯৯০ সালের ১০ জুন নবম সংশোধনী গৃহীত হয়।

একাদশ সংশোধনী

এ সংশোধনীর মাধ্যমে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালনের পর বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমদের স্বপদে ফিরে যাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়। এই সংশোধন অনুযায়ী প্রেসিডেন্ট এরশাদ কর্তৃক উপরাষ্ট্রপতি নিয়োগদানকে বৈধতা দেয়া হয়। সংবিধানের একাদশ সংশোধনী ১৯৯০ সালের ২ জুলাই গৃহীত হয়।

দ্বাদশ সংশোধনী

সংবিধানের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সংশোধনী দ্বাদশ সংশোধনী। এ সংশোধনীর মাধ্যমে দীর্ঘ ১৫ বছরের সামরিক, ছদ্ম সামরিক শাসন হতে মুক্ত হয়ে বাংলাদেশ সংসদীয় গণতন্ত্রের পথে অগ্রযাত্রা শুরু করে। গণভোটের মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগণ এ সংশোধনীকে বৈধতা ও অকুণ্ঠ সমর্থন দেয়। জাতীয় সংসদে ১৯৯০ সালের ৬ আগস্ট এ সংশোধনী গ্রহণ করা হয়।

ত্রয়োদশ সংশোধনী

এই সংশোধনীর মাধ্যমে নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। সংবিধানের ৫৮ অনুচ্ছেদে খ, গ এবং ঘ ধারা সংযোজনের মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা চালু করা হয়। এই সংশোধনী মোতাবেক, একজন প্রধান উপদেষ্টার নেতৃত্বে অনধিক ১০ জন উপদেষ্টার দ্বারা নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কথা বলা হয়। ১৯৯৬ সালের ২৭ মার্চ এ সংশোধনী জাতীয় সংসদে পাস হয়।

চতুর্দশ সংশোধনী

এই সংশোধনীর মাধ্যমে জাতীয় সংসদে ৪৫টি মহিলা আসন সংরক্ষণ করা হয়। জাতীয় সংসদে প্রতিনিধিত্বশীল রাজনৈতিক দলগুলোর প্রাপ্ত আসনের সমানুপাতে এসব আসন বণ্টনের বিধান করা হয়। চতুর্দশ সংশোধনীর মাধ্যমে একই সঙ্গে বিচারপতি ও মহা হিসাব নিরীক্ষকের অবসরের সময়সীমা ২ বছর বাড়ানো হয়।

সারসংক্ষেপ

স্বাধীনতার পর বিগত ৪ দশকে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে সংবিধানে ১৪টি সংশোধনী গৃহীত হয়েছে। এসব সংশোধনী বাংলাদেশের রাজনৈতিক গতিশীলতার প্রমাণ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

(ক) নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। এ পর্যন্ত সংবিধানে কতটি সংশোধনী হয়েছে?

(ক) ১১টি (খ) ১২টি

(গ) ১৩টি (ঘ) ১৪টি

২। কোন সংশোধনীর মাধ্যমে দেশে জরুরি অবস্থা জারির বিধান করা হয়?

(ক) প্রথম সংশোধনী (খ) দ্বিতীয় সংশোধনী

(গ) তৃতীয় সংশোধনী (ঘ) চতুর্থ সংশোধনী

৩। কোন সংশোধনীর মাধ্যমে সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রবর্তন করা হয়?

(ক) একাদশ সংশোধনী (খ) দ্বাদশ সংশোধনী

(গ) ত্রয়োদশ সংশোধনী (গ) চতুর্দশ সংশোধনী

৪। 'তত্ত্বাবধায়ক সরকার' ব্যবস্থা কোন সংশোধনীর মাধ্যমে চালু হয়?

(ক) একাদশ সংশোধনী (খ) দ্বাদশ সংশোধনী

(গ) ত্রয়োদশ সংশোধনী (গ) চতুর্দশ সংশোধনী

(খ) রচনামূলক প্রশ্ন

১। বাংলাদেশের সংবিধানের সংশোধনসমূহ সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

২। সংবিধানের প্রথম পাঁচটি সংশোধনী সম্পর্কে বিস্তারিত লিখুন।

৩। সংবিধানের শেষ পাঁচটি সংশোধনী সম্পর্কে বিস্তারিত লিখুন।

(ক) উত্তরমালা

১। (ঘ), ২। (খ), ৩। (খ), ৪। (গ)।

ইউনিট
১৭

বাংলাদেশ ও বহির্বিশ্ব

ভূমিকা

বাংলাদেশের সঙ্গে বহির্বিশ্বের সম্পর্কে অবগত হওয়া প্রতিটি সুনাগরিকের জন্য একান্ত দরকার। কেননা যান্ত্রিক সভ্যতার যুগে একের সঙ্গে অন্যের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে বিভিন্ন রাষ্ট্রের সম্পর্কের নীতিমালা বা ধরন সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। বর্তমান ইউনিটে নিম্নোক্ত পাঠগুলো আলোচনা করা হলো :

পাঠ-১ : বাংলাদেশ ও সার্ক।
পাঠ-২ : বাংলাদেশ ও মুসলিম বিশ্ব।
পাঠ-৩ : বাংলাদেশ ও পূর্ব এশিয়া।
পাঠ-৪ : বাংলাদেশ ও জাতিসংঘ।

পাঠ-১ : বাংলাদেশ ও সার্ক

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- সার্কের গঠন ও কার্যাবলি সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন ।
- সার্ক প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশের ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে পারবেন ।

বাংলাদেশ ও সার্ক

সার্ক (SAARC)-এর পূর্ণাঙ্গ অর্থ হল (South Asian Association of Regional Co-operation) 'দক্ষিণ এশিয়া আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা ।' দক্ষিণ এশিয়ার আটটি দেশের সমন্বয়ে তাদের নিজেদের পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতার মাধ্যমে সামগ্রিক অগ্রগতি অর্জনের লক্ষে গঠিত সংস্থাকে সার্ক বলে ।

সার্ক গঠন

বাংলাদেশের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান সর্বপ্রথম দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর রাষ্ট্র প্রধানদের সাথে অঞ্চলিক সহযোগিতার প্রশ্নে আনুষ্ঠানিকভাবে মত বিনিময় শুরু করেন । এরূপ আলোচনার ইতিবাচক সাড়া পেয়ে ১৯৮০ সালের মে মাসে সর্বপ্রথম দক্ষিণ এশিয়ার সাতটি দেশের সমন্বয়ে একটি আঞ্চলিক ফোরাম গঠনের জন্য বাংলাদেশ প্রস্তাব উত্থাপন করে । সার্ক গঠনের লক্ষে ১৯৮১সালে কলম্বোতে সাতটি দেশের পররাষ্ট্র সচিবদের আনুষ্ঠানিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় । তাছাড়া নয়াদিল্লীতে পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের বৈঠকে আঞ্চলিক সহযোগিতার বিষয়টি নীতিগতভাবে গৃহীত হয় । রাষ্ট্রপতি লে. জেনারেল হুসেইন মো: এরশাদের সরকার আমলে, ১৯৮৫ সালে সার্কের প্রথম শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ঢাকায় । বাংলাদেশের তৎকালীন রাষ্ট্রপ্রধান লে. জেনারেল এরশাদ হন সার্কের প্রথম চেয়ারপারসন ।

১৯৮৫ সালের ৮ই ডিসেম্বর ঢাকায় সার্ক সনদ স্বাক্ষরিত হয় । দক্ষিণ এশিয়ার সাতটি উন্নয়নশীল দেশ বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, ভুটান, শ্রীলঙ্কা ও মালদ্বীপের রাষ্ট্রপ্রধানগণ উক্ত সনদে স্বাক্ষর করেন । এ স্বাক্ষরের মধ্য দিয়েই সার্কের জন্ম হয় । বর্তমানে আফগানিস্তানকে সার্কের সদস্যপদ প্রদান করা হয়েছে । ২০১১ সালে সার্কের শীর্ষ সম্মেলন মালদ্বীপের রাজধানী মালেতে অনুষ্ঠিত হয় । বর্তমানে সার্কের সদস্য ৮টি দেশ ।

উদ্দেশ্য

দক্ষিণ এশিয়ার ৮টি উন্নয়নশীল দেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতির লক্ষ্যে সহযোগিতার অঙ্গীকার করে আটটি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য স্থির করা হয় । এগুলো হলো : ১. জনজীবনের মানোন্নয়ন , ২. আস্থা ও সমঝোতা বৃদ্ধি, ৩. যৌথ স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন, ৪. অপরের সাথে সহযোগিতা , ৫. আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতা, ৬. অন্যান্য আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থার সাথে সহযোগিতা, ৭. সার্বভৌমত্ব ও সংহতি বিধান, ৮. যৌথ কার্যক্রমের সূচনা ।

সার্কের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক

বাংলাদেশের প্রয়াত প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান প্রতিবেশী দেশগুলো সফরের মাধ্যমে সার্ক গঠনের চিন্তা করেছিলেন । ১৯৮৫ সালে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট লে: জেনারেল হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের উদ্যোগে ঢাকায় আনুষ্ঠানিকভাবে সার্কের যাত্রা শুরু হয় ।

সার্কের অগ্রযাত্রাকে ত্বরান্বিত করার লক্ষে বাংলাদেশ সর্বদাই প্রস্তুত । জনগণের কল্যাণ সাধন ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে সার্কের ভূমিকা অপরিসীম । সার্কভুক্ত দেশগুলোর পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলনে বাংলাদেশ সার্ক ফোরামের প্রতিটি সভায় আগ্রহ ভরে যোগদান করে সর্বপ্রকার শান্তি ও সহযোগিতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে । সার্কভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের ভারসাম্য রক্ষা, আঞ্চলিক বিরোধের নিষ্পত্তি, প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে বিদ্যমান সংকট নিরসনে বাংলাদেশের প্রয়াস ও প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে ।

সারসংক্ষেপ

সার্ক ৮টি দেশের জনগণের ভাগ্য উন্নয়নের চালিকাশক্তি । বাংলাদেশ ও সার্কের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

(ক) এক কথায় উত্তর দিন ।

১ । সার্ক প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবক কে?

২ । সার্কের সদস্য সংখ্যা কত?

৩ । সার্ক আনুষ্ঠানিকভাবে কখন গঠিত হয়?

৪ । সার্কের প্রথম শীর্ষ সম্মেলন কোথায় অনুষ্ঠিত হয়?

৫ । ২০১১ সালে সার্কের শীর্ষ সম্মেলন কোথায় অনুষ্ঠিত হবে?

(খ) রচনামূলক প্রশ্ন

১ । সার্ক কী? সার্কে বাংলাদেশের ভূমিকা কী?

(ক) উত্তরমালা

১ । প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান, ২ । ৮, ৩ । ১৯৮৫ সালে, ৪ । ঢাকায়, ৫ । মালে ।

পাঠ-২ বাংলাদেশ ও মুসলিম বিশ্ব

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- বাংলাদেশের সঙ্গে মুসলিম বিশ্বের সম্পর্ক আলোচনা করতে পারবেন ।
- মুসলিম বিশ্বের সমস্যাবলি চিহ্নিত করতে পারবেন ।
- বাংলাদেশ ও মুসলিম বিশ্বের সমস্যাবলি সমাধানের উপায় বলতে পারবেন ।

পটভূমি

বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র । এখানকার শতকরা ৮৮ জন লোক মুসলমান । মুসলিম বিশ্ব বলতে বিশ্বের অর্ধশতাধিক মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশসমূহকে বোঝায় । কিন্তু দুঃখের বিষয় বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় কোনো মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্র বাংলাদেশের পক্ষ অবলম্বন করেনি । বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারত ও সোভিয়েত রাশিয়ার সাহায্য ও সহযোগিতাকে তারা সন্দেহের চোখে দেখেছে । কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পর মুসলিম বিশ্বের দেশগুলো বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দান করে ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলে । ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অর্গানাইজেশন অব ইসলামিক কনফারেন্স (ওআইসি) এর লাহোর সম্মেলনে যোগদান করে ওআইসি-এর সদস্যপদ গ্রহণ করেন তখন থেকে বাংলাদেশ এ সংস্থার অন্যতম সদস্য ।

ইসলামী সম্মেলন সংস্থা (ওআইসি)

গঠন : ১৯৬৯ সালের ২১শে আগস্ট পবিত্র আল আকসা মসজিদে অগ্নিসংযোগের ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিশ্বের ১৪টি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রীগণ মিসরে এক সম্মেলনে বসেন । উক্ত বৈঠকে সৌদি আরবের প্রস্তাব মোতাবেক মুসলিম প্রধানদের শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় । সিদ্ধান্ত মোতাবেক মরক্কোর রাজধানী রাবাতে শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় । সম্মেলনে বিশ্বের ২৪টি মুসলিম রাষ্ট্রের প্রধানগণ যোগদান করেন ।

১৯৭০ সালে জেদ্দায় পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ও সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জেদ্দায় ওআইসির সেক্রেটারিয়েট স্থাপিত হয় । মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী টেংকু আব্দুর রহমান ওআইসির সেক্রেটারি জেনারেল নিযুক্ত হন । বিশ্বের সব মুসলিম রাষ্ট্র এর সদস্য ।

উদ্দেশ্য :

ওআইসির প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে –

(১) ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধ ও সংহতি জোরদার করা ।

(২) সদস্য রাষ্ট্রগুলোর পারস্পরিক স্বার্থে কাজ করা ও সহযোগিতা বৃদ্ধি করা ।

(৩) বর্ণবৈষম্যবাদ ও ঔপনিবেশবাদ বিলোপ করা ।

(৪) ইসলামী পবিত্র স্থানগুলোর নিরাপত্তা রক্ষার সংগ্রামকে সমর্থন করা ।

(৫) মুসলিমদের মর্যাদা রক্ষার জন্য সংগ্রাম করা ।

(৬) আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ব্যাপারে সমর্থন করা ।

(৭) মুসলিম রাষ্ট্রের সঙ্গে সৌহার্দ্য ও সদ্ভাব বৃদ্ধি করা।

(৮) নিজেদের মধ্যে বিরোধের শান্তিপূর্ণ উপায়ে নিষ্পত্তি করা।

মুসলিম বিশ্বের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ চূড়ান্ত বিজয়ের মাধ্যমে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবার পর মুসলিম বিশ্বের সৌদি আরব ও সুদান ছাড়া সকল দেশ স্বীকৃতি প্রদান করে। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশকে পুণর্গঠনের ব্যাপারে যে সব মুসলিম রাষ্ট্র সাহায্য ও সহযোগিতার ব্যাপারে হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল সেগুলো হলো : কুয়েত, কাতার, ইরাক, আরব আমিরাত, আলজেরিয়া, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, আফগানিস্তান প্রভৃতি দেশসমূহ। ফলে সব মুসলিম রাষ্ট্রের সঙ্গে কূটনৈতিক, বাণিজ্যিক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। বাংলাদেশ মধ্যপ্রাচ্যে জনশক্তি রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে লাভবান হচ্ছে। তাছাড়া, মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি স্থাপনে, ইরাক-ইরান যুদ্ধ বন্ধে, ফিলিস্তিনিদের স্বাধীনতা যুদ্ধে বাংলাদেশ মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর পাশে থেকে তার সীমিত সম্পদ ও শক্তি কাজে লাগায়। ইরাক কর্তৃক কুয়েত দখল বাংলাদেশ সমর্থন করেনি। পরবর্তীকালে ইরাক কুয়েত ছেড়ে দিলে বাংলাদেশ কুয়েতে সৈন্য প্রেরণ করে দেশটিকে বিপদমুক্ত করার জন্য মাইন ও বিস্ফোরক দ্রব্য অপসারণে সাহায্য করে। ওআইসির সিদ্ধান্ত মোতাবেক বাংলাদেশ জাতিসংঘের মাধ্যমে বসনিয়ায় সেনাবাহিনী প্রেরণ করে। এভাবে বাংলাদেশ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্রগুলোর সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ, হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলেছে।

রচনামূলক প্রশ্ন

১। বাংলাদেশের সঙ্গে মুসলিম বিশ্বের সম্পর্ক কীরূপ? আলোচনা করুন।

পাঠ-৩ : বাংলাদেশ ও পূর্ব এশিয়া

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- বাংলাদেশের সাথে পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহের সম্পর্ক উন্নয়নের বিষয়ে বর্ণনা দিতে পারবেন।

বাংলাদেশ ও পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহের সাথে সম্পর্কের উন্নয়ন

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল রাষ্ট্র। দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য অন্যান্য দেশসমূহের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা উচিত। শুধু ভারতের সাথেই নয়, মুসলিম দেশগুলোর সাথেও সম্পর্ক রাখা একান্ত প্রয়োজন। এক সময় বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি শুধু ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিল। কিন্তু স্বাধীনতা পরবর্তীকালে পাশ্চাত্যের দেশসমূহ ও অন্যান্য মুসলিম দেশের সাথে সম্পর্ক স্থাপিত হয়। জাপানসহ পূর্ব এশিয়ায় অন্যান্য দেশের সাথে বাণিজ্যিক লেনদেন বাড়তে থাকে। ২০০৩ সালে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিতে 'লুক ইস্ট' বা 'পূর্বে তাকাও' একটি নীতি প্রবর্তিত হয়। এতে করে বাংলাদেশের সাথে পূর্ব এশিয়া তথা মায়ানমার, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, চীন ও জাপানের সাথে সু-সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

ভারত একসময় বাংলাদেশকে নিয়ন্ত্রণে রেখে এ অঞ্চলের ভূ এর সমুদ্র সীমায় নিজেদের কর্তৃত্ব বজায় রাখার জন্য এশিয়ান হাইওয়েকে নিজেদের পরিকল্পনা মাফিক করতে চেয়েছে। কিন্তু এতে করে বাংলাদেশের নিরাপত্তাসহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সাথে বাণিজ্যিক স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

ভারত বাংলাদেশকে কয়েক হাজার কোটি টাকার পণ্য প্রেরণ করে কিন্তু গ্রহণ করে মাত্র কয়েক কোটি টাকার পণ্য। তাই ভারত ও বাংলাদেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ভারসাম্যহীন। অথচ মায়ানমার, চীন, থাইল্যাণ্ড, বাংলাদেশের সাথে শুল্কমুক্ত বাণিজ্য গড়ে তোলার ব্যবস্থা নিয়েছে। এর ফলে বাংলাদেশের সাথে পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহের বাণিজ্যিক উন্নয়ন ছাড়াও যোগাযোগ, যাতায়াত, লেনদেন ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সহযোগিতা সম্প্রসারিত হয়েছে। এভাবে পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহের সাথে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি ও কূটনৈতিক সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটেছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

(ক) নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতিতে 'লুকইস্ট পলিসি' বা পূর্ব তাকাও নীতি কখন থেকে সূচিত হয় ?

(ক) ১৯৯৮ (খ) ১৯৯১ (গ) ২০০২ (ঘ) ২০০৩

(খ) রচনামূলক প্রশ্ন

১। বাংলাদেশের সঙ্গে এশিয়ার দেশগুলোর সম্পর্ক বিশ্লেষণ করুন।

(ক) উত্তরমালা

১। (ঘ)

পাঠ-৪ : বাংলাদেশ ও জাতিসংঘ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- বাংলাদেশের সাথে জাতিসংঘের সম্পর্ক বিষয়ে বিবরণ দিতে পারবেন।

ভূমিকা

জাতিসংঘ (United Nations Organization) হচ্ছে বিশ্বের স্বাধীন দেশসমূহের একটি সংস্থা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ অবসানের পর বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার নিয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করে লীগ অব নেশনস বা জাতিপুঞ্জ। কিন্তু নানা দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতার কারণে জাতিপুঞ্জের পক্ষে যুদ্ধের সম্ভবনা রোধ ও সৌহার্দ্যময় পরিবেশ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়নি। জাতিপুঞ্জের ব্যর্থতার কারণে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হলে ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবর যুদ্ধের ধ্বংস স্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে এক বিভীষিকাময় পরিস্থিতিতে জাতিসংঘ জন্মলাভ করে।

জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠা

১৯৪৫ সালের ২৫শে এপ্রিল থেকে ২৬ জুন পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সানফ্রান্সিসকো শহরে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে ৫০টি দেশের প্রতিনিধিরা জাতিসংঘের সনদ রচনা করেন। ১৯৪৪ সালের আগস্ট মাস থেকে অক্টোবর পর্যন্ত ওয়াশিংটনের ডামবারটন ওকসের বৈঠকে চীন, ফ্রান্স, সোভিয়েত ইউনিয়ন, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি বর্গের গৃহীত প্রস্তাবসমূহের ওপর ভিত্তি করেই এ সনদ রচিত হয়। ১৯৪৫ সালে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে অংশগ্রহণ কারী ৫০টি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা সনদটি অনুমোদন ও স্বাক্ষর করেন। ১৯৪৫ সালে ২৪ অক্টোবর জাতিসংঘ জন্মলাভ করে। জাতিসংঘের সদর দপ্তর নিউইয়র্কে স্থাপিত। বর্তমানে বিশ্বের ১৯৩টি দেশ জাতিসংঘের সদস্য।

জাতিসংঘের উদ্দেশ্য

জাতিসংঘের জন্ম হয়েছে বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার প্রয়াসে। জাতিসংঘ যে সব লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে মহান ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছেন তা নিম্নে বর্ণিত হলো :

১। শান্তির প্রতি হুমকি ও আক্রমণাত্মক কার্যকলাপ প্রতিরোধ করে বিশ্বশান্তি নিশ্চিত করা।

২। সব মানুষের সমান অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের মাধ্যমে জাতিতে জাতিতে সম্প্রীতি জোরদার করা।

৩। অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সহযোগিতা গড়ে তোলা।

৪। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সবাই স্বাধীনতা ও মৌলিক অধিকারের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধ গড়ে তোলা।

৫। আন্তর্জাতিক আইনের সাহায্যে আন্তর্জাতিক বিবাদের মীমাংসা করা।

৬। সব রাষ্ট্রের মধ্যে সহযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি করা।

৭। বিভিন্ন রাষ্ট্রের কার্যক্রমের সমন্বয় সাধনপূর্বক পরিচালনা করা।

জাতিসংঘের শাখাসমূহ

জাতিসংঘ সনদের মূলনীতি ও উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নের জন্য ছয়টি প্রধান শাখা আছে। এগুলো হলো :

(১) সাধারণ পরিষদ, (২) নিরাপত্তা পরিষদ, (৩) অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ, (৪) অছি পরিষদ, (৫) আন্ত র্জাতিক আদালত এবং (৬) সেক্রেটারিয়েট।

জাতিসংঘের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক

১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ পাকিস্তানের দখলমুক্ত হয়ে স্বাধীনতা লাভ করলে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক কারণে জাতিসংঘের সদস্য পদ পেতে কিছু সময় লাগে। ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করেন। স্বাধীনতার পর যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে জাতিসংঘের ভূমিকা প্রশংসনীয়। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনার লক্ষে বাংলাদেশের পুনর্গঠনের কার্যক্রমে জাতিসংঘ সাহায্য ও সহযোগিতার হাত সম্প্রসারিত করে বাংলাদেশের পাশে এসে দাঁড়ায়। তাছাড়া ১৯৮৪ সালে জাতিসংঘের কার্যপ্রণালীতে বাংলা ভাষার ব্যবহার আমাদের জন্য গৌরবের বিষয়। ১৯৮৬ সালে বাংলাদেশের তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হুমায়ূন রশীদ চৌধুরী জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৪১তম অধিবেশনে সভাপতি নির্বাচিত হন। জাপানকে হারিয়ে ১৯৭৯ সালে বাংলাদেশ নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্যপদ লাভ করে।
১৯৯১ সালে মায়ানমার থেকে হাজার হাজার রোহিঙ্গা শরণার্থী বাংলাদেশে আগমন করলে এক ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। জাতিসংঘ ও তার বিভিন্ন সংস্থা বাংলাদেশকে এ ব্যাপারে সাহায্য করে। তাছাড়া আগ্রাসী ইরাক কর্তৃক কুয়েত আক্রান্ত হলে বাংলাদেশ জাতিসংঘের আহবানে সেখানে সৈন্য প্রেরণ করে। সকল প্রকার বিবাদের শান্তিপূর্ণ মীমাংসায় জাতিসংঘ ঘোষিত নীতি অনুসরণ করে বাংলাদেশ ভারতের সাথে গঙ্গার পানি বণ্টন সমস্যা ও পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যার সমাধানে সফলকাম হয়েছে।

জাতিসংঘ বাংলাদেশের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হিসেবে যে কোনো সমস্যার সমাধানে সাহায্য করেছে। পাশাপাশি বাংলাদেশ জাতিসংঘের সনদের প্রতি পরম শ্রদ্ধাশীল দেশ হিসেবে জাতিসংঘের প্রতিটি অধিবেশনে যোগদান করে এবং গৃহীত সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে। বিশ্বশান্তি ও সহযোগিতার ক্ষেত্রে জাতিসংঘ ও বাংলাদেশ অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

(ক) নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যপদ পায়–

(ক) ১৯৭২ সালে (খ) ১৯৭৪ সালে (গ) ১৯৭৫ সালে (ঘ) ১৯৭৬ সালে।

২। জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয় ?

(ক) ১৯২০ সালে (খ) ১৯৩৯ সালে (গ) ১৯৪৫ সালে (ঘ) ১৯৪৬ সালে।

৩। বাংলাদেশ নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য হয়েছিল কাকে হারিয়ে?

(ক) জাপানকে (খ) চীনকে (গ) কোরিয়াকে (ঘ) নেদারল্যাণ্ডকে।

(খ) রচনামূলক প্রশ্ন

১। বাংলাদেশ ও জাতিসংঘের মধ্যকার সম্পর্ক ব্যাখ্যা করুন।

(ক) উত্তরমালা

১। (খ), ২। (গ), ৩। (ক)

ইউনিট
১৮

বাংলাদেশের জনসংখ্যা সমস্যা

ভূমিকা

রাষ্ট্র গঠনের একটি মৌল উপাদান জনগণ। জনগণ ছাড়া রাষ্ট্রের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। রাষ্ট্রের উন্নয়ন নির্ভর করে জনগণের দক্ষতার ওপর। একটি দেশের জনগণ সুশিক্ষা, প্রযুক্তিগত দক্ষতা ও পরিশ্রমের মাধ্যমে রাষ্ট্রের ভাগ্য নির্ধারণ করতে পারে। আবার পরিশ্রম বিমুখ অদক্ষ জনগণ রাষ্ট্রের বোঝা হতে পারে। বাংলাদেশ তথা তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রে জনসংখ্যা আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের একটি বড় বাধা। সম্পদ ও সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাব থাকায় বাংলাদেশে জনসংখ্যা দারিদ্র্য বিমোচন ও উন্নয়নের একটি অন্যতম সমস্যা। বিভিন্ন কারণে বাংলাদেশে জনসংখ্যার মাত্রাতিরিক্ত বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায়। তবে 'বিশাল জনসংখ্যা' দেশের জন্য আশীর্বাদও হতে পারে। এজন্য জনসংখ্যা যাই হোক জনগণকে মানবসম্পদে পরিণত করতে হবে। বর্তমান ইউনিটে নিম্নোক্ত পাঠগুলো আলোচনা করা হলো :

পাঠ-১ : বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ।
পাঠ-২ : জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে সৃষ্ট সমস্যা।
পাঠ-৩ : জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের উপায়।

পাঠ-১ : জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রধান কারণগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা ও ঘনবসতির হার সম্পর্কে ধারণা দিতে পারবেন।

ভূমিকা

বাংলাদেশের আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কিলোমিটার। আয়তনে বিশ্বের ৯০তম এই রাষ্ট্র জনসংখ্যার বিচারে বিশ্বের সপ্তম বৃহত্তম রাষ্ট্র। বাংলাদেশের বর্তমান জনসংখ্যা প্রায় ১৬ কোটি। বিশ্বের অন্যতম ঘনবসতিপূর্ণ রাষ্ট্র বাংলাদেশ। এখানে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৯৫৩ জন লোক বাস করে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৪৮ ভাগ।

বাংলাদেশে জনসংখ্যা পরিস্থিতি : বাংলাদেশ বিশ্বের সপ্তম এবং এশিয়ার পঞ্চম জনবহুল দেশ। ১৯৯১ সালের আদমশুমারির তথ্য অনুযায়ী এ দেশের মোট জনসংখ্যা ছিল ১১ কোটি ১৪ লাখ। এ সময় জনসংখ্যা বৃদ্ধির শতকরা হার ছিল ২.১৭ ভাগ। ২০০১ সালের আদমশুমারির তথ্যানুযায়ী জনসংখ্যা ছিল ১২ কোটি ৯২ লাখ এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির শতকরা হার ছিল ১.৪৭ ভাগ। জনসংখ্যার ঘনত্ব ১৯৯১ সালে ছিল প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৭৫৫ জন। ২০০১ সালে তা শতকরা ২৪ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৮৩৪ জনে পৌঁছায়। ২০০৮ সালের অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০৮ অনুযায়ী বাংলাদেশের জনসংখ্যা ১৪ কোটি ৬০ লাখ। জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৯৫৩ জন।

১৬৫০ সালে বাংলাদেশে জনসংখ্যা ছিল ১ কোটি। দীর্ঘ ২১১ বছর পর জনসংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে ১৮৬১ সালে ২ কোটিতে উপনীত হয়। ১৯০১ সালে এ দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ২.৮৯ কোটিতে পৌঁছে। ১৯২১ সালের পর এ দেশের জনসংখ্যা দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯৬১ সালে জনসংখ্যা ছিল ৫.৫ কোটি। মাত্র ৩০ বছরে তা দ্বিগুণ হয়ে দাঁড়ায় ১১ কোটিতে।

বাংলাদেশের জনসংখ্যা সমস্যার কারণ : জনসংখ্যা সমস্যা বাংলাদেশের জন্য এক নম্বর সামাজিক সমস্যা, কিন্তু এ সমস্যার পেছনে একক কোনো কারণ দায়ী নয়। বরং বহুবিধ কারণেই জনসংখ্যা সমস্যা বাংলাদেশে জটিল সামাজিক সমস্যার আকার ধারণ করেছে। যে কোনো দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রক্রিয়া দীর্ঘকালের অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, ভৌগোলিক প্রভৃতি কারণে সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রধান কারণগুলো হলো :

১. **ভৌগোলিক কারণ :** ভূ-প্রকৃতির দিক থেকে বাংলাদেশ নাতিশীতোষ্ণ মৌসুমী অঞ্চলে অবস্থিত। ফলে এ দেশের আবহাওয়ায় অল্প বয়সেই ছেলেমেয়েরা পরিণত বয়সে উপনীত হয়। যা জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য সহায়ক উপাদান। সুতরাং আবহাওয়া বাংলাদেশে জনাধিক্যের একটি অন্যতম কারণ।

২. **শিক্ষার অভাব :** বাংলাদেশে শিক্ষার হার মাত্র ৬৫ ভাগ। প্রকৃত শিক্ষিতের সংখ্যা আরো কম। বাংলাদেশে সচেতন শিক্ষিত মানুষের হার অতি নগণ্য। সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণ শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত। তারা জনসংখ্যা বৃদ্ধির ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে মোটেও অবগত নয়। ফলে অপরিকল্পিতভাবে অগণিত শিশুর জন্ম হচ্ছে এ দেশে।

৩. **বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ :** বাংলাদেশে বিশেষত গ্রাম এলাকায় বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহের প্রচলন রয়েছে। একজন নারী ১২-৪৫ বছর বয়স পর্যন্ত মাতৃত্ব লাভ করতে পারে। তাই অল্প বয়সে বিয়ে দিলে সাধারণত সন্তান ধারণ করবেই। তাছাড়া বহুবিবাহের মাধ্যমেও জনসংখ্যা বৃদ্ধি ঘটছে। এভাবে বাল্য ও বহুবিবাহের ফলে পরিবার পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

৪. **অজ্ঞতা, অশিক্ষা ও অসচেতনতা :** বাংলাদেশের অধিকাংশ জনগণই অজ্ঞ, অশিক্ষিত ও অসচেতন। ফলে জনগণের মধ্যে কুপ্রথা ও কুসংস্কার অতিমাত্রায় বিরাজ করে। তাদের অজ্ঞতার কারণে তারা ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক তথা জাতীয় জীবনে অধিক জনসংখ্যার বিরূপ প্রভাব সম্পর্কে বলতে গেলে সম্পূর্ণ

অসচেতন। ফলে তারা পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করে না। এ কারণে বাংলাদেশের জনসংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে।

৫. **খাদ্যাভ্যাস** : বাংলাদেশের বেশিরভাগ জনগণ সাধারণত যেসব খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করে থাকে সেগুলো জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য পরোক্ষভাবে দায়ী। দেশের বেশিরভাগ জনগণ অধিক মাত্রায় ভাত, আলু, গম, ডাল ইত্যাদি শ্বেতসার জাতীয় খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ এবং অল্পমাত্রায় আমিষ জাতীয় খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করায় অধিক সন্তান জন্মদানের ক্ষমতা অর্জন করে। তাই খাদ্যাভ্যাসও বাংলাদেশে জনসংখ্যা সমস্যার জন্য পরোক্ষভাবে দায়ী।

৬. **পুত্রসন্তান কামনা** : বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী সন্তানের লিঙ্গ নির্ধারণের ক্ষেত্রে পিতা-মাতার ক্রোমোজমজনিত বৈজ্ঞানিক কারণ সম্পর্কে অবহিত নন। সে কারণে সন্তান হওয়া সত্ত্বেও পুত্রসন্তান কামনায় অধিক সন্তানের জন্ম দিয়ে থাকে এবং তা দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

৭. **শিশু মৃত্যুহারের আধিক্য** : বাংলাদেশে শিশুমৃত্যুরহার প্রতি হাজারে ৫৬ জন। এজন্য শিশু সন্তানের মৃত্যুর আশঙ্কায় পিতা-মাতারা দু-একটি সন্তান নিয়ে ভরসা পায় না এবং অধিক সন্তান জন্ম দিয়ে থাকে।

৮. **অর্থনৈতিক কারণ** : বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য অর্থনৈতিক কারণও ব্যাপকভাবে দায়ী। বাংলাদেশে, বিশেষ করে পুত্রসন্তান অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের জন্য খুবই সহায়ক। কারণ তারা একটু বড় হলেই অর্থ উপার্জন করতে সক্ষম হয়। এছাড়া পুত্রসন্তান যৌতুক লাভের জন্য সহায়ক। তাই পুত্রসন্তান লাভের জন্য অর্থনৈতিক কারণে অনেকে জন্মনিয়ন্ত্রণ করে না।

৯. **রাজনৈতিক কারণ** : বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য রাজনৈতিক কারণও পরোক্ষভাবে দায়ী। রাজনৈতিক ইস্যু হিসেবে এই সমস্যটি জনজীবনে রাজনৈতিক বা রাজনৈতিক দলসমূহ কর্তৃক যথেষ্ট আলোচিত ও বিশ্লেষিত হয় না। ফলত জনগণ এ ব্যাপারে যথার্থ সচেতন হয়ে উঠছেন না। তা'ছাড়া উপযোগী রাষ্ট্রীয় নীতি ও কৌশলের অভাবেও এই সমস্যার সমাধান হচ্ছে না। এভাবে রাজনৈতিক কারণেও পরোক্ষভাবে বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে থাকে।

১০. **ধর্মীয় কারণ** : বাংলাদেশে জনসংখ্যা সমস্যার অন্যতম কারণ হচ্ছে ধর্মীয় গোঁড়ামি ও কুসংস্কার। বিশেষত গ্রামাঞ্চলের অধিকাংশ মানুষই অজ্ঞ ও অশিক্ষিত হওয়ায় তারা মাত্রাতিরিক্ত ধর্মভীরু এবং ধর্মীয় গোঁড়ামি ও কুসংস্কারের বেড়াজালে আবদ্ধ। তাছাড়া স্বল্প জ্ঞানসম্পন্ন মৌলভী সাহেবরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ধর্মের অপব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন। তারা বলেন, 'মুখ দিয়েছেন যিনি আহার দিবেন তিনি।' ফলে জনগণ বিয়ে ও সন্তান জন্মদান, লালন-পালনকে পবিত্র কাজ বলে মনে করে এবং জন্মনিয়ন্ত্রণকে পাপ বলে মনে করেন। এ ধরনের ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির কারণে জনসংখ্যা সমস্যার ব্যাপকতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

১১. **কৃষিভিত্তিক সমাজ কাঠামো** : বাংলাদেশের সমাজব্যবস্থা প্রধানত কৃষিনির্ভর। গ্রাম এলাকার শ্রমজীবী জনগণের শতকরা ৮০ জনই কৃষিকাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে। অধিক সন্তান কৃষিকাজের জন্য খুবই সহায়ক। এজন্য কৃষিকাজের সুবিধার্থে অধিক সন্তান জন্মদানের প্রবণতা আমাদের দেশের অনেক পরিবারে লক্ষ্য করা যায়। ফলে গ্রামাঞ্চলে জনসংখ্যা দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

১২. **অর্থনৈতিক কাজে মহিলাদের কম অংশগ্রহণ** : বাংলাদেশে অর্থনৈতিক কাজে নারীদের অংশগ্রহণ নগণ্য। তারা শুধু গৃহস্থালি কাজেই নিজেদের শ্রম নিয়োগ করে থাকেন। ফলে তারা সন্তান প্রতিপালনের জন্য অনেক সময় পায়। এ কারণেও গ্রামীণ নারীরা অধিক সন্তানের জন্ম দিতে থাকে।

১৩. **জন্ম ও মৃত্যুহারের ব্যবধান** : জনসংখ্যা স্ফীতির জন্য যদি একটি মাত্র কারণকে দায়ী করা হয় তবে তা হচ্ছে জন্ম ও মৃত্যুহারের ব্যবধান। বাংলাদেশে একদিকে যেমন– জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, তেমনি চিকিৎসা ক্ষেত্রে উন্নয়নের ফলে শিশুমৃত্যু ও মোট মৃত্যু হার হ্রাস পাচ্ছে। জনগণের গড় আয়ু বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর ফলে জনসংখ্যার বৃদ্ধি ঘটছে।

১৪. **বৃদ্ধকালীন ও সামাজিক নিরাপত্তা** : বাংলাদেশে বৃদ্ধদের সামাজিক নিরাপত্তা খুবই কম। রাষ্ট্র বৃদ্ধদের সামাজিক নিরাপত্তাদানে খুব বেশি ভূমিকা নেয়নি। ফলে পিতা-মাতারা বৃদ্ধকালে সন্তানের ওপর নির্ভর করতে চায়। এভাবে বৃদ্ধকালীন নিরাপত্তার আশায় অনেকেই অধিক সন্তান জন্ম দিয়ে থাকেন। ফলে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে রাখা কষ্টসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।

১৫. **চিত্তবিনোদনের অভাব :** বাংলাদেশে বিশেষত গ্রামীণ সমাজে চিত্তবিনোদনের ক্ষেত্র খুবই সীমিত। দারিদ্র্য ও বিদ্যুতের অভাব চিত্তবিনোদনহানির দু'টি প্রধান কারণ। ফলে চিত্তবিনোদনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত মানুষ জৈবিক সম্পর্ক নির্ভর থাকে। এতে পরিবারে সন্তান-সন্ততির সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায়।

১৬. **দারিদ্র্য :** দারিদ্র্যের কারণে বাংলাদেশে জনগণের জীবনযাত্রার মান অত্যন্ত কম। দারিদ্র্য ও সন্তান জন্মদানের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। বিশ্বের প্রতিটি দরিদ্র রাষ্ট্রই অধিক জনসংখ্যা সমস্যা দ্বারা আক্রান্ত। দরিদ্র জনগোষ্ঠী তাদের আয় ও জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধির আশায় অধিক সন্তান, বিশেষত পুত্র সন্তান কামনা করে। কারণ তাদের ধারণা, পরিবারে ছেলে সন্তান বেশি থাকলে পারিবারিক আয় বৃদ্ধি পাবে। দারিদ্র্যের কারণে সৃষ্ট এ মনোভাব জনসংখ্যা বৃদ্ধির একটি প্রধান কারণ।

১৭. **যৌথ পরিবার ব্যবস্থা :** বাংলাদেশের যৌথ পরিবার ব্যবস্থা উচ্চ জন্মহারে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। বিশেষ করে গ্রামীণ যৌথ পরিবারে সন্তান জন্মদান ও লালন-পালন তেমন ব্যয়বহুল এবং কষ্টসাধ্য ব্যাপার নয়। আর এর ফলে অধিক সন্তান জন্মদানকে তেমন ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে গণ্য করা হয় না।

১৮. **নারীশিক্ষা ও কর্মসংস্থানের অভাব :** সমাজবিজ্ঞানী কিংসলি ডেভিসের মতে, নারীর অক্ষরজ্ঞান ও শিক্ষা তার সন্তান সংখ্যার সাথে বিপরীতমুখী। বাস্তব তথ্যাদির পরিপ্রেক্ষিতেও দেখা যায় যে দেশে নারী শিক্ষা হার যত বেশি, সে দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ততো কম। এর কারণ : ক. নারীদের পড়ালেখায় অধিক সময় ব্যয় হয় বলে দেরিতে বিবাহ হওয়া। খ. শিক্ষিত নারীরা সংসারের বাইরে কর্মে ব্যস্ত থাকে বলে তারা কম সন্তান কামনা করে। গ. কর্মজীবী শিক্ষিত নারীরা জীবন সম্পর্কে অধিক সচেতন বলে কম সন্তান কামনা করে। ঘ. কর্মজীবী শিক্ষিত নারী সামাজিক ও পারিবারিক মর্যাদা অধিক থাকে বলে তারা মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা পায়, যা সন্তান জন্মদানে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য কোন একক কারণ দায়ী নয়। দারিদ্র্য, বাল্যবিবাহ, ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি, জলবায়ু, শিক্ষার অভাব, সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা, পুত্র সন্তানের আকাঙ্ক্ষা, খাদ্যাভ্যাস প্রভৃতি জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য দায়ী।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

(ক) শূন্যস্থান পূরণ করুন

১। বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম --- দেশ।

২। জনসংখ্যার বিচারে বিশ্বে বাংলাদেশ --- বৃহত্তম রাষ্ট্র।

৩। --- সন্তানের আশা জনসংখ্যা বৃদ্ধির একটি অন্যতম কারণ।

৪। সামাজিক--- অভাব জনসংখ্যা বৃদ্ধির একটি অন্যতম কারণ।

৫। দারিদ্র্য ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির মধ্যে --- সম্পর্ক বিদ্যমান।

(খ) রচনামূলক প্রশ্ন

১। বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণগুলো বর্ণনা করুন।

২। 'বিভিন্ন কারণে বাংলাদেশে জনসংখ্যার বিস্ফোরণ ঘটেছে'– উক্তিটি ব্যাখ্যা করুন।

(ক) উত্তরমালা

১। জনবহুল, ২। সপ্তম, ৩। পুত্র, ৪। নিরাপত্তার, ৫। ঘনিষ্ঠ।

পাঠ-২: জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে সৃষ্ট সমস্যা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- বাংলাদেশের অধিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে সৃষ্ট সমস্যাসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে সৃষ্ট আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম প্রধান ঘনবসতিপূর্ণ রাষ্ট্র। জনসংখ্যার বিস্ফোরণ (Population Explosion) বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকে মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত করছে। বাংলাদেশে উন্নয়নের এমন কোন ক্ষেত্র নেই যেখানে জনসংখ্যাধিক্যের বিরূপ প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় না। দেশের চরম দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা, নিম্ন জীবন মান, উচ্চ বেকারত্ব, স্বাস্থ্যহীনতা, অপরাধ প্রবণতা, বাসস্থান সমস্যা, খাদ্য ঘাটতি, কৃষি জমির হ্রাস, পরিবেশ দূষণ প্রভৃতি সমস্যার মূলে রয়েছে অধিক জনসংখ্যা। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে জনসংখ্যা স্ফীতির যে ক্ষতিকর প্রভাব বিদ্যমান তা নিম্নে আলোচনা করা হলো :

১। **খাদ্য ঘাটতি** : বাংলাদেশে বর্তমানে খাদ্য সমস্যা অত্যন্ত প্রকট এবং এর প্রধান কারণ জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও খাদ্য উৎপাদনে অসামঞ্জস্য। ১৯৬১ সাল থেকে বাংলাদেশে ক্রমাগত খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও খাদ্য ঘাটতির ভয়াবহতা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশি হওয়ায় খাদ্য উৎপাদন অধিক হলেও খাদ্য সমস্যা থেকেই যাচ্ছে। ১৯৬০ সালে খাদ্য উৎপাদনের পরিমাণ ছিল প্রায় ১ কোটি মেট্রিক টন আর খাদ্য ঘাটতি ছিল ৪ লাখ মেট্রিক টন। অন্যদিকে ২০০০-২০০১ সালে খাদ্য উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ২ কোটি ৬৭ লাখ ৫৮ হাজার মেট্রিক টন। কিন্তু তা সত্ত্বেও জনসংখ্যা অধিক হওয়ার ফলে এ সময়ে খাদ্য আমদানির পরিমাণ ছিল ১৫.৫৪ লাখ মেট্রিক টন। এর জন্য একমাত্র জনসংখ্যাস্ফীতিই দায়ী। কারণ এ দেশের জনসংখ্যা যদি কম থাকত তবে উৎপাদিত খাদ্যশস্য দিয়ে অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণ করার পর রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা সম্ভব হতো। এছাড়া জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে মাথাপিছু ভূমির পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে। এতে মাথাপিছু খাদ্য উৎপাদন এবং খাদ্য প্রাপ্তির সম্ভাব্যতা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

২। **নির্ভরশীল জনসংখ্যার হার বৃদ্ধি** : বাংলাদেশে দিন দিন জনসংখ্যা যত বাড়ছে, নির্ভরশীল জনসংখ্যার হারও তত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৯১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী শতকরা ৫১ ভাগ লোক নির্ভরশীল। জাতিসংঘের জনসংখ্যা তহবিল (UNFPA) সারা বিশ্বের ১৯৯৮ সালে জনসংখ্যা সংক্রান্ত বিশ্ব জনসংখ্যা রিপোর্টে উল্লেখ করেছে, ২০০৮ সাল নাগাদ বাংলাদেশে প্রবীণ লোকের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ৭.৭ শতাংশে পৌঁছাবে। এভাবে আমাদের দেশে কর্মী জনসংখ্যার তুলনায় নির্ভরশীল জনসংখ্যার পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় অনেক পরিবারেই মারাত্মক আর্থিক সমস্যা দেখা দিচ্ছে।

৩। **বেকারত্ব বৃদ্ধি** : সমস্যা জর্জরিত বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান সমস্যা বেকারত্ব। আর অতিরিক্ত জনসংখ্যাই আমাদের বেকার সমস্যার অন্যতম প্রধান কারণ। জনসংখ্যা অনুপাতে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করা যাচ্ছে না বলে বাংলাদেশে বেকারের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলছে। স্বাধীনতার পর থেকে ১৯৯৬-৯৭ পর্যন্ত সময়ে দেশে শ্রমশক্তি তথা কর্মক্ষম জনশক্তির পরিমাণ দ্বিগুণ হলেও সে অনুপাতে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পায়নি।

৪। **শিক্ষার অভাব :** শিক্ষা মানুষের অন্যতম মৌলিক চাহিদা। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে শিক্ষার ভূমিকা অপরিসীম। বাংলাদেশের সংবিধান মতে দেশের প্রতিটি নাগরিকের জন্য শিক্ষার সুযোগ সুনিশ্চিত করা রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব। দেশের বৃহত্তর জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করার জন্য সর্বস্তরে শিক্ষাকে অগ্রাধিকার ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। কিন্তু অতিরিক্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে দেশের সকল নাগরিকের জন্য শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা সম্ভব হচ্ছে না। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি না পাওয়ায় দেশে নিরক্ষর লোকের মোট সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর ফলে দেশের সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

৫। **বস্ত্র ঘাটতি :** বস্ত্র মানুষের মৌলিক চাহিদা। কিন্তু অতিরিক্ত জনসংখ্যার ফলে আমাদের দেশে প্রতি বছর বিপুল পরিমাণ বস্ত্রের ঘাটতি হচ্ছে। বস্ত্র খাতে আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগ করে আগের চেয়ে অনেক বেশি বস্ত্র উৎপাদন করেও জনগণের চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হচ্ছে না। বাংলাদেশে প্রতি বছর প্রায় ১৪০ কোটি মিটার বস্ত্রের প্রয়োজন। অথচ বস্ত্র উৎপাদন এর চেয়ে অনেক কম। তাছাড়া প্রতি বছর প্রায় ৩০ লক্ষ নবাগতদের জন্য বাড়তি প্রায় ৩ কোটি মিটার বস্ত্রের প্রয়োজন। ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি করেও বস্ত্র ঘাটতি হ্রাস করা সম্ভব হচ্ছে না।

৬। **স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সমস্যা বৃদ্ধি :** স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা মানুষের মৌলিক চাহিদা। অথচ বাংলাদেশে যে হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে সে হারে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা সম্ভব হচ্ছে না। বর্তমানে বাংলাদেশে শতকরা প্রায় ৫০ জন লোক স্বাস্থ্যহীনতা এবং শতকরা ৮০টি শিশু পুষ্টিহীনতার শিকার। এছাড়া উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবে প্রতি বছর বিপুল পরিমাণ প্রসূতি মায়ের মৃত্যু হয়। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা খাতে উপযুক্ত পদক্ষেপ নেয়া সম্ভব হচ্ছে না।

৭। **বাসস্থান সমস্যা :** জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে বাংলাদেশে বাসস্থান ও বস্তি সমস্যা মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। গ্রাম ও শহর এলাকায় প্রতি বছর ব্যাপকহারে গৃহ নির্মাণ করেও এ সমস্যা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে লক্ষ লক্ষ ভাসমান জনগোষ্ঠী খোলা আকাশের নিচে এবং বস্তিতে মানবেতর জীবনযাপন করতে বাধ্য হচ্ছে। এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, শুধু ঢাকা শহরেই শতকরা ৩৫ ভাগ লোক বস্তিতে বাস করে।

৮। **ভূমির ওপর চাপ :** জনসংখ্যা বৃদ্ধির তাৎক্ষণিক প্রভাব পড়ে ভূমির ওপর। প্রতি বছর বর্ধিত জনসংখ্যার জন্য বাড়িঘর, রাস্তাঘাট, অফিস-আদালত, শিল্প-কারখানা প্রভৃতি স্থাপন এবং উত্তরাধিকার সূত্রে ভূমির ভাগ-বাটোয়ারা হবার কারণে বিপুল পরিমাণ আবাদি ভূমি অনাবাদি ভূমিতে পরিণত হচ্ছে। এতে চাষাবাদযোগ্য ভূমির পরিমাণ দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে। ১৯৯৬ সালে কৃষিশুমারির তথ্যানুযায়ী বাংলাদেশে মাথাপিছু চাষাবাদযোগ্য ভূমির পরিমাণ মাত্র ০.১৫ একর। জনসংখ্যার চাপে এর পরিমাণ দিন দিন আরো হ্রাস পাচ্ছে।

৯। **মূলধন গঠন ও শিল্পায়ন ব্যাহত :** বর্ধিত জনসংখ্যার মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য বার্ষিক বিপুল পরিমাণ অর্থ অনুৎপাদনমূলক খাতে ব্যয় করতে হয়, যার প্রভাবে আমাদের ব্যক্তিগত পর্যায় থেকে শুরু করে জাতীয় পর্যায়ে সঞ্চয় বৃদ্ধি করা সম্ভব হচ্ছে না। এতে মূলধন গঠন ব্যাহত হয়ে শিল্পায়নের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হচ্ছে। সুতরাং জনসংখ্যার অস্বাভাবিক বৃদ্ধি মূলধন গঠন ও শিল্পায়নের অন্যতম প্রতিবন্ধক।

১০। **পরিবেশ দূষণ ও প্রাকৃতিক ভারসাম্যহীনতা :** বর্ধিত জনসংখ্যার জন্য বাসগৃহ নির্মাণ, রাস্তাঘাট ও পুকুর খনন প্রভৃতি কারণে গাছপালা ও বনাঞ্চল ক্রমান্বয়ে ধ্বংস করা হচ্ছে। খাদ্যসহ অন্যান্য চাহিদা মেটানোর লক্ষে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ওষুধ ব্যবহারের ফলে পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। তদুপরি জনসংখ্যার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পয়ঃপ্রণালী, শৌচাগার ইত্যাদি তৈরি করা সম্ভব হচ্ছে না বলে পরিবেশ দূষিত হচ্ছে এবং রোগজীবাণু বিস্তার লাভ করছে।

১১। **নিম্ন মাথাপিছু আয়** : জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে আমাদের দেশের জনগণের আয় কমে গিয়ে নিম্ন মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশের বর্তমান মাথাপিছু গড় আয় অন্যান্য প্রতিবেশী দেশের তুলনায় কম। আর এজন্য জনসংখ্যা স্ফীতিকেই প্রধান কারণ হিসেবে দায়ী করা হয়।

১২। **যোগাযোগ ব্যবস্থার ওপর চাপ বৃদ্ধি** : জনসংখ্যাস্ফীতির ফলে আমাদের যোগাযোগ ব্যবস্থার ওপর চাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাস, ট্রাক, নৌকা, ট্রলার, লঞ্চ, রেল প্রভৃতি যানবাহনে যাতায়াত আজ চরম ঝুঁকিপূর্ণ। জনসংখ্যার তুলনায় এসব যানবাহনের সংখ্যা সীমিত থাকার কারণে যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে চরম নিরাপত্তাহীনতা দেখা দিচ্ছে।

১৩। **দুর্নীতি ও অপরাধ বৃদ্ধি** : বাংলাদেশে জনসংখ্যার তুলনায় উৎপাদিত ও সরবরাহকৃত দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। অন্যদিকে মাথাপিছু আয় কম থাকায় অনেকের পক্ষে তাদের মৌল মানবিক চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে অনেকে বাধ্য হয়ে দুর্নীতি ও অপরাধের মাধ্যমে অবৈধভাবে তাদের চাহিদা পূরণের চেষ্টা করছে। আর এর প্রভাবে সমাজে দুর্নীতি ও অপরাধপ্রবণতা ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলেছে।

১৪। **সামাজিক বিশৃঙ্খলা** : বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার দরিদ্র ও নিম্নশ্রেণীর মধ্যে অধিক। দরিদ্র শ্রেণীর লোকজন তাদের সন্তান-সন্ততিদের লেখাপড়াসহ অন্যান্য মৌলিক চাহিদা যথাযথভাবে পূরণে সক্ষম হচ্ছে না। এর ফলে দরিদ্র পরিবারের সন্তানদের সামাজিকীকরণ ব্যাহত হয়ে তাদের ব্যক্তিত্ব যথাযথভাবে গড়ে উঠছে না। সমাজে এদের সংখ্যাই অধিক। অন্যদিকে, শিক্ষিত ও সম্পদশালী শ্রেণীর মধ্যে সন্তান জন্মদানের হার কম। ফলে তারা তাদের সন্তানদের মৌলিক চাহিদা পূরণের মাধ্যমে সুষ্ঠু ব্যক্তিত্বসম্পন্ন করে গড়ে তুলতে সক্ষম হচ্ছে। কিন্তু সমাজে এদের সংখ্যা অত্যন্ত কম। সুতরাং বলা যায়, এ দেশে দরিদ্র শ্রেণীর মধ্যে যে হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে জনসংখ্যা যেভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে, তাতে বাংলাদেশের জনসংখ্যার মধ্যে অচিরেই ভারসাম্যহীনতা দেখা দেবে, যা সামাজিক সংহতি ও শৃঙ্খলার প্রতি হুমকি সৃষ্টি করবে। অন্যদিকে দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি না পাওয়ায় সমাজ জীবনে অশান্তি, হতাশা, ব্যর্থতা ও বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

১৫। **দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র** : বাংলাদেশে প্রায় অর্ধেক মানুষ দারিদ্র্য সীমার নিচে বাস করে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রবণতা দরিদ্র ও অশিক্ষিত জনগণের মধ্যে অধিক। দারিদ্র্যের চক্রের ভিতরে পড়ে দারিদ্র্য যেমন– বাড়ে, তেমনি অশিক্ষিত মানুষের সংখ্যাও বাড়ে। অধিক সন্তানের পরিবারগুলো স্বচ্ছলতার দিকে তো যায়ই না উপরন্তু মাথাপিছু আয় কমতে থাকে। ফলে জনগণের ক্রয়ক্ষমতাও কম। তারা ভাত, কাপড়, থাকার জায়গা, চিকিৎসা, নিরাপত্তা কিছুরই ব্যবস্থা করতে পারে না। আবার দারিদ্র্য ও অধিক সংখ্যা, খাবারের জন্য অধিক মুখ তাদেরকে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত রাখে। মানব সম্পদের উন্নয়নও হয় না। দারিদ্র্যের কারণে মৌলিক চাহিদাই পূরণ করতে পারে না। অধিক জনসংখ্যার কারণে তারা বিভিন্ন প্রাপ্য অধিকার ও সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের আর্থ-সামকাজিক-রাজনৈতিক সমস্যার মূলে রয়েছে অধিক জনসংখ্যা। অধিক জনসংখ্যার কারণে দেশের খাদ্য চাহিদা মোকাবেলা করা সম্ভব হচ্ছে না। প্রতিবছর বাড়ছে বেকারের সংখ্যা। অধিক জনসংখ্যার কারণে সামাজিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছে। বাড়ছে অপরাধ প্রবণতা। জনসংখ্যার বিস্ফোরণের কারণে বাংলাদেশ দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র হতে বের হতে পারছে না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

(ক) নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

(ক) সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন দিন

১। বেকারত্ব সমস্যার প্রধান কারণ–

(ক) কৃষি নির্ভরতা (খ) অধিক জনসংখ্যা

(গ) রাজনৈতিক অস্থিরতা (ঘ) প্রযুক্তিহীনতা

২। দেশের কত ভাগ লোক এখনো নিরক্ষর

(ক) ৬৫ ভাগ (খ) ৪৫ ভাগ

(গ) ৩৫ ভাগ (ঘ) ৫০ ভাগ

৩। জনসংখ্যার চাপে কমে যাচ্ছে

(ক) শিল্পায়নের হার (খ) কৃষি জমি

(গ) মাথাপিছু আয় (ঘ) কোনটি নয়

(খ) রচনামূলক প্রশ্ন

১। অধিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে সৃষ্ট সমস্যাগুলো আলোচনা করুন।

২। 'বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা জনসংখ্যা' উক্তিটির স্বপক্ষে আলোচনা করুন।

(ক) উত্তরমালা

১। (খ), ২। (গ), ৩। (খ)।

পাঠ-৩ : জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের উপায়

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- বাংলাদেশের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের উপায়সমূহ আলোচনা করতে পারবেন।
- জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানে রাষ্ট্র ও নাগরিকের দায়-দায়িত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।

ভূমিকা

বাংলাদেশের মতো দরিদ্র দেশে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ একটি জটিল ব্যাপার। একক ও স্বল্পকালীন কর্মসূচির মাধ্যমে এ সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। এজন্য ব্যাপক ও বহুমুখী কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন। বাংলাদেশের জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানের সম্ভাব্য উপায়সমূহ নিচে আলোচনা করা হলো–

১. **জনসংখ্যা নীতি প্রণয়ন :** বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধি সমস্যার সমাধান স্বল্প সময়ে আশা করা যায় না। এজন্য দরকার সুনির্দিষ্ট নীতি এবং বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা গ্রহণ। সুতরাং জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজন জনসংখ্যা সমস্যা সংক্রান্ত বিভিন্ন গবেষণা তথ্যের আলোকে জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চিত্তবিনোদন প্রভৃতি দিকের প্রতি সমভাবে গুরুত্ব প্রদানপূর্বক বাস্তবায়নযোগ্য করে জনসংখ্যা নীতি প্রণয়ন। বিদেশী সাহায্যনির্ভর এবং বাস্তবতা বিবর্জিত জনসংখ্যা নীতি প্রণয়ন করে এ দেশের জনসংখ্যা সমস্যার সমাধান আশা করা যাবে না।

২. **পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচির সম্প্রসারণ :** দেশে আরো ব্যাপকভাবে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি বৃদ্ধি করতে হবে। আরো অধিক সংখ্যক ক্লিনিক সৃষ্টি, মাঠকর্মী ও ওষুধপত্রের সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। তাহলে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি জনগণের কাছে সহজসাধ্য হবে। তারা অধিক হারে এ পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারবে।

৩. **গণসচেতনতা বৃদ্ধি :** এ কথা অবশ্যই অনস্বীকার্য যে, জনসংখ্যার ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে যতদিন জনগণ সম্পূর্ণভাবে সচেতন না হবে, ততদিন এ সমস্যার সমাধান হবে না। তাই বিভিন্ন সামাজিক শিক্ষা, কর্মসূচি, আলোচনা সভা, বেতার ও টেলিভিশন প্রোগ্রাম, নাটক, যাত্রা, থিয়েটার, জারি গান, কবিগান প্রভৃতির মাধ্যমে এ সমস্যার ভয়াবহতা সম্পর্কে জনগণকে সম্পূর্ণভাবে সচেতন করে তোলার জন্য ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করা উচিত। তাছাড়া এ সকল প্রচেষ্টা জনগণের চিত্তবিনোদনের ক্ষেত্রে অবদান রাখবে।

৪. **জনশিক্ষা কার্যক্রম :** জনসংখ্যার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বাল্যকাল থেকেই সচেতন করার জন্য জনসংখ্যা শিক্ষা কার্যক্রম চালু করা উচিত। এজন্য প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত পাঠ্যসূচিতে 'জনসংখ্যা শিক্ষা'কে সম্পূর্ণ আলাদা এবং বাধ্যতামূলক পাঠ্য বিষয় হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা দরকার।

৫. **জীবনমান উন্নয়ন :** বাংলাদেশে জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানের অন্যতম উপায় হচ্ছে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করে দেশের দরিদ্র শ্রেণীর জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন করা এবং এর দ্বারা তাদের মধ্যে সীমিত পরিবারের আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করা। অন্যথায় তাদের অধিক সন্তান জন্মদানের প্রবণতা হ্রাস করা যাবে না।

৬. **মহিলাদের শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ :** বাংলাদেশের আর্থ–সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় অবস্থার প্রেক্ষাপটে সমাজে নারীদের মর্যাদা বৃদ্ধি ছাড়া জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয়। নারীশিক্ষা এবং নারীদের কর্মসংস্থান সন্তান ধারণ এবং জন্মনিয়ন্ত্রণের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে। সুতরাং নারীদের শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করলে তা জনসংখ্যাস্ফীতি হ্রাসে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করবে।

৭. **খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন :** জনসংখ্যা হ্রাসের জন্য দরকার আমাদের খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করে প্রজনন ক্ষমতা হ্রাস করা। এজন্য চিরাচরিত খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন এবং বিকল্প খাদ্য তালিকা প্রণয়ন করে তা প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে। তাছাড়া এলাকাভিত্তিক খাদ্যমেলা বা খাদ্য প্রদর্শনীর আয়োজন করে তাতে জনগণকে সম্পৃক্ত করে তাদের মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গিতে গঠনমূলক পরিবর্তন আনয়নের পদক্ষেপ নিতে হবে।

৮. **বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ রোধ :** জনসংখ্যা সমস্যা প্রতিরোধ করতে হলে যে কোনো মূল্যে বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ প্রতিরোধ করতে হবে। প্রয়োজনবোধে এর বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৯. **কৃষির আধুনিকীকরণ :** এ দেশের কৃষি ব্যবস্থা এখনো অনুন্নত এবং সনাতন পদ্ধতিতে পরিচালিত হচ্ছে। পুরাতন পদ্ধতিতে চাষাবাদ করলে অধিক সংখ্যক কৃষকের প্রয়োজন পড়ে। ফলে গ্রাম্য কৃষক কৃষি কাজের সুবিধার্থে অধিক সন্তান জন্ম দেয়। কাজেই জনসংখ্যা সমস্যাকে কার্যকরভাবে মোকাবিলা করতে হলে কৃষি ব্যবস্থাকে যান্ত্রিক ও আধুনিক করতে হবে।

১০. **চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা :** চিত্তবিনোদনের অভাব বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান কারণ। তাই গ্রামীণ পর্যায়ে টিভি, সিনেমা, খেলাধুলা প্রভৃতি চিত্তবিনোদনের মাধ্যমগুলোকে পরিকল্পিত উপায়ে সম্প্রসারণ করতে হবে।

১১. **শিশুমৃত্যুর উচ্চহার রোধ :** বাংলাদেশে অধিক হারে শিশুমৃত্যুর কারণে পিতা-মাতা অধিক সংখ্যক সন্তান প্রত্যাশা করে থাকে। তাই শিশু মৃত্যু রোধকল্পে পর্যাপ্ত পরিমাণ চিকিৎসার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

১২. **বৃদ্ধদের ভাতা প্রদান :** বৃদ্ধদের ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। যাতে করে বৃদ্ধকালের মূলধন হিসাবে মানুষ সন্তান জন্ম না দেয়।

১৩. **ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন :** জন্মহার নির্ধারণের ক্ষেত্রে ধর্মীয় অনুশাসন এবং ধর্মীয় অনুভূতি বিশেষ প্রভাব বিস্তারকারী চলক হিসেবে বিবেচিত। ধর্মীয় অনুভূতি এবং অনুশাসনের প্রভাবে বাংলাদেশের ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা পরিবার পরিকল্পনার ক্ষেত্রে কম উৎসাহী। জনসংখ্যা সমস্যা সম্পর্কে বাংলাদেশের ধর্মভীরু জনগণের যথাযথ ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ছাড়া জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি সম্ভব নয়।

১৪. **সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির সম্প্রসারণ :** বাংলাদেশে বৃদ্ধ বয়সে নিরাপত্তাহীনতার কারণে যাতে জনগণ অধিক সন্তানের জন্ম না দেয়, তার জন্য দেশে ব্যাপক সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি চালু ও জোরদার করা প্রয়োজন।

১৫. **আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ :** বাংলাদেশের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য যে সকল আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে, ক. বর্তমানে প্রচলিত বিবাহের সর্বনিম্ন বয়স মেয়েদের ক্ষেত্রে ১৮ থেকে ২২ এবং ছেলেদের ক্ষেত্রে ২১ থেকে ৩০ বছর করার আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ। খ. ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইনের যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রতিটি বিবাহ রেজিস্ট্রিকরণ এবং বহুবিবাহ রোধ করা। গ. জন্ম এবং মৃত্যুর যথাযথ রেজিস্ট্রেশনের ব্যবস্থা করা, যাতে বিবাহের সময় যথাযথ বয়স নির্ধারণ করা যায়। ঘ. সরকারি চাকরিতে নিয়োগ, বদল, রেশন, গৃহ বরাদ্দ, কৃষিঋণ, ত্রাণ ও সরকারি সাহায্য প্রদানের ক্ষেত্রে পরিকল্পিত পরিবারগুলোকে অগ্রাধিকারের ব্যবস্থা করা। ঙ. পরিবার পরিকল্পনার আদর্শ যাতে আরো গ্রহণীয় হয়ে ওঠে সেজন্য বাস্তবসম্মত আইনগত উৎসাহব্যঞ্জক এবং নিরুৎসাহব্যঞ্জক ব্যবস্থার প্রয়োগ করা। যেমন– শিক্ষাভাতা, স্বাস্থ্যভাতা প্রভৃতি ক্ষেত্রে দু'সন্তানের পরিবারকে অগ্রাধিকার প্রদান করা। চ. ব্যক্তিগত, দলগত এবং সমষ্টিগতভাবে জনসংখ্যা নীতির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অবদান রাখার জন্য পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা করা, যাতে জনগণ প্রত্যক্ষভাবে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের ফল ভোগ করতে পারে। ছ. চাকরির ক্ষেত্রে সরকারঘোষিত মহিলা কোটা যথাযথভাবে বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

১৬. **জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের সুষ্ঠু সমন্বয় সাধন :** বাংলাদেশে সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে দেশী-বিদেশী অসংখ্য সংস্থা জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়নে নিয়োজিত রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানের কর্মসূচির পুনরাবৃত্তি এবং সম্পদ ও সময়ের অপচয় রোধকল্পে সরকারি পর্যায়ে সুষ্ঠু সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। এতে করে দেশে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম আরো জোরদার হবে।

বাংলাদেশে জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানে নাগরিক দায়-দায়িত্ব

জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ করতে হবে এবং কাম্য জনসংখ্যা গড়ে তুলতে হবে। জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করতে হবে– এজন্য প্রয়োজন নাগরিক সচেতনতা। আমাদেরকে ভাবতে হবে যে, কেবল আমরা নই আমাদের বংশধরেরাও যেন খেতে ও পরে ভালো থাকতে পারে।

বাংলাদেশে জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানে রাষ্ট্রের দায় দায়িত্ব

জনসংখ্যাধিক্য সমস্যা সমাধানের জন্য রাষ্ট্রকে সবচেয়ে বেশি দায়-দায়িত্ব পালন করতে হবে। যেসব ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের দায়িত্ব সর্বাধিক সেগুলো নিচে আলোচনা করা হলো :

১. নাগরিক সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সরকারকে বাধ্যতমূলক প্রাথমিক শিক্ষাসহ সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা চালু করতে হবে।

২. দারিদ্র্য দুরীকরণের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৩. অর্থনৈতিক উন্নয়ন তথা জাতীয় মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির জন্য সুপরিকল্পিতভাবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

৪. পরিবার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য সরকারি দায়িত্বের বিকল্প নেই।

৫. জনশক্তি বিদেশে রপ্তানির জন্য জনশক্তি মন্ত্রণালয়ের যথাযথ ভূমিকা পালন করতে হবে।

৬. গঠনমূলক আইন পাস করতে হবে।

৭. সর্বোপরি বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমগুলোর মাধ্যমে ব্যাপক প্রচার চালাতে হবে।

সারসংক্ষেপ

জনসংখ্যা সমস্যা বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান সমস্যা। জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচির সম্প্রসারণের পাশাপাশি গণসচেতনতা বাড়াতে হবে। শিক্ষার বিস্তার ও সুস্থ বিনোদনের ব্যবস্থা করতে হবে। সংকীর্ণ ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি পরিহার করতে হবে। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে রাষ্ট্র ও নাগরিককে একইসঙ্গে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

(ক) সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন

১। বিবাহ রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক নয়।

২। ১৯৭৮ সালে জনসংখ্যা সমস্যাকে এক নম্বর সমস্যা হিসেবে ঘোষণা দেয়া হয়।

৩। পরিবার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সরকারি দায়িত্বের বিকল্প নাই।

৪। জনসংখ্যা সমস্যার সমাধান স্বল্প সময়ে করা সম্ভব নয়।

৫। উচ্চ শিশু ও মৃত্যুহার জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য দায়ী নয়।

(খ) রচনামূলক প্রশ্ন

১। জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানের উপায়সমূহ বর্ণনা করুন।

২। জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানে রাষ্ট্র ও নাগরিকের দায়িত্ব ব্যাখ্যা করুন।

(ক) সত্য-মিথ্যার উত্তর :

১। মি, ২। মি, ৩। স, ৪। স, ৫। মি

ইউনিট
১৯

শিক্ষা ও মানবসম্পদ উন্নয়ন

ভূমিকা

মানবসম্পদ প্রতিটি জাতির জন্য আশীর্বাদস্বরূপ। জনসংখ্যা যতক্ষণ পর্যন্ত মানবসম্পদে পরিণত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তা জাতির বোঝা। জাতীয় উন্নয়নের জন্য মানবসম্পদ উন্নয়নের বিকল্প নেই। মানবসম্পদ উন্নয়নে শিক্ষাই প্রধান ভূমিকা পালন করে। শিক্ষা ছাড়া কোন দেশ, জাতি উন্নতি করতে পারে না। নিরক্ষরতা ও অশিক্ষা জাতির জন্য অভিশাপ। বাংলাদেশে শিক্ষার তেমন বিকাশ ঘটেনি। স্বাক্ষরতার হার ৬৫ ভাগ। প্রকৃত শিক্ষার হার আরো কম। কাজেই এ দেশের জনসংখ্যা এখনো মানবসম্পদে পরিণত হতে পারেনি। বর্তমান অধ্যায়ে নিম্নোক্ত পাঠসমূহ আলোচনা করা হলো :

পাঠ-১ : মানবসম্পদ : তত্ত্বীয় আলোচনা।
পাঠ-২ : মানবসম্পদ উন্নয়নে শিক্ষার গুরুত্ব।
পাঠ-৩ : বাংলাদেশের শিক্ষা সমস্যা।

পাঠ-১ : মানবসম্পদ : তত্ত্বীয় আলোচনা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- মানবসম্পদ বলতে কি বুঝায় তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন ।
- মানব কখন মানবসম্পদে পরিণত হয় তা বিশ্লেষণ করতে পারবেন ।
- মানবসম্পদ উন্নয়নের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন ।
- মানবসম্পদ উন্নয়নের উপায় আলোচনা করতে পারবেন ।

ভূমিকা

মানবসম্পদ বলতে কী বুঝায় সে সম্পর্কে বিশেষজ্ঞগণ তাদের নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ থেকে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন । বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ পল জে মায়ার বলছেন, 'The greatest natural resource of our country is its people' আধুনিক অর্থনীতিবিদগণ মনে করেন, অন্যান্য সম্পদের মতো মানুষও জাতির সম্পদ । বিভিন্ন অর্থনৈতিক সমীক্ষা ও বিশ্লেষণ থেকে দেখা গেছে, কোনো দেশের জাতীয় আয় (GNP) যেমন– তার প্রাকৃতিক সম্পদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ঠিক তেমনি দেশের মানুষের গুণগত মানের সঙ্গেও সম্পর্কযুক্ত । অর্থাৎ সমাজে বসবাসকারী ব্যক্তিদের ছাড়া সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নতি কোনো ক্রমেই সম্ভব নয় । সমাজের উন্নয়নে প্রকৃতপক্ষে অর্থ ও বস্তুসম্পদের মতো ব্যবহৃত হচ্ছে মানবসম্পদ । বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী কার্ল মার্কস মানুষকে তাই মানবীয় মূলধন (Human capital) হিসেবে বিবেচনা করেছেন । এই মানবীয় মূলধনকে আধুনিক পরিভাষায় মানবসম্পদ (Human resource) হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে । মানবশক্তি তখনই মানবসম্পদে রূপান্তরিত হয়, যখন তাকে সুপরিকল্পিতভাবে পরিচালনা করা যায় ।

মানব কখন 'মানবসম্পদ' হিসেবে বিবেচিত হবে?

মানবসম্পদ (Human resource) সম্পূর্ণভাবে স্বাভাবিক বা জন্মগত নয় । সাধারণ মানুষ বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করে মানবসম্পদে পরিণত হয় । মানুষ এবং মানবসম্পদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে । যেমন–

১. কোনো ব্যক্তিকে তখনই সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করা হবে যখন সে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হবে । মানবসম্পদের একটি প্রয়োজনীয় উপাদান হলো স্বাস্থ্য বা দৈহিক সামর্থ্য ।

২. কোনো ব্যক্তিকে তখনই সামাজিক দিক থেকে উপযোগী বা সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করা হবে যখন সে সামাজিক কোনো না কোনো উৎপাদন প্রক্রিয়ায় দক্ষতার সঙ্গে অংশগ্রহণ করতে পারবে ।

৩. প্রত্যেক মানুষের সাধারণ মানসিক ক্ষমতার সঙ্গে কিছু না কিছু বিশেষ মানসিক ক্ষমতা থাকে । এই বিশেষ মানসিক ক্ষমতা তাকে কোনো বিশেষ কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে সহায়তা করে । এই বিশেষ মানসিক ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তিকে মানবসম্পদ বলা হয় ।

৪. মানবকে সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করার একটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য উপাদান হচ্ছে স্বাক্ষরতা (Literacy) । কোনো ব্যক্তিকে সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করা হবে তখনই যখন সে সামাজিক নির্দিষ্ট মান অনুযায়ী স্বাক্ষরতা অর্জন করবে ।

মানবসম্পদ উন্নয়ন কী?

মানবসম্পদ উন্নয়ন হলো জনসম্পদের এমন এক গুণগত পরিবর্তন প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে তারা উৎপাদনক্ষম ও দক্ষ জনশক্তি হিসেবে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ক্রমবর্ধিষ্ণুভাবে বলিষ্ঠ অবদান রাখতে পারে এবং মানবীয় শক্তি-

সামর্থ্যের সর্বোত্তম বিকাশে সক্ষম হয়ে উঠতে পারে। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO) মানবসম্পদ উন্নয়ন বলতে ব্যক্তিকে কর্মে নিযুক্ত করার সম্ভাবনা বৃদ্ধির প্রক্রিয়া হিসেবে বিবেচনা করেছে। বিশ্বব্যাংকের মতে মানবসম্পদ উন্নয়ন হলো, কোনো রাষ্ট্রের মানুষের সামগ্রিক বিকাশ প্রক্রিয়ার একটি অংশ, যার মাধ্যমে রাষ্ট্রের সমগ্র জনসংখ্যার কর্মে নিযুক্তির সম্ভাবনা বাড়ানো যায় এবং তার মাধ্যমে সামাজিক অসাম্য দূর করা যায়। (Human Resource development is a complementary approach to other development strategies, particuiarly employment and reduction of inequalities)। সামাজিক অসাম্য বিষয়টি অর্থনৈতিক দর্শনের সাথে প্রধানত জড়িত হলেও এক্ষেত্রে বলার কথা এই যে, মানবসম্পদ উন্নত হলে সমাজে সকল মানুষের ন্যূনতম কল্যাণ নিশ্চিত করা যায়। ফ্রেডারিক হার্বিসন ও চার্লস এ মায়ার্স-এর মতে, 'মানবসম্পদ উন্নয়ন বলতে এমন এক প্রক্রিয়াকে বুঝায় যার মাধ্যমে কোনো সমাজের সকল মানুষের জ্ঞান, দক্ষতা ও ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।' (Human Resource development is the preocess of increasing the knowledge, the skill and the capacities of all the people in a society.)

মানবসম্পদ উন্নয়নের গুরুত্ব

উন্নয়নের মূলে রয়েছে মানুষ। তাই পল্লী উন্নয়ন, প্রাকৃতিক সম্পদ উন্নয়ন, কৃষি উন্নয়ন, শিল্প উন্নয়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে অবদান রাখতে হবে মানুষকেই এবং উন্নয়ন ঘটাবে মানুষ। অতএব দেশে যত রকমের বস্তুসম্পদ এবং সম্ভাবনা থাকুক না কেন যতক্ষণ মানুষ এ সম্পদ আহরণ এবং ব্যবহার উপযোগী করতে না পারবে ততক্ষণ আমরা এ সেবা থেকে বঞ্চিত থাকবো। তাই দেশের জনসংখ্যাকে মানবসম্পদে পরিণত করতে হবে। মানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নে মানবসম্পদ উন্নয়ন তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখে।

'৬০-এর দশকে সাহায্যদাতা সংস্থাগুলো মানবসম্পদ উন্নয়নকে একটি সার্বিক উন্নতি এবং আধুনিকায়নের 'ইঞ্জিন' হিসেবে গণ্য করত। বর্তমানে যে কোনো দেশের জনগোষ্ঠী সেই দেশের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হয়। সীমিত ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদের দেশ জাপান, হংকং, সিঙ্গাপুর ও নেদারল্যাণ্ড প্রমাণ করেছে যে, একটি দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও সামগ্রিক উন্নয়ন নির্ভর করে জনগণের দক্ষতা, পরিশ্রম ও উদ্যোগের ওপর। সুতরাং বলা যায় যে, উন্নয়ন প্রকৃতপক্ষে মানুষের দ্বারাই সংঘটিত হয়। অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদ যদিও গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু টেকসই উন্নয়নের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় বা যথেষ্ট নয়। সম্পদের অপ্রতুলতা দ্রুত উন্নয়নের জন্য অলঙ্ঘনীয় বাধা নয়। একটি দেশের উন্নয়ন অনেকটা নির্ভর করে সে দেশের মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং মানবসম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের ওপর।

মানবসম্পদ উন্নয়নের উপায়

হার্বিসন এবং মায়ার্স তাদের গবেষণায় মানবসম্পদ উন্নয়নের ৫টি উপায় উল্লেখ করেছেন। যথা–

১. **আনুষ্ঠানিক শিক্ষা :** প্রাথমিক শিক্ষা স্তর থেকে শুরু করে বিভিন্ন কাঠামোর মাধ্যমিক শিক্ষা এবং কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চ পর্যায়ের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত শিক্ষাকে বোঝানো হয়েছে।

২. **কর্মকালীন প্রশিক্ষণ :** ধারাবাহিক বা উপানুষ্ঠানিক পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করা।

৩. **আত্ম উন্নয়ন :** যেমন– জ্ঞান, দক্ষতা ও সামর্থ্যের উন্নয়ন যা ব্যক্তি তার নিজের চেষ্টায় আনুষ্ঠানিক উপায়ে অথবা দূরশিক্ষণ পদ্ধতিতে অনানুষ্ঠানিক উপায়ে পড়ে বা অন্যের কাছ থেকে শিখে নিজের আগ্রহ ও কৌতূহল অনুযায়ী ব্যাপক গুণমান, দক্ষতা ও যোগ্যতা অর্জনের মাধ্যমে নিজেকে তৈরি করে।

৪. **স্বাস্থ্য উন্নয়ন :** উন্নততর চিকিৎসা ব্যবস্থা এবং গণস্বাস্থ্য কার্যক্রমের মাধ্যমে কর্মরত জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য উন্নয়ন।

৫. **পুষ্টি উন্নয়ন :** পুষ্টি মানুষের কর্মদক্ষতা বাড়িয়ে দেয়। ফলে মানুষ অধিক সময় ধরে কাজ করতে পারে এবং তার কর্মজীবন দীর্ঘ হয়।

৬. সুনীতি শিক্ষার সম্প্রসারণ।

৭. যৌক্তিকতাবোধ জাগ্রতকরণ তথা বিবেক-বিবেচনাবোধ সম্পন্ন মানস গঠন।

৮. দেশপ্রেমের দীক্ষা প্রদান।

সারসংক্ষেপ

মানবসম্পদ উন্নয়ন ছাড়া জাতীয় উন্নয়ন অসম্ভব। প্রতিটি দেশেরই জনসংখ্যা রয়েছে। তবে সব দেশের জনসংখ্যা মানবসম্পদ নয়। মানবসম্পদ উন্নয়ন হলো এমন এক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে সমাজের সকল মানুষের জ্ঞান, দক্ষতা ও ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য আনুষ্ঠানিক ও কর্মমুখী শিক্ষা প্রয়োজন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

(ক) শূন্যস্থান পূরণ করুন

১। ----- মানুষের কর্মদক্ষতা বাড়িয়ে দেয়।

২। হার্বিসন ও মায়ার্স মানবসম্পদ উন্নয়নে ----- টি উপায়ের কথা বলেছেন।

৩। একটি দেশের উন্নয়ন নির্ভর করে সে দেশের ----- উন্নয়নের ওপর।

৪। ----- মানবসম্পদ উন্নয়নের প্রধান হাতিয়ার।

৫। মানবসম্পদের ----- ব্যবহারের ওপর জাতীয় উন্নয়ন নির্ভর করে।

(খ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। মানবসম্পদ উন্নয়ন বলতে কি বুঝায়?

২। মানবসম্পদ উন্নয়নের উপায়গুলো কি কি?

৩। মানব কখন সম্পদে পরিণত হয়?

৪। মানবসম্পদ উন্নয়নের গুরুত্ব সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

(গ) রচনামূলক প্রশ্ন

১। মানবসম্পদ উন্নয়ন বলতে কি বুঝায়? মানবসম্পদ উন্নয়নের গুরুত্ব লিখুন?

(ক) উত্তরমালা

১। পুষ্টি, ২। ৫, ৩। মানবসম্পদের, ৪। শিক্ষা, ৫। সুষ্ঠু

পাঠ-২ : মানবসম্পদ উন্নয়নে শিক্ষার গুরুত্ব

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- মানবসম্পদ উন্নয়নে শিক্ষার ভূমিকা আলোচনা করতে পারবেন ।
- কিভাবে শিক্ষা ব্যক্তিকে সম্পদে পরিণত করে তা বিশ্লেষণ করতে পারবেন ।

ভূমিকা

মানবসম্পদ উন্নয়নে মুখ্য উপাদান হলো শিক্ষা । কোন দেশের জনসংখ্যা অনেক বেশি হলেও তাকে মানবসম্পদ বলা যাবে না যে পর্যন্ত না এর বিশাল জনগোষ্ঠী শিক্ষিত, দক্ষ ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হয় । শিক্ষা মানুষের গুণগত পরিবর্তন সাধন করে তাকে দক্ষ জনশক্তিকে রূপান্তরিত করে । শিক্ষা মানুষের সুপ্ত প্রতিভাকে জাগ্রত করে প্রাকৃতিক সম্পদের মতো মানুষকেও সম্পদে পরিণত করে । বাংলাদেশ বিভিন্ন প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেও মানবসম্পদ উন্নয়নে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে । নিম্নে মানবসম্পদ উন্নয়নে শিক্ষার ভূমিকা আলোচনা করা হলো :

১. **আত্মনির্ভরতা অর্জন :** শিক্ষা ব্যক্তির সুপ্ত প্রতিভাকে জাগ্রত করে । শিক্ষার মাধ্যমেই ব্যক্তি জ্ঞান আহরণের পথ খুঁজে পায় । আত্মনির্ভরতা সৃষ্টি হয় । নিরক্ষর ব্যক্তির জ্ঞান আহরণের পথ অত্যন্ত কম । পাঠে অক্ষম বলে নিরক্ষর ব্যক্তি কেবল অন্যের কথা, আলাপ-আলোচনা শুনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে । নিরক্ষর ব্যক্তি অন্যের উপর নির্ভরশীল বলে স্বার্থান্বেষী মহল সহজেই নিরক্ষরদের বিভ্রান্ত ও প্রতারিত করতে পারে । কিন্তু শিক্ষিত ব্যক্তি আত্মনির্ভর । সে সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে বিভিন্ন বিষয় চিন্তা-ভাবনা করে । নিজের ওপর আস্থা রাখে । তার প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা কম ।

২. **পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি :** শিক্ষা মানুষের মধ্যে পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করে । শিক্ষিত ব্যক্তি সারা বিশ্বের আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন ও তথ্যপ্রযুক্তিগত উন্নয়ন সম্পর্কে ধারণা রাখে । এসব বিষয় তার মধ্যেও পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করে ।

৩. **পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা :** মানব সভ্যতার ইতিহাসে স্বাক্ষরতা অর্জনের আগে ও পরে সমাজের মধ্যে গুণগত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় । সংক্ষেপে বলা যায়, একজন স্বাক্ষর ব্যক্তি যোগাযোগ স্থাপনে অধিকতর ক্ষমতার অধিকারী, সচেতনতায় তীক্ষ্ণধী এবং পরিবেশের ওপর অধিক নিয়ন্ত্রণের অধিকারী । শিক্ষা মানুষকে আবেগ ও সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে স্বচ্ছ চিন্তা করতে শেখায় । এর ফলে তারা ব্যক্তিগত এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থার বিশ্লেষণ করে সঠিক কর্মপন্থা উদ্ভাবন এবং সুচিন্তিত পরিকল্পনা প্রণয়নে সক্ষম হয় । ফলে তারা ব্যক্তিগত ও সামাজিক উন্নয়নে যথাযথ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয় ।

৪. **সার্বিক সচেতনতা সৃষ্টি :** শিক্ষা মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি উদার ও গণতান্ত্রিক করতে সাহায্য করে । শিক্ষা মানুষের চেতনার উন্মোষ ঘটায় । পত্রপত্রিকা পাঠ, আলাপ-আলোচনা এবং জ্ঞানী ব্যক্তিদের সঙ্গে মতবিনিময়ের ফলে ব্যক্তি জীবনের ওপর সমাজের প্রভাব এবং সমাজের প্রতি ব্যক্তির দায়িত্ব সম্পর্কে অধিক সচেতন হয় । তারা বুঝতে শেখে ব্যক্তির স্বার্থ সমষ্টির স্বার্থের মধ্যে নিহিত, তখন তারা সমাজের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে ভাবতে শেখে এবং সমাজ উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের জন্য এগিয়ে আসে । মানুষ উপলব্ধি করে আর্থ-সামাজিক জীবনের সাফল্য অর্জনের ক্ষেত্রে একক প্রচেষ্টার চেয়ে যৌথ উদ্যোগ অধিকতর ফলপ্রসূ । এই উপলব্ধি থেকেই তারা সংঘবদ্ধ হতে শিখে এবং ঈপ্সিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য সমাজসেবী সংগঠন, সমিতি ও অন্যান্য সমবায় সংগঠন গড়তে উদ্যোগী হয় ।

৫. **নাগরিক অধিকার ও দায়িত্ববোধের বিকাশ ঘটায় :** শিক্ষার মাধ্যমে জনগণ নাগরিক দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে জানে এবং দায়িত্ব পালনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে । অন্যদিকে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে তারা নিজেদের অধিকার প্রয়োগ ও প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হয় । সুশিক্ষিত ব্যক্তি গড্ডালিকা প্রবাহে ভেসে না গিয়ে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে নিজেদের মতামত প্রকাশ করতে পারে ।

৬. **কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি :** একজন স্বাক্ষরকর্মী নিরক্ষরকর্মীর চেয়ে অধিকতর 'কর্মদক্ষ'। কারণ সাক্ষর ব্যক্তির চিন্তা ও বিচার-বিশ্লেষণ, আত্মমূল্যায়ন ও সংশোধন এবং কর্মজীবনের কর্মসম্পাদন ও কর্মসূচি গ্রহণের ক্ষমতা নিরক্ষর ব্যক্তির চেয়ে অনেক বেশি। তাছাড়া নিজ পেশা সংক্রান্ত পুস্তক-পুস্তিকা পাঠ এবং উচ্চতর প্রশিক্ষণের মাধ্যমেও স্বাক্ষর ব্যক্তি তার কর্মদক্ষতা বাড়াতে সক্ষম হয়। দক্ষতা বৃদ্ধির সঙ্গে আয় বৃদ্ধির সম্পর্ক রয়েছে এবং আয় বৃদ্ধির সঙ্গে কাজের আনন্দ বিদ্যমান। এই কাজের আনন্দই কর্মীর কর্মনৈপুণ্য আরো বাড়িয়ে দেয়। তাছাড়া শিক্ষা মানুষের আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি করে এবং নতুন আকাঙ্ক্ষার জন্ম দেয়।

৭. **সামাজিক উন্নয়নে সহায়তা :** সর্বজনীন শিক্ষা সুষম সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অপেক্ষাকৃত কম আয়ের মানুষরা সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা পেলে শুধু যে তাদের আয় বাড়ানোর সুযোগ পায় তাই নয়, শিশু মৃত্যুর হার কমানো, স্বাস্থ্য সুবিধা গ্রহণ ও সামাজিক উন্নয়নের অন্যান্য সুযোগ গ্রহণের সুবিধা পেয়ে থাকে। এর ফলে তাদের জীবনের মান তারা কিছুটা বাড়াতে সক্ষম হয়।

৮. **স্বাস্থ্যবিধি ও পরিবার পরিকল্পনা :** নিরক্ষরদের চেয়ে স্বাক্ষর ব্যক্তি স্বাস্থ্য সম্পর্কে অধিক সচেতন। স্বাক্ষর ব্যক্তি স্বাস্থ্যহানির কুফল সম্পর্কে অধিকতর সচেতন বলে রোগ-প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা মেনে চলার চেষ্টা করে। অন্যদিকে নিরক্ষর ব্যক্তিরা স্বাস্থ্য রক্ষার উপায় সম্পর্কে উদাসীন থেকে প্রতিরোধযোগ্য রোগের কবলে পড়ে স্বাস্থ্য ও কর্মদক্ষতা দুই-ই হারায়। শিক্ষিত ব্যক্তিরা পরিকল্পিত পরিবারের সুফল সম্পর্কে সচেতন ও পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করে বলেই তাদের পরিবারের সদস্য সংখ্যা সীমিত থাকে। এ ব্যাপারে অধিকাংশ নিরক্ষর উদাসীন থাকে বলে তাদের পরিবারের সদস্য সংখ্যা পরিকল্পিতভাবে বাড়তে থাকে। ফলে তাদের পারিবারিক জীবন সংকটে পতিত হয়।

৯. **জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন :** শিক্ষা মানুষকে আত্মসচেতন করে তোলে এবং স্বাস্থ্যকর ও সুন্দর জীবনযাপনের প্রেরণা যোগায়। জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে মানুষ অন্যের পরিবেশকে জানতে পারে। ফলে তারা নিজেকে অন্যের সঙ্গে তুলনা করতে পারে এবং নিজের জীবনযাত্রার মান মূল্যায়ন করে তার সার্বিক মানোন্নয়নের জন্য উদ্যোগী হয়। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তারা পরিবারের আকৃতি ছোট রেখে পোষ্যদের জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা ইত্যাদির সংস্থান করতে সচেষ্ট হয় অন্যদিকে নিরক্ষর মানুষ রোগ, শোক, দারিদ্র্য ইত্যাদিকে ভাগ্যের ফল হিসেবে গ্রহণ করে এবং সমাজে মানবেতর জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়।

১০. **সুনীতি শিক্ষা ও দেশপ্রেমে দীক্ষা :** সুনীতি ও দেশপ্রেমের দীক্ষার জন্য সুশিক্ষার বিস্তার ঘটাতে হবে। মানুষের মধ্যে নৈতিকতাবোধ জোরালো হলে এবং দেশপ্রেম জাগ্রত থাকলে সে দুর্নীতি থেকে দূরে থাকবে। এ ধরনের ব্যক্তি অর্থাৎ সুশিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তি প্রকৃত মানবসম্পদে পরিণত হবে।

সারসংক্ষেপ

মানবসম্পদ উন্নয়নে শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। শিক্ষা ব্যক্তির গুণগত পরিবর্তন সাধন করে তাকে দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করে। শিক্ষা ব্যক্তির সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটায়। ব্যক্তির মধ্যে পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করে। শিক্ষার মাধ্যমেই ব্যক্তি স্বাস্থ্যবিধি ও নাগরিক অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। ব্যক্তি তথ্য প্রযুক্তিগত জ্ঞান লাভ করে শিক্ষার মাধ্যমেই।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

(ক) নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। মানবসম্পদ উন্নয়নে মুখ্য ভূমিকা পালন করে–

(ক) গণমাধ্যম (খ) রাজনৈতিক সচেতনতা

(গ) শিক্ষা (ঘ) অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড

২। শিক্ষার প্রয়োজন–

(ক) আত্মনির্ভরতা সৃষ্টির জন্য (খ) দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য

(গ) সচেতনতা সৃষ্টির করতে (ঘ) উপরের সবকটি

৩। কে বেশি স্বাস্থ্য সচেতন?

(ক) অশিক্ষিত ব্যক্তি (ঘ) ধনী ব্যক্তি

(গ) শিক্ষিত ব্যক্তি (ঘ) মোটা ব্যক্তি

(খ) রচনামূলক প্রশ্ন

১। মানবসম্পদ উন্নয়নে শিক্ষার অবদান আলোচনা করুন।

২। কিভাবে শিক্ষা ব্যক্তিকে সম্পদে পরিণত করে ব্যাখ্যা করুন।

(ক) উত্তরমালা

১। (গ), ২। (ঘ), ৩। (গ)

পাঠ-৩ : বাংলাদেশের শিক্ষা সমস্যা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- বাংলাদেশ শিক্ষাক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- শিক্ষা সমস্যা দূরীকরণের উপায় আলোচনা করতে পারবেন।

ভূমিকা

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। শিক্ষা ছাড়া কোন জাতি উন্নয়ন করতে পারে না। বলা হয়ে থাকে, শিক্ষা 'পুঁজি বিনিয়োগের সর্বশ্রেষ্ঠ ক্ষেত্র।' অর্থাৎ ব্যক্তির বিকাশে শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যয় করলে সর্বাধিক লাভ পাওয়া যায়। প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ C. P. Snow বলেছেন, আমাদের শিক্ষিত হতে হবে, অন্যথায় ধ্বংস অনিবার্য। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল রাষ্ট্রে সকল উন্নয়নের ভিত্তি শিক্ষা। উন্নয়নশীল বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রের মতো বাংলাদেশেও শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যাপক সমস্যা বিদ্যমান। নিম্নে বাংলাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে বিদ্যমান মৌলিক সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করা হলো–

বাংলাদেশের শিক্ষা সমস্যা

পাঠ্য-পুস্তকের সংকট : বই-পুস্তকের সংকট বর্তমানে বাংলাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে অন্যতম মৌলিক সমস্যা। প্রতি বছর দেখা যায়, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষাবর্ষের প্রথম দু'মাস অতিবাহিত হলেও ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে সকল বই পৌঁছে না। দেশের মুষ্টিমেয় রাঘব-বোয়াল নিজস্ব স্বার্থে পুস্তক প্রকাশনাকে একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণের ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা যথাসময়ে তাদের পাঠ্যপুস্তক পায় না।

সেশন জট

আমাদের দেশে শিক্ষাঙ্গনগুলোতে সেশন জট প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করেছে। অতি সামান্য কারণে প্রতিহিংসাপরায়ণ ছাত্র সংগঠনগুলো বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা সৃষ্টি করতে দ্বিধা করছে না। যার ফলে হরতাল, ধর্মঘট, অবরোধ নিত্যনৈতিমিত্তিক ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। অন্যদিকে তথাকথিত ছাত্র নামধারীদের পরীক্ষা পেছানোর আন্দোলনের ফলে ৪ বছরের কোর্স সমাপ্ত করতে কমপক্ষে ৭ বছর সময় লাগছে। সেশন জটের কারণে অতিরিক্ত ৩/৪ বছর সময় ব্যয় করার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সংখ্যাগরিষ্ঠ ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবক এবং সরকার।

শিক্ষাঙ্গনে রাজনীতি

বাংলাদেশের উচ্চ শিক্ষাঙ্গণে ছাত্ররাজনীতির অতীত ইতিহাস অত্যন্ত গৌরবোজ্জ্বল। ১৯৫২-র ভাষা আন্দোলন, ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান এবং ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে ছাত্র নেতৃবৃন্দ ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। কিন্তু পরবর্তীকালে আদর্শ-বিবর্জিত সামরিক-বেসামরিক রাজনীতিকরা নিজেদের রাজনৈতিক ক্ষমতার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে ছাত্ররাজনীতিকে কলুষিত করেছে। ফলে শিক্ষাঙ্গণ পরিণত হয়েছে রণাঙ্গণে। অজস্র ছাত্র প্রাণ হারিয়েছে। তাই বলা যায় কলুষিত ছাত্র রাজনীতি শিক্ষাঙ্গণের সামগ্রিক পরিবেশ বিনষ্ট করেছে।

সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজি

বর্তমানে বাংলাদেশে সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজি নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। ছাত্র নামধারী কতিপয় বখাটে যুবক শিক্ষাঙ্গণে সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজিতে লিপ্ত। তারা কতিপয় রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়া থেকে শিক্ষাঙ্গণে টেণ্ডারবাজি, দরপত্র

জমাদানে বাধা প্রদান, সন্ত্রাস ও চাঁদা আদায়ে লিপ্ত থেকে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীর শিক্ষা অর্জন প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করছে।

কোচিং সেন্টারের দৌরাত্ম্য

বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা মানসম্মত নয়। অনেক কিণ্ডারগার্ডেন, কোচিং সেন্টার, নোট বই ও প্রাইভেট টিউশনি শিক্ষা ব্যবস্থাকে বাণিজ্যে পরিণত করেছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের অনেক শিক্ষক প্রাইভেট টিউশনি ও কোচিং সেন্টারের সাথে জড়িত। ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠ মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত ছাত্র-ছাত্রী ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

সমস্যা প্রতিকারের সুপারিশ : বাংলাদেশের শিক্ষা ক্ষেত্রে সমস্যা সমাধানের জন্য নিম্নের বিষয়গুলো গ্রহণ করা যেতে পারে–

(১) **বিনামূল্যে পাঠ্য-পুস্তক বিতরণ :** বাংলাদেশের অধিক জনসংখ্যা ও ব্যাপক দারিদ্র্যকে সামনে রেখে প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণের সর্বাধিক গুরুত্বের পাশাপাশি বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণের নিশ্চয়তা দিতে হবে। যদিও সরকার প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করেছে। তাছাড়া শুধু শিক্ষাক্ষেত্রে অর্থ বরাদ্দ যথেষ্ট নয়, মানসম্মত শিক্ষক, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান ও বেতনাদি সম্পর্কেও গুরুত্ব দিতে হবে। তাহলেই প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে এবং শিক্ষকদের ও ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি আন্তরিকতা বাড়বে।

(২) **পাঠ্যসূচির আমূল পরিবর্তন :** বাংলাদেশের মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষক্ষেত্রে শিক্ষাসূচির আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন। যা জ্ঞান, দক্ষতা ও মৌলিক উৎকর্ষকে উৎসাহিত করবে। এছাড়া মাধ্যমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে বরাদ্দকৃত বাজেটে ছাত্রবৃত্তি, স্কুল উন্নয়ন পরিকল্পনার বিষয়সমূহের সংযুক্তি আবশ্যক। তাছাড়া কোচিং সেন্টারের দৌরাত্ম্য মোকাবেলায় উপযুক্ত পথ বেছে নিতে হবে।

(৩) **আর্থিক সহযোগিতা দান :** এদেশের অভিভাবকরা দারিদ্র্যের কারণে অনেক সন্তানকে স্কুলে পাঠানোর পরিবর্তে অর্থ আয়ের উদ্দেশ্যে কাজে যেতে বাধ্য করেন। এসব ছাত্রকে স্কুলের প্রতি আকৃষ্ট করে, তাদেরকে স্কুলে ধরে রাখার জন্য বিভিন্ন ধরনের আর্থিক সহযোগিতার ব্যবস্থা করা উচিত।

(৪) **ছাত্র-রাজনীতি পুনর্গঠন :** বাংলাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হলো কলুষিত ছাত্র-রাজনীতি। মূলত শিক্ষাঙ্গণে অস্থিরতা রোধে ও মানসম্মত শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য লেজুড়বৃত্তিক ছাত্র ও শিক্ষক রাজনীতি বন্ধ করা এবং এজন্য রাজনৈতিক দলসমূহের ঐক্য ও সদিচ্ছার বাস্তবায়ন একান্ত জরুরি।

(৫) **তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর শিক্ষা ব্যবস্থা :** নারী-পুরুষের মধ্যে বৈষম্য দূর করার জন্য অধিক হারে নারী শিক্ষক নিয়োগের বর্তমান সরকারি পদক্ষেপের আরো এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। তথ্য-প্রযুক্তির চলমান বিপ্লবের সঙ্গে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে সংযুক্ত করার জন্য শিক্ষাব্যবস্থার আমূল সংস্কার প্রয়োজন। এক্ষেত্রে সরকার ও ব্যক্তি খাতে প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষা কার্যক্রমের প্রসার ঘটাতে হবে।

(৬) **সেশন জট ও নকল দূরীকরণ :** বাংলাদেশের ছাত্ররাজনীতির নেতিবাচক প্রভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সৃষ্ট সেশন জটের কারণে ৩ বছরের কোর্স শেষ করতে ৭ বছর লেগে যায়। এক্ষেত্রে সরকারিভাবে পদক্ষেপ নিতে হবে, যাতে উচ্চ প্রতিষ্ঠানগুলোতে এরূপ সেশন জট না থাকে। আবার সরকারের পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানগুলোকেও এগিয়ে আসতে হবে, যাতে নকলমুক্ত অবস্থায় ছাত্র-ছাত্রীরা পরীক্ষা দিয়ে প্রতি বছর নির্দিষ্ট সময়ে তাদের শিক্ষাবর্ষ সমাপ্ত করতে পারে।

(৭) **বাজেটে শিক্ষা ব্যয় বৃদ্ধি :** শিক্ষা ব্যবস্থার সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য জাতীয় বাজেটে শিক্ষা ব্যয় বৃদ্ধি করতে হবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জাপান শিক্ষাক্ষেত্রে ২৫ ভাগ বরাদ্দ রেখেছিল। আমাদের সেই দৃষ্টান্ত মনে রেখে শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্যয় বৃদ্ধি করতে হবে। তাহলে শিক্ষা উপকরণ ও শিক্ষক সমস্যা দূর হবে।

(৮) **সুষ্ঠু পরিকল্পনা :** শিক্ষার সমস্যা দূরীকরণ ও মানসম্পন্ন শিক্ষা দানের জন্য সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। এজন্য জাতীয় ঐকমত্য গড়ে তুলতে হবে যাতে সরকার পরিবর্তিত হলেও পরিকল্পনার পরিবর্তন হবে না।

সারসংক্ষেপ

মানবসম্পদ উন্নয়নে শিক্ষা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলেও বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় অনেক সমস্যা বিদ্যমান। পাঠ্য-পুস্তক প্রণয়ন, শিক্ষাঙ্গণে সন্ত্রাস, সেশন জট, শিক্ষক সমস্যাসহ বিভিন্ন সমস্যায় আক্রান্ত দেশের শিক্ষাব্যবস্থা। শিক্ষা সমস্যা দূরীকরণের জন্য চাই সুশাসন ও সুষ্ঠু পরিকল্পনা। মনে রাখতে হবে সমস্ত উন্নয়নের ভিত্তি শিক্ষা। কাজেই শিক্ষাকে অবহেলা করে কোন উন্নয়ন সম্ভব নয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

(ক) শূন্যস্থান পূরণ করুন

১। সমস্ত উন্নয়নের ভিত্তি হলো —।

২। শিক্ষা সমস্যা দূর করতে — পরিকল্পনা দরকার।

৩। পাঠ্য-পুস্তক সঙ্কট শিক্ষার অন্যতম — সমস্যা।

৪। আমাদের শিক্ষিত হতে হবে, অন্যথায় — অনিবার্য।

৫। ছাত্ররাজনীতির অতীত ইতিহাস অত্যন্ত —।

(খ) রচনামূলক প্রশ্ন

১। বাংলাদেশের শিক্ষাঙ্গণে বিদ্যমান সমস্যাসমূহ আলোচনা করুন।

২। শিক্ষা সমস্যা দূরীকরণের উপায়গুলো বর্ণনা করুন।

(ক) উত্তরমালা

১। শিক্ষা, ২। সুষ্ঠু, ৩। প্রধান, ৪। ধ্বংস, ৫। উজ্জ্বল

ইউনিট ২০

বেকারত্ব ও নিরক্ষরতা

ভূমিকা

বাংলাদেশে বেকারত্ব একটি অন্যতম আর্থ-সামাজিক সমস্যা। দেশের মোট কর্মক্ষম জনসংখ্যার প্রায় ৪০ ভাগ বেকারত্বের অভিশাপ নিয়ে বাস করছে। এর মধ্যে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশি। সাধারণভাবে, কর্মক্ষম মানুষ প্রচলিত মজুরিতে কাজ করতে ইচ্ছুক থাকা সত্ত্বেও যখন কাজ পায় না তখন তাকে বেকারত্ব বলে। বর্তমান অধ্যায়ে নিম্নোক্ত পাঠসমূহ আলোচনা করা হলো :

পাঠ-১ : বাংলাদেশে বেকার সমস্যার কারণ।
পাঠ-২ : বাংলাদেশের বেকারত্ব সমস্যা সমাধানের উপায়সমূহ।
পাঠ-৩ : আত্মকর্মসংস্থান ও ক্ষুদ্র শিল্প।
পাঠ-৪ : নিরক্ষরতা সৃষ্ট সমস্যা।
পাঠ-৫: নিরক্ষরতার কারণ ও নিরক্ষরতা দূরীকরণের উপায়।

পাঠ-১ : বাংলাদেশে বেকার সমস্যার কারণ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- বেকারত্ব বলতে কি বুঝায় তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- বাংলাদেশে বেকারত্বের প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।
- বাংলাদেশে বেকার সমস্যার কারণসমূহ বাখ্যা করতে পারবেন।

ভূমিকা

বেকারত্ব প্রতিটি জাতির জন্য অভিশাপ। কারণ মানুষ ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কাজের সুযোগ না পেলে মেধা ও সামর্থ্যের অপচয় ঘটে। বেকারত্ব তরুণ সমাজের মধ্যে ভয়াবহ হতাশা তৈরি করে। এতে একদিকে তারুণ্যের অপচয় ঘটে, অন্যদিকে আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটে। বেকারত্ব অসংখ্য সামাজিক সমস্যার জন্ম দেয়।

এককথায় বেকারত্বের সংজ্ঞা দেয়া কঠিন, তবে বলা যায়, যার কর্ম নেই, সে বেকার। আর বেকার ব্যক্তির অবস্থানকেই বেকারত্ব বলে। অর্থাৎ কর্মক্ষম ব্যক্তির কর্মহীনতা হলো বেকারত্ব। সুস্থ, কর্মক্ষম ব্যক্তির কাজ করার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও ব্যক্তির কর্মসংস্থানের অভাবকে বেকারত্ব বলে। তবে, পঙ্গু, প্রতিবন্ধী, অক্ষম, শিশু বা বৃদ্ধের কর্মহীনতাকে বেকারত্ব বলা যায় না।

বাংলাদেশের বেকারত্বের প্রকৃতি

১. **মৌসুমী বেকারত্ব :** আমাদের দেশে ঋতুভিত্তিক বা মৌসুমী বেকারত্ব দেখা যায়। বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে কাজ থাকে এবং বাকি সময় কোন কাজ থাকে না। আমাদের দেশে গ্রামাঞ্চলে ঋতুভিত্তিক বা মৌসুমী বেকারত্বই প্রধান।

২. **প্রচ্ছন্ন বেকারত্ব :** আমাদের দেশে বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ সীমিত হওয়ায় এবং অব্যাহত গতিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে কৃষিক্ষেত্রে প্রয়োজনাতিরিক্ত শ্রমিক কর্মে নিয়োজিত। এই অতিরিক্ত শ্রমিককে কৃষি থেকে অন্যত্র কর্মে নিয়োগ করা যেতে পারে। এই ধরনের বেকারত্বকে প্রচ্ছন্ন বেকারত্ব বলে।

৩. **যান্ত্রিক বেকারত্ব :** নতুন নতুন প্রযুক্তি, যন্ত্রপাতি ও কলাকৌশল শিল্পে ব্যবহারের ফলে অনেক শ্রমিকের কর্মচ্যুতি ঘটে। আবার স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র ব্যবহারের ফলে অনেক শ্রমিক বেকার হয়ে পড়ে, ফলে যান্ত্রিক বেকারত্ব দেখা দিচ্ছে।

৪. **বাণিজ্য চক্রের ফলে বেকারত্ব :** বাণিজ্য চক্রের পরিবর্তনের ফলে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। কোন শিল্পে যখন সমৃদ্ধি আসে তখন উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, ফলে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পায়; আবার শিল্পে ও ব্যবসা বাণিজ্যে মন্দা দেখা দিলে অনেক শ্রমিকের কর্মচ্যুতি ঘটে। এই ধরনের বেকারত্বকে বাণিজ্য চক্রজনিত বেকারত্ব বলে।

৫. **শিক্ষিত বেকারত্ব :** আমাদের দেশে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা খুব বেশি। শ্রম মন্ত্রণালয়ের মতে, দেশে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা প্রায় তিন কোটি।

৬. **ছদ্ম বেকারত্ব :** বাংলাদেশে শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে ছদ্ম বেকারত্ব বিদ্যমান। শিক্ষিত ব্যক্তির শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ না পাওয়াকে শিক্ষিত ব্যক্তির 'ছদ্ম বেকারত্ব' বলে। ছদ্ম বেকাররা মূলত খণ্ডকালীন কাজ করে।

৭. **সংখ্যাজনিত বেকারত্ব :** শ্রমিকেরা এক পেশা ত্যাগ করে অন্য পেশা গ্রহণ করলে কিছু সময় তারা বেকার থাকে। এ অবস্থাকে সংখ্যাজনিত বেকারত্ব বলে।

বাংলাদেশের বেকারত্বের কারণসমূহ

বাংলাদেশে বেকারত্ব একটি গুরুতর আর্থ-সামাজিক সমস্যা, এই সমস্যা কোন একক কারণে সৃষ্টি হয়নি। এই সমস্যার বহুবিধ কারণ রয়েছে। নিম্নে বেকারত্বের কারণসমূহ আলোচনা করা হলো:

১. **জনসংখ্যা বৃদ্ধি :** বাংলাদেশে বেকারত্বের প্রধান কারণ হচ্ছে জনসংখ্যা বৃদ্ধি। বাংলাদেশে যে হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে সে হারে বিনিয়োগ না হওয়ায় ক্রমান্বয়ে বেকারত্ব বাড়ছে। এ দেশে প্রতি বছর শতকরা ১.৪৮ হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে ফি বছর সাড়ে সাত লাখ কর্মসংস্থান সৃষ্টি প্রয়োজন।

২. **প্রকৃতি নির্ভর কৃষি ব্যবস্থা :** বাংলাদেশের কর্মসংস্থানের অন্যতম উৎস হচ্ছে কৃষি। কৃষি ঋতুকালীন কর্মকাণ্ড দ্বারা প্রভাবিত। বাংলাদেশের বেকারত্বের ক্ষেত্রে ঋতুকালীন প্রভাব বিশেষভাবে বিদ্যমান। তাই মৌসুমী বেকারের প্রধান কারণ প্রকৃতি নির্ভর কৃষি ব্যবস্থা।

৩. **অনুন্নত অর্থনীতি :** বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কাঠামো অনুন্নত ও কৃষিনির্ভর। ফলে এদেশে অধিক কর্মসংস্থানের সুযোগ কম। তাই এদেশে বেকারত্ব বাড়ছে।

৪. **অনুন্নত শিল্পায়ন প্রক্রিয়া :** রাজনৈতিক অস্থিরতা, বাস্তবমুখী শিল্পনীতির অনুপস্থিতি, বিদেশী সাহায্য ও প্রযুক্তিনির্ভর অপরিকল্পিত শিল্পায়ন প্রক্রিয়া, ক্রমবর্ধমান শ্রমশক্তির কর্মসংস্থান না হওয়ায় বেকারত্ব ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৫. **কৃষি নির্ভরশীলতা :** বাংলাদেশের অধিকাংশ লোক কৃষির উপর নির্ভরশীল, ফলে এদেশে অর্ধ বেকারত্ব বা প্রচ্ছন্ন বেকারত্ব দেখা যায়।

৬. **কুটির শিল্পের অবলুপ্তি :** আমাদের মত অনুন্নত ও জনবহুল দেশে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে কুটির শিল্পের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু শিল্পায়নের ফলে এদেশে কুটির শিল্পের প্রায় অবলুপ্তি ঘটেছে। আর কুটির শিল্পে নিয়োজিত লক্ষ লক্ষ লোক বেকার হয়ে পড়েছে।

৭. **নিরক্ষরতা ও কারিগরি জ্ঞানের অভাব :** বর্তমান বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির যুগে বাংলাদেশের শ্রমজীবী শ্রেণীর প্রায় সবাই নিরক্ষর এবং কারিগরি জ্ঞান ও দক্ষতা বর্জিত। সেজন্য বাইরে যেমন তারা কর্মসংস্থান করতে পারে না, তেমনি নিজেরাও কিছু করে বাঁচতে পারে না।

৮. **প্রাকৃতিক দুর্যোগ :** বাংলাদেশে প্রতি বছর নদীর ভাঙ্গন, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, প্রভৃতি আকস্মিক প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত কারণে বিপুল পরিমাণে কৃষি শ্রমিক বেকারত্বের শিকার হচ্ছে।

৯. **মূলধনের অভাব :** বাংলাদেশের জনগণের মাথাপিছু আয় কম বলে মাথাপিছু সঞ্চয়ও অত্যন্ত কম। তাই মূলধন সৃষ্টি হচ্ছে না। মূলধনের অভাবে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে না। ফলে বেকারত্ব বাড়ছে।

১০. **মহিলাদের কর্মসংস্থানের অভাব :** আমাদের জনসংখ্যার অর্ধেক নারী। কিন্তু রক্ষণশীলতা ও উপযুক্ত পরিবেশের অভাবে নারীদের বৃহৎ অংশ গৃহবন্দি। অর্থকরী কাজের ব্যবস্থা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা না থাকায় তাদের বেকার জীবন যাপন করতে হয়।

১১. **রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা :** দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং প্রশাসনিক রদবদলের ফলে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক কাঠামো ক্রমান্বয়ে দুর্বল হয়ে পড়েছে, যা কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে অক্ষম।

সারসংক্ষেপ

বেকারত্ব প্রতিটি রাষ্ট্রের একটি ভয়াবহ সামাজিক সমস্যা। বেকারত্বের বিভিন্ন ধরন আছে, যেমন– মৌসুমী বেকারত্ব, প্রচ্ছন্ন বেকারত্ব, যান্ত্রিক বেকারত্ব, ছদ্ম বেকারত্ব প্রভৃতি। বাংলাদেশে বেকারত্বের ক্ষেত্রে কোন একটি কারণ উল্লেখযোগ্য নয়। অসংখ্য কারণের সমন্বয়ে দেশে ভয়াবহ বেকারত্ব সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। জনসংখ্যার আধিক্য, অনুন্নত অর্থনীতি, নিরক্ষরতা, কারিগরি জ্ঞানের অভাব, কৃষি জমির স্বল্পতা, শিল্পায়ন সমস্যা, কুটির শিল্পের বিনাশ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, রাজনৈতিক অস্থিরতা প্রভৃতি কারণে বেকারত্বের জনসংখ্যার সৃষ্টি হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

(ক) নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। গ্রামাঞ্চলে কোন ধরনের বেকারত্ব বেশি

(ক) যান্ত্রিক বেকারত্ব (খ) শিক্ষিত বেকারত্ব

(গ) মৌসুমী বেকারত্ব (ঘ) সংঘাতময় বেকারত্ব

২। যান্ত্রিক বেকারত্ব মূলত দেখা যায়–

(ক) কৃষিতে (খ) শিল্প-কারখানায়

(গ) কুটির শিল্পে (ঘ) উপরের সবকটিতে

৩। বাংলাদেশে বেকারত্বের কারণ–

(ক) নিরক্ষরতা (খ) জনসংখ্যার আধিক্য

(গ) অনুন্নত অর্থনীতি (ঘ) উপরের সবকটি।

(খ) রচনামূলক প্রশ্ন

১। বাংলাদেশে বেকারত্বের প্রকৃতি আলোচনা করুন।

২। বেকার সমস্যার কারণসমূহ বর্ণনা করুন।

(ক) উত্তরমালা

১। (গ) ২। (খ) ৩। (ঘ)

পাঠ-২ : বাংলাদেশের বেকারত্ব সমস্যা সমাধানের উপায়সমূহ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- বেকার সমস্যা সমাধানের উপায়সমূহ সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

বাংলাদেশে বেকারত্ব সমস্যা সমাধানের উপায়সমূহ

বেকারত্ব বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক জীবনে এক প্রকট সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত। তাই এই সমস্যার সমাধান দেশের কল্যাণে একান্ত অপরিহার্য। নিম্নলিখিত উপায়ে বাংলাদেশের বেকার সমস্যা সমাধান করা যায়–

১. **সামাজিক জরিপ :** সামাজিক জরিপের মাধ্যমে দেশের প্রকৃত বেকারের সংখ্যা, বেকারত্বের ধরন, তার প্রকৃত কারণ প্রভৃতির একটি তালিকা তৈরি করে সেই অনুযায়ী শ্রমের যোগান দেওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ জরুরি।

২. **অর্থনৈতিক কাঠামোর উন্নয়ন :** আমাদের দুর্বল ও নড়বড়ে অর্থনৈতিক কাঠামোর উন্নয়ন সাধন করে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। সেইজন্য উন্নয়নমুখী পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক কাঠামোকে সুদৃঢ় করতে হবে।

৩. **শিল্পোন্নয়ন :** শিল্পোন্নয়ন ছাড়া বাংলাদেশের বেকার সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। তাই সুপরিকল্পিতভাবে শিল্পোন্নয়ন করে এদেশে বেকার সমস্যার সমাধান করতে হবে।

৪. **কুটির শিল্পের উন্নয়ন :** বাংলাদেশের বেকারত্ব দূর করতে কুটির শিল্পের পুনরুদ্ধার একান্ত প্রয়োজন এবং সাথে সাথে এর উন্নয়নও দরকার, যাতে এদেশের দরিদ্র জনগণ তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে সাময়িক বেকারত্বের সময় উপার্জনের সুযোগ লাভ করতে পারে।

৫. **জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ :** দেশের জনসংখ্যা যে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে সে তুলনায় কর্মসংস্থানের সুযোগ না থাকায় বেকারত্ব বাড়ছে, তাই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করে বেকার সমস্যার সমাধান করতে হবে।

৬. **কৃষি ব্যবস্থার পরিবর্তন :** আমাদের অধিকাংশ জমিতে বছরে মাত্র একবার ফসল ফলানো হয়। তাই অন্য মৌসুমে কৃষকরা বেকার হয়ে পড়ে। এ সকল জমিতে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন ফসলের চাষের ব্যবস্থা করে বেকারত্ব দূর করা যায়।

৭. **নারীদের কর্মসংস্থান :** আমাদের জনশক্তির অর্ধেক স্থান নারীরা দখল করে আছে। কিন্তু পর্দা-প্রথা, কুসংস্কার ইত্যাদির কারণে তাদের বৃহৎ অংশ ঘরে আবদ্ধ হয়ে আছে। ঐ সব কুসংস্কার দূর করে তাদের কর্মোৎসাহী করতে হবে এবং পুরুষের পাশাপাশি তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে।

৮. **বিদেশে জনশক্তি রপ্তানি :** জনশক্তি রপ্তানির মাধ্যমে বিপুল বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব এবং তাতে বেকারত্বও দূর করা যায়। তাই পরিকল্পিত পরিকল্পনা এবং সরকারি নীতিমালার অধীনে বিদেশে জনশক্তি রপ্তানির মাধ্যমে বিপুল সংখ্যক বেকারের কর্মসংস্থান করা সম্ভব।

৯. **স্বকর্ম প্রকল্প সৃষ্টি :** স্বল্প পুঁজি বিনিয়োগের মাধ্যমে ছোট ছোট স্বকর্ম প্রকল্প গ্রহণে গ্রামীণ এবং শহুরে জনগণকে আর্থিক সাহায্য দানের ব্যবস্থা করে বেকারত্ব সমাধানের চেষ্টা করতে হবে।

১০. **জাতীয় কর্মসংস্থান নীতি প্রণয়ন :** বেকারত্ব সমাধানের জন্য বাংলাদেশে জাতীয় কর্মসংস্থান নীতি প্রণয়ন করা দরকার, কারণ শুধু বিচ্ছিন্ন এবং অসংগঠিত কিছু কর্মসূচির মাধ্যমে বেকারত্বের ন্যায় ব্যাপক সমস্যার সমাধান আশা করা যায় না।

সারসংক্ষেপ

তৃতীয় বিশ্বের প্রতিটি রাষ্ট্রের মতো বাংলাদেশকেও জটিল বেকার সমস্যা মোকাবেলা করতে হচ্ছে। বেকার সমস্যার সমাধান রাতারাতি সম্ভব নয়। অর্থনৈতিক অবকাঠামো উন্নয়ন, শিল্পায়ন, কর্মমুখী শিক্ষার প্রচলন, কুটির শিল্পের বিকাশ, নারীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি, জনশক্তি রপ্তানি, কৃষি ব্যবস্থার পরিবর্তন করে বেকার সমস্যা অনেকাংশে দূর করা সম্ভব।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

(ক) শূন্যস্থান পূরণ করুন

১। জনশক্তি রপ্তানির মাধ্যমে —— মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব।

২। পুরুষের পাশাপাশি —— কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে।

৩। —— পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে অর্থনীতিকে সুদৃঢ় করতে হবে।

৪। কর্মসংস্থানের সুযোগ না থাকায় —— বাড়ছে।

৫। —— ছাড়া বেকার সমস্যার সমাধান অসম্ভব।

(খ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। বেকার সমস্যা দূরীকরণে তিনটি উপায় লিখুন।

২। জনশক্তি রপ্তানি করে কিভাবে বেকারত্ব দূর করা যায়?

(ক) উত্তরমালা

১। বৈদেশিক, ২। নারীর, ৩। সুষ্ঠু, ৪। বেকারত্ব, ৫। পরিকল্পনা।

পাঠ-৩ : আত্মকর্মসংস্থান ও ক্ষুদ্র শিল্প

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- আত্মকর্মসংস্থান বলতে কি বুঝায় তা বলতে পারবেন।
- আত্মকর্মসংস্থান কিভাবে করা যায় তা আলোচনা করতে পারবেন।
- আত্মকর্মসংস্থানের গুরুত্ব আলোচনা করতে পারবেন।
- আত্মকর্মসংস্থানে ক্ষুদ্র শিল্পের ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবেন।

ভূমিকা

দেশের যুব সমাজের জন্য কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করতে না পারলে দেশের অর্থনীতি কখনই উন্নত হবে না। দেশে বেকার যুব সমাজের কর্মসংস্থানের জন্য সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের চাকরির পরিধি সীমাবদ্ধ। বেকার যুব সমাজের জন্য চাকরির ব্যবস্থা দেশে নেই। তাই চাকরির বিকল্প হিসেবে ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপন করে বেকার সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে। ক্ষুদ্র শিল্প খাতে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির সম্ভাবনা আমাদের দেশের মত উন্নয়নশীল দেশে খুবই উজ্জ্বল।

আত্ম-কর্মসংস্থানের সংজ্ঞা

আত্ম-কর্মসংস্থান বলতে নিজেই নিজের কর্মসংস্থান করাকে বোঝায়। নিজস্ব চিন্তা, বুদ্ধি, নিজস্ব সম্পদ অথবা ঋণ করা সম্পদ নিয়ে নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে সামান্য ঝুঁকি নিয়ে নিজেই নিজের কর্মসংস্থানই হচ্ছে আত্ম-কর্মসংস্থান। আত্ম-কর্মসংস্থানকারী ব্যক্তি সাধারণত কোন না কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে। অথবা কোন ব্যবসার কাজে নিজেকে নিয়োজিত করে। পোলট্রি ফাম, ডেইরি ফার্ম, পোশাক তৈরি, জাল বুনন প্রভৃতি আত্মকর্মসংস্থানের বিভিন্ন উপায়। আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে বেকার সমস্যার যেমন সমাধান হবে তেমনি অর্থনৈতিক উন্নতিও ত্বরান্বিত হবে।

আত্ম-কর্মসংস্থানের প্রয়োজনীয়তা

আমাদের দেশ বিশ্বের দরিদ্রতম দেশগুলোর একটি। এ দেশের আয়তনের তুলনায় লোকসংখ্যা অত্যন্ত বেশি। লোকসংখ্যা বেশি হওয়াতে সবার জন্য চাকরির ব্যবস্থা এ দেশে নেই। কেননা দেশের শিল্প–কারখানা তেমন গড়ে ওঠেনি। আর সরকারি খাতেও কর্মসংস্থানের সুযোগ খুবই সীমিত। তাই বাড়ছে বেকার সমস্যা। আমাদের দেশের জন্য আত্ম-কর্মসংস্থান প্রেক্ষাপটে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নিম্নে আত্ম-কর্মসংস্থানের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আলোচনা করা হলো–

১. **বেকার সমস্যা সমাধান :** আমাদের দেশে বিপুল সংখ্যক লোকের কোন কর্ম নেই। আত্ম-কর্মসংস্থানের মাধ্যমে বেকার সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে।

২. **দারিদ্র্য দূরীকরণ :** আমাদের দেশে অধিকাংশ মানুষ দারিদ্রেতার মধ্যে জীবন-যাপন করে। দারিদ্র্যের কারণে তারা জীবন ধারণের মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণ করতে ব্যর্থ হচ্ছে। আত্ম-কর্মসংস্থানের মাধ্যমে তাদের দারিদ্র্য দূর করা সম্ভব।

৩. **অর্থনৈতিক উন্নয়ন :** আত্ম-কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দেশের বিপুলসংখ্যক বেকার জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবার পাশাপাশি দেশের জনশক্তির সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটবে।

৪. **যুব সমাজের দেশেপ্রেমে উদ্বুদ্ধকরণ :** আত্ম-কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দেশের বিপথগামী যুব সমাজ দেশের উন্নয়নে অবদান রাখতে পারবে। তারা নিজেদের অবস্থার উন্নতি করে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হবে।

৫. **শহরমুখী জনস্রোত নিয়ন্ত্রণ :** কর্মসংস্থানের সুযোগ না থাকায় গ্রামের লোকজন শহর অভিমুখে যাত্রা করে। শহরেও তাদের কর্মসংস্থানের তেমন সুযোগ নেই। আত্ম-কর্মসংস্থানের মাধ্যমে এ প্রবণতার অবসান ঘটবে।

৬. **সামাজিক অপরাধ রোধ :** কর্মসংস্থানের সুযোগ না থাকায় বেকার যুব সমাজ অপরাধমূলক কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে। সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা তাতে বিঘ্নিত হয়। আত্ম-কর্মসংস্থানের মাধ্যমে বিপথগামী যুব সমাজকে সমাজের উন্নতিতে কাজে লাগানো সম্ভব হবে।

অতএব, আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে দেশের বেকার সমস্যাই শুধু দূর হবে না, এর মাধ্যমে যেমন সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা পাবে তেমনি দেশেরও অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটবে।

আত্মকর্মসংস্থানের ক্ষেত্র হিসেবে ক্ষুদ্র শিল্প

আমাদের মত দরিদ্র্যতম জনবহুল দেশে আত্ম-কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে বহু সমস্যা রয়েছে। দেশের যুব সমাজকে চাকরির পেছনে না ছুটে আত্ম-কর্মসংস্থানের মাধ্যমে নিজেদের উন্নয়নের চেষ্টা করতে হবে। দেশের বেকার যুব সমাজকে এজন্য উদ্বুদ্ধ করতে হবে। আত্ম-কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র হিসেবে ক্ষুদ্র শিল্পের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বর্পূ। দেশের যুব সমাজ নিজ উদ্যোগে ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপন করে জীবিকা নির্বাহের পথ পেতে পারে। ক্ষুদ্র শিল্পের মাধ্যমে তারা প্রচুর অর্থ উপার্জন করতে পারবে। ক্ষুদ্র শিল্পে মূলধন বিনিয়োগ করতে হয় খুবই কম। অথচ পরিশ্রমের মাধ্যমে প্রচুর অর্থ অর্জন করা যায়। এর জন্য প্রয়োজন ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপনের মানসিকতা সৃষ্টি এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ। বেকার জনগোষ্ঠীকে কর্মসংস্থানের আওতায় আনার জন্য ক্ষুদ্র শিল্পের গুরুত্ব তাই অপরিসীম।

ক্ষুদ্র শিল্প বলতে বোঝায় ছোট আকারের শিল্পকে। ক্ষুদ্র শিল্পে বিনিয়োগের পরিমাণ চল্লিশ হাজার টাকা থেকে তিন কোটি টাকা পর্যন্ত হয়। ক্ষুদ্র শিল্পের জন্য ছোট কারখানার দরকার। এ শিল্পে বিদ্যুৎ দরকার। আর ভাড়া করা শ্রমিকও নিয়োগ করতে হয়। ক্ষুদ্র শিল্প উৎপাদনকারী ও সেবা প্রদানকারী উভয় ধরনেরই হতে পারে।

হাঁস-মুরগি পালন, মৎস্য চাষ, পাট ও পাটজাত শিল্প, খাদ্য ও খাদ্যজাত দ্রব্যাদির প্রস্তুতকরণ, মুদ্রণ ও প্রকাশনা, বাঁশ ও বেতের তৈরি দ্রব্যাদি নির্মাণ, কাঠের আসবাবপত্র, খেলনা তৈরি, মধু চাষ, ছোট ব্যবসায় ও দোকানপাট পরিচালনা, ফল বাগান পরিচলনা প্রভৃতি ক্ষুদ্র শিল্পের অন্তর্গত।

আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য করণীয় বিষয়সমূহ

আমাদের দেশে চাকরির সুযোগ সীমিত। সরকার বিপুল সংখ্যক বেকার তরুণ-তরুণীদের জন্য চাকরির ব্যবস্থা করতে পারছে না। ফলে বেকারের সংখ্যা বাড়ছে। দেশে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত দু'ধরনের বেকার আছে। ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে তারা নিজের ভাগ্য নিজেই ফিরিয়ে আনতে পারে। ক্ষুদ্র শিল্পে আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য আমাদের বেকার জনগোষ্ঠীকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। নিম্নে ক্ষুদ্র শিল্পে আত্মকর্মগুলো আলোচনা করা হলো–

১. দেশের বেকার যুব সমাজকে ক্ষুদ্র শিল্পে আত্মকর্মসংস্থানের জন্য উদ্বুদ্ধ করতে হবে। তাদেরকে বোঝাতে হবে যে, কোন কাজই ছোট নয়।

২. ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপনের জন্য যুব ব্যাংক স্থাপন করা যেতে পারে। সহজ শর্তে বেকার যুবকরা যাতে ঋণ পেতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে।

৩. দেশের কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বেকার যুবকদের ক্ষুদ্র শিল্প সম্বন্ধে ধারণা দিতে হবে।

৪. যুবকদের আত্মকর্মসংস্থানের জন্য এমন যুবনীতি প্রণয়ন করতে হবে যা যুব সমাজের উন্নয়ন করতে পারে।

৫. দেশের শিক্ষিত যুব সমাজকে চাকরির উপর নির্ভরশীলতা কমাতে হবে।

৬. বৃত্তিমূলক শিক্ষা গ্রহণের পর তরুণ-তরুণীরা যাতে দ্রুত ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপন করতে পারে সে জন্য প্রয়োজনীয় ঋণের ব্যবস্থা করতে হবে।

সারসংক্ষেপ

বেকারত্ব দূর করতে আত্ম-কর্মসংস্থানের কোন বিকল্প নেই। চাকরির বিকল্প হিসেবে যুব সমাজকে আত্ম-কর্মসংস্থন তথা ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপনকে গুরুত্ব দিতে হবে। মূলত নিজের কর্মসংস্থান নিজেই তৈরি করাকে আত্ম-কর্মসংস্থান বলে। আত্ম-কর্মসংস্থানের মাধ্যমে বেকারত্ব দূর করার পাশাপাশি অর্থনৈতিক উন্নতিও ত্বরান্বিত হবে। পোলট্রি ফার্ম, ডেইরি ফার্ম, মৎস্য চাষ, জাল বুনন, ছোট ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা আত্ম-কর্মসংস্থানের বিভিন্ন উপায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

(ক) নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। আত্মকর্মসংস্থানব বলতে বুঝায় –

(ক) কৃষি জমিতে কাজ করা (খ) নিজেই নিজের কর্মসংস্থান করা

(গ) চাকরি করা (ঘ) কোনটি নয়

২। কোনটি ক্ষুদ্র শিল্পের অন্তর্ভুক্ত নয়?

(ক) মৎস্য চাষ (খ) পোলট্রি ফার্ম

(গ) কৃষি কাজ (ঘ) ডেইরি ফার্ম

(খ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। আত্মকর্মসংস্থান বলতে কী বুঝায়?

২। আত্মকর্মসংস্থানের গুরুত্ব আলোচনা করুন।

৩। আত্মকর্মসংস্থানের জন্য কী কী করণীয়?

(গ) রচনামূলক প্রশ্ন

১। আত্মকর্মসংস্থান কিভাবে করা যায় তা আলোচনা করুন।

২। আত্মকর্মসংস্থানে ক্ষুদ্র শিল্পের অবদান বর্ণনা করুন।

(ক) উত্তরমালা

১। (খ) ২। (গ)

পাঠ-৪ : নিরক্ষরতা সৃষ্ট সমস্যা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- নিরক্ষরতা কি তা জানতে পারবেন।
- নিরক্ষরতার প্রকৃতি ও সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

নিরক্ষরতাজনিত সমস্যা

নিরক্ষরতা বলতে অক্ষরজ্ঞানহীন মানুষকে বুঝায়। নিরক্ষর ব্যক্তি হলেন অক্ষর জ্ঞানহীন ব্যক্তি। বস্তুত অক্ষরজ্ঞান না থাকার অর্থ অক্ষর না চেনা। অক্ষরের ব্যবহার সম্পর্কে অজ্ঞত থাকা। নিরক্ষর ব্যক্তি কোন জিনিস পড়তে ও লিখতে পারে না। নিরক্ষরতা দেশের জন্য এক ভয়াবহ অভিশাপ।

নিরক্ষরতা বাংলাদেশের অন্যতম সামাজিক সমস্যা। আবার নিরক্ষরতা অনেক সমস্যার কারণও বটে। নিরক্ষরতার কারণে দেশের সার্বিক আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক উন্নয়ন ব্যহত হয়ে অসংখ্য সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। দেশের প্রায় অর্ধেক মানুষ-কার্যত নিরক্ষর। অশিক্ষাকে সব সমস্যার ধাত্রী বলে অভিহিত করা হয়। মূলত নিরক্ষরতা ও অশিক্ষার কারণে সমাজে কুসংস্কার দানা বেঁধেছে। হাজার রকমের সমস্যা সামজিক জীবনকে পঙ্গু করে রেখেছে। নিরক্ষরতার কারণে জনসংখ্যাকে মানব সম্পদে পরিবর্তন করা সম্ভব হচ্ছে না।

নিরক্ষরতা সমাজকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন করে। মানুষ অন্ধবিশ্বাসে নিজের কর্মফলকে ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দেয়। অথচ শিক্ষিত হলে এবং অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন হলে তার চিন্তা ও চেতনার ক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটত। অর্থাৎ একবার নয় বরং বরাংবার প্রচেষ্টা ও অধ্যবসায় দ্বারা সে নিজেকে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হত। তাই নিরক্ষরতা পাপ। একে পরিহার করে শিক্ষা গ্রহণে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে।

নিরক্ষর মানুষ জীবন সম্পর্কে সচেতন নয়। শঠ ও প্রতারকগণ তাদেরকে সহজেই প্রতারিত করতে পারে। অসাধু রাজনীতিবিদগণ সহজে নিরক্ষর মানুষকে ধোঁকা দিয়ে বোকা বানিয়ে ক্ষমতায় যাওয়ার সুযোগ পায়। আমাদের দেশের রাজনীতির উন্নয়নের অন্যতম প্রধান অন্তরায় হল নিরক্ষরতা। অনবলবর্ষী বক্তা ও শঠদের খপ্পরে পড়ে আমাদের দেশের মানুষ ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে তারা সমাজে এরূপ খারাপ লোকদের চিনতে ও চিহ্নিত করতে পারে না। আমাদের দেশে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের অভাবের অন্যতম কারণ নিরক্ষরতা।

বাংলাদেশে সরকারি হিসাব মতে, সাক্ষরতার হার ৬৫ ভাগ। তবে সঠিকভাবে পড়তে ও লিখতে পারা লোকের সংখ্যা ৪৫ ভাগের বেশি নয়। অর্থাৎ দেশের প্রায় আট কোটি মানুষ কার্যত নিরক্ষর। বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকার যেসব উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করছে তার সুফল ভেস্তে যাচ্ছে বিপুল নিরক্ষরতার কারণে।

নিরক্ষরতার কারণে গ্রামের অনেক মা-বাবা সন্তানদের স্কুলে পাঠানোর পরিবর্তে কৃষিক্ষেতে অথবা বড়লোকের ঘরে কাজ করতে পাঠায়। তারা সাময়িক কিছু অর্থ পাওয়ায় এটিকে লাভজনক মনে করছে। এর ফলে পরবর্তী প্রজন্ম নিরক্ষরই থেকে যাচ্ছে। নিরক্ষরতার কারণে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচিও ব্যর্থ হচ্ছে। অশিক্ষার কারণে গ্রামীণ জনগণ পরিবারকে ছোট রাখতে আগ্রহী নয়। দেশের সর্বগ্রাসী দারিদ্র্যের একটি অন্যতম কারণ নিরক্ষরতা। নিরক্ষর জনগণের কর্মসংস্থানের খুব বেশি সুযোগ নেই। নিরক্ষর ব্যক্তি তাদের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কে সচেতন নয়। অধিকার সচেতন না হওয়ায় নিরক্ষর ব্যক্তি কর্তব্যবোধ সম্পর্কেও অসেচতন।

নিরক্ষরতা মানব উন্নয়নের প্রতিবন্ধক। চিন্তার বন্ধ্যাত্ব ও জ্ঞানের অভাব হেতু নিরক্ষর মানুষ আত্মনির্ভর হতে পারে না। তাদের দৃষ্টিভঙ্গি সংকীর্ণ। পদে পদে তাদের জীবন বাধাগ্রস্ত হয়। দারিদ্র্যের নির্মম আঘাতে সর্বদাই নিরক্ষর ব্যক্তির জীবন বিপর্যস্ত থাকে। পক্ষান্তরে শিক্ষিত মানুষ স্বনির্ভর, আত্মসচেতন ও স্বাধীন। শিক্ষিত জনগণ হলো প্রকৃত অর্থে মানব সম্পদ।

নিম্নে নিরক্ষরতার কারণে সৃষ্ট সমস্যাসমূহ আলোচনা করা হলো –

নিরক্ষরতার কারণে সৃষ্ট সমস্যা

১. **কুসংস্কারাচ্ছন্নতা :** নিরক্ষরতা সমাজকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন করে ফেলে। মানুষ অন্ধবিশ্বাসে নিজের কর্মফলকে ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দেয়। নিরক্ষরতার কারণে তার চিন্তাচেতনার বিকাশ ঘটতে পারেনা।

২. **অসচেতনতা :** নিরক্ষর মানুষ সহজেই প্রতারণার শিকার হয়। জীবনের প্রতি পদে পদে তারা নিষ্পেষিত ও বঞ্চিত হয়। কেননা তারা অসচেতন।

৩. **কলহ-বিবাদের সৃষ্টি :** নিরক্ষরতার কারণে মানুষ ভালো মন্দ অথবা ন্যায়-অন্যায় বুঝতে পারে না। তাই সামান্য কারণেই তারা কলহ-বিবাদে জড়িয়ে পড়ে।

৪. **অপরাধপ্রবণতা :** নিরক্ষরতার কারণে সমাজে অপরাধপ্রবণতা বৃদ্ধি পায়। নিরক্ষর ব্যক্তির ভালোমন্দ বিচার করার ক্ষমতা কম বিধায় তারা সহজেই অপরাধে জড়িয়ে পড়ে। উপরন্তু তারা দরিদ্র, এ কারণে তারা সহজে প্রলুব্ধ হয়।

৫. **অসুস্থ জনশক্তি :** নিরক্ষর ব্যক্তি নিজের স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন নয়। ফলে তারা প্রায়ই নানারকম অসুস্থতার মধ্যে দিনাতিপাত করে। কেননা তারা স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে অজ্ঞ।

৬. **অদক্ষ জনবল :** নিরক্ষর ব্যক্তি তার কর্মদক্ষতা বাড়ানোর জন্য কোনো প্রকার বইপত্রের সাহায্য নিতে পারে না। ফলে তারা আধুনিক প্রযুক্তির সাথে পরিচিত হতে পারে না। এজন্য তারা অদক্ষ জনবল।

৭. **জনসংখ্যা বৃদ্ধি :** অর্থনৈতিক ও সামাজিক চেতনার অভাবে তারা পরিবারকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে না। ফলে কাম্য জনসংখ্যার তুলনায় জনসংখ্যা অধিক হারে বৃদ্ধি পায়।

৮. **অশিক্ষার বিস্তার :** ব্যক্তি নিজে নিরক্ষর হবার কারণে সে তার সন্তানের শিক্ষার প্রতিও উদাসীন থাকে। ফলে দেশে অশিক্ষার হার বৃদ্ধি পায়।

সারসংক্ষেপ

নিরক্ষরতা ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য ক্ষতিকর। এ সামাজিক ক্ষতির হাত থেকে বাঁচার জন্য ব্যক্তির ভূমিকা ও রাষ্ট্রের দায়িত্ব অপরিসীম। নিরক্ষরতার কারণে সৃষ্ট সমস্যা হচ্ছে কুসংস্কারাচ্ছন্নতা, জীবন সম্পর্কে অসচেতনতা, কলহ-বিবাদ সৃষ্টি, অপরাধপ্রবণতা, অসুস্থ জনশক্তি, অদক্ষ জনবল, জনসংখ্যা বৃদ্ধি ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

(ক) সত্যা হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন

১। নিরক্ষর ব্যক্তি আত্মনির্ভর নয়।

২। নিরক্ষরতা একটি সামাজিক অভিশাপ।

৩। নিরক্ষরতা জাতীয় উন্নয়নের বাধা নয়।

৪। নিরক্ষর ব্যক্তি সহজেই প্রলুব্ধ হয়।

৫। নিরক্ষর ব্যক্তির স্বাস্থ্য ভাল হয়।

(খ) রচনামূলক প্রশ্ন

১। নিরক্ষরতা বলতে কি বুঝায়? নিরক্ষরতা সৃষ্ট সমস্যাগুলো আলোচনা করুন।

২। 'নিরক্ষরতা একটি অভিশাপ' – উক্তিটি যুক্তিসহকারে ব্যাখ্যা করুন।

(ক) উত্তরমালা

১। স, ২। স, ৩। মি, ৪। স, ৫। মি.

পাঠ-৫ : নিরক্ষরতার কারণ ও নিরক্ষরতা দূরীকরণের উপায়

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- নিরক্ষরতার কারণসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন ।
- নিরক্ষরতা দূরীকরণের উপায়সমূহ আলোচনা করতে পারবেন ।
- নিরক্ষরতা দূরীকরণে রাষ্ট্র ও নাগরিকের দায়িত্ব আলোচনা করতে পারবেন ।

নিরক্ষরতা এক সামাজিক ব্যাধি । নিরক্ষরতা অন্ধত্বের সামিল । অসংখ্য সামাজিক সমস্যার মূলে রয়েছে নিরক্ষরতা । মূলত দারিদ্র্যের কারণেই সমাজে নিরক্ষরতা টিকে থাকে । আবার নিরক্ষরতা দারিদ্র্য সৃষ্টি করে । এটি একটি দুষ্টচক্রের মতো সমাজে স্থায়ী রূপ লাভ করে । নিরক্ষরতার পিছনে অসংখ্য কারণ বিদ্যমান । নিম্নে তা আলোচনা করা হলো–

নিরক্ষরতার কারণসমূহ

(১) **দারিদ্র্য :** দারিদ্র্যের কারণেই অধিকাংশ বাবা-মা তাদের সন্তানদের স্কুলে পাঠাতে পারেন না । ভবিষ্যতে উচ্চ শ্রেণীতে পড়ার খরচ যোগাতে পারবেন না বলে স্কুলে পাঠান না । তারা তাদের শিশু-সন্তানদের শ্রম বিক্রির মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করাকে শ্রেয় মনে করেন ।

(২) **বেকারত্ব :** আমাদের দেশের শিক্ষিত যুবক শ্রেণীর এক বিরাট অংশ আজ বেকার । এই বেকার যুবকরা শিক্ষিত হয়েও বাবা-মার সংসারে বোঝা হয়ে আছে । আমাদের জনসংখ্যার এক বিরাট অংশ গ্রামে বাস করে । তারা শিক্ষিত যুবকদের এই বেকারত্ব দেখে হতাশাগ্রস্ত হয়ে সন্তানদের শিক্ষিত বেকার বানানোর চেয়ে অশিক্ষিত কৃষিজীবী বা কৃষি মজুরি শ্রমিক হিসেবে গড়ে তুলতে চায় ।

(৩) **সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি :** আমাদের কৃষিনির্ভর নিরক্ষর গ্রামীণ বাবা-মা সন্তানদের শিক্ষিত করতে ভয় পান । তাদের ধারণা সন্তান যদি শিক্ষিত হয় তবে তারা সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে । তাদের ধারণা শিক্ষিত সন্তান কর্মস্থলে চলে যাবে এবং আস্তে আস্তে তাদের থেকে দূরে চলে যাবে । তারা চান তাদের সন্তানরা বাপ-দাদার পেশা গ্রহণ করে বার্ধক্যে বাবা-মার যত্ন করুক ।

(৪) **বয়স্ক শিক্ষার অভাব :** আমাদের সমাজে নিরক্ষরতার আরেকটি কারণ এই যে বয়স্ক শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগের অপর্যাপ্ততা । বয়স্ক শিক্ষা ছাড়া জনগণের মধ্যে শিক্ষার প্রতি সচেতনতা সৃষ্টি করা সম্ভব হচ্ছে না ।

(৫) **নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে বাধা :** আমাদের জনসংখ্যার অর্ধেক নারী । নারীদের শিক্ষার ওপর এখনও দেশে নানা বাধা রয়েছে । বিশেষ করে অনুন্নত গ্রাম এলাকায় নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে সামাজিক নিরাপত্তার অভাব রয়েছে ।

(৬) **চাকরির অনিশ্চয়তা :** শিক্ষার প্রকৃত মর্যাদা না দিলে সমাজ থেকে নিরক্ষরতা দূর করা সম্ভব হবে না । সমাজ ও রাষ্ট্র যদি শিক্ষিত ব্যক্তির চাকরির নিশ্চয়তা তথা আর্থ-সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি না করে তবে সমাজ থেকে অশিক্ষা দূর হবে না ।

(৭) **মা-বাবার অসচেতনতা :** আমাদের সমাজে নিরক্ষরতার আরেকটি উল্লেখযোগ্য কারণ হলো বাবা-মার নিরক্ষর । তাদের অনেকেরই শিক্ষার ব্যয়ভার সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান নেই । শিক্ষাকে অতিরিক্ত ব্যয়বহুল মনে করে তাদের সন্তানদের অজানা জগৎ বিদ্যালয়ে পাঠাতে চান না ।

(৮) **অপার্যপ্ত শিক্ষা ব্যয় :** এর সাথে গুরুত্বপূর্ণ আরও একটি কারণ হলো শিক্ষা খাতে সরকারের অতি নিম্ন ব্যয় বা বিনিয়োগ যার ফলে, বিশেষ করে গ্রামঞ্চলে পর্যাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন, শিক্ষা উপকরণ, শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইত্যাদি সম্ভব হচ্ছে না । ফলে শিক্ষার হার আশানুরূপ বৃদ্ধি পাচ্ছে না ।

নিরক্ষরতা দূরীকরণের উপায়

উপরে নিরক্ষরতার কারণসমূহ আলোচনা করা হলো। এই সব বাধা দূর করতে পারলে সমস্যার অকেটা সমাধান সম্ভব। নিম্নে নিরক্ষরতা দূর করার উপায়সমূহ নিয়ে আলোচনা করা হলো–

(১) **স্বচ্ছলতা অর্জন :** সমাজ থেকে দারিদ্র্য দূর করতে হবে। অন্তত বিদ্যালয়ে পড়ার ব্যয় ভার বহন করার মত আর্থিক স্বচ্ছলতা সৃষ্টি করতে হবে।

(২) **বেকার সমস্যার সমাধান :** নিরক্ষরতা দূরীকরণে শিক্ষিত বেকার সমস্যার সমাধান আশু প্রয়োজন। শিক্ষিত বেকার সমস্যার সমাধান হলে জনসাধারণের মনে এ বিশ্বাস জন্ম নিবে যে তাদের সন্তানরা পড়ালেখা শিখে বেকার বসে থাকবে না, তাদের অর্থ, সময় এবং শ্রম কোনটাই বৃথা যাবে না। তখনই তারা শিক্ষার প্রতি আগ্রহী হবে।

(৩) **উন্নত আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি :** উন্নত জীবন যাত্রার প্রতি সাধারণ নিরক্ষর জনগোষ্ঠীর আগ্রহ সৃষ্টি করা প্রয়োজন। শিক্ষাই উন্নত জীবনের চাবিকাঠি এটা তাদের বুঝাতে হবে। এ জন্য গণমাধ্যমসমূহকে সক্রিয় করা প্রয়োজন।

(৪) **বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচি :** নিরক্ষরতা দূর করতে বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচি গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন। বয়স্কদের শিক্ষিত করতে পারলে তারা তাদের সন্তানদের শিক্ষা দিবে।

(৫) **শিক্ষা ব্যয় হ্রাস :** শিক্ষার ব্যয়ভার কমাতে হবে এবং শিক্ষার উপকরণ সহজলভ্য করতে হবে।

(৬) **খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা :** দারিদ্র্যের কারণে যে সব বাবা-মা তাদের সন্তানদের শিশুশ্রম বিক্রি করছেন বা সংসারের কাজে লাগাতে বাধ্য হন তাদের জন্য খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা এবং নৈশকালীন শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা প্রয়োজন।

(৭) **শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিবর্তন :** শিক্ষা ব্যবস্থাকে নতুন আঙ্গিকে অর্থাৎ যুগোপযোগী করে তুলতে হবে। অর্থাৎ শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনতে হবে। বাস্তব জীবনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন করতে হবে।

(৮) **শিক্ষা খাতে ব্যয় বৃদ্ধি :** শিক্ষা খাতে সরকারকে বরাদ্দ বাড়াতে হবে, যাতে শিক্ষা প্রসারে প্রাতিষ্ঠানিক ও উপকারণিক প্রতিবন্ধকতা দূর করা প্রয়োজন। এ লক্ষে বাজেট শিক্ষা ব্যয় বাড়াতে হবে।

নিরক্ষরতা দূরীকরণে সরকার ও নাগরিকের কর্তব্য

নিরক্ষরতা দূরীকরণে সরকার ও নাগরিকের করণীয় সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হলো :

ক. সরকারের করণীয়

এ বিপুল পরিমাণ মানুষকে অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন করার জন্য সরকারের কতগুলো কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। সেগুলো নিম্নরূপ–

১. **তথ্য সংগ্রহ :** নিরক্ষর মানুষের সঠিক সংখ্যা ও অবস্থান নির্ধারণের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। সরকার প্রকল্প গ্রহণ করে টাস্কফোর্স গঠন করে এ কাজটি করতে পারে।

২. **শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন :** নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য প্রচুর পরিমাণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করতে হবে। গ্রামে গ্রামে বয়স্ক শিক্ষা ও খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষার দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে।

৩. **বিনামূল্যে শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ :** দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পক্ষে শিক্ষার উপকরণ কেনা সম্ভব নয়। তাই সরকারকে বিনামূল্যে শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ ও অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে হবে। সুখের বিষয় এ প্রকল্পটি বাংলাদেশ সরকার গ্রহণ করেছে। স্নাতক পর্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক করার চিন্তা-ভাবনা চলছে।

৪. **কর্মমুখী শিক্ষা :** আনুষ্ঠানিক শিক্ষার পরিবর্তে পেশাভিত্তিক শিক্ষার জন্য বই রচনা করা প্রয়োজন। কর্মমুখী শিক্ষা দিতে পারলে বয়স্ক লোক তা মনে রাখতে পারবে।

৫. **শিক্ষার জন্য ঋণ ও অনুদান প্রথা চালুকরণ :** নিরক্ষরদের শিক্ষা আনুষ্ঠানিক নয়। তবুও তাদেরকে বৃত্তি ও উপবৃত্তি দিলে তারা শিক্ষা গ্রহণে উৎসাহী হবে। এ জন্য সরকারকে অনুদান ও বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা নিতে হবে।

৬. **শিক্ষাব্যাংক চালুকরণ :** ছাত্রদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ঝরে পড়া বন্ধ করার জন্য আর্থিক সহায়তা প্রয়োজন। নিরক্ষর থেকে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা পর্যায়ে শিক্ষা ঋণ দেওয়ার জন্য সরকারকে আন্তরিকতার সাথে ব্যাংক গঠন ও চালু করতে হবে।

খ. নাগরিকের কর্তব্য

নিরক্ষরতা দূরীকরণে এবং জাতীয় উন্নয়নে শুধু সরকারি ভূমিকা যথেষ্ট নয়। পাশাপাশি নাগরিকদের যথেষ্ট ভূমিকা পালন করতে হবে। সেগুলো নিম্নরূপ–

১. তথ্য দেওয়ার জন্য নাগরিকদের স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসতে হবে।

২. অনুদান, বৃত্তি, উপবৃত্তি প্রদান করা সরকারের একার পক্ষে সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে শিক্ষিত ও সম্পদশালীদের এগিয়ে আসতে হবে।

৩. শিক্ষিত ব্যক্তি এবং ছাত্রসমাজকে এলাকার নৈশ্য বিদ্যালয় স্থাপন করে বয়স্ক শিক্ষা দিতে হবে।

৪. বিদ্যালয় স্থাপন ও পরিচালনায় নবাগরিকদের উৎসাহী করতে হবে। এ ব্যাপারে দেশের বেশ কয়েকটি এন.জি.ও নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। 'স্বনির্ভর বাংলাদেশ' প্রতিষ্ঠানটি দেশের ৫৭০টি গ্রামকে নিরক্ষরতা মুক্ত করছে। ব্র্যাক এবং প্রশিকাও শিক্ষা বিস্তারে কাজ করছে।

সারসংক্ষেপ

নিরক্ষরতা এক ভয়াবহ সামাজিক সমস্যা। নিরক্ষরতার অসংখ্য কারণ বিদ্যমান। তার মধ্যে অন্যতম হলো– দারিদ্র্য, বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রমের অপ্রতুলতা, সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি, বেকারত্ব, অপর্যাপ্ত শিক্ষা ব্যয় প্রভৃতি। তবে দারিদ্র্য হলো নিরক্ষরতার প্রধান কারণ। দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব হলে নিরক্ষরতাও দূর হবে। নিরক্ষরতা দূর করতে সরকারকে বাস্তবমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ করে শিক্ষা ব্যয় বৃদ্ধি করতে হবে। দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট করতে খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা, কাজের বিনিময়ে শিক্ষা প্রভৃতি কর্মসূচির পরিধি বাড়াতে হবে। নিরক্ষরতা দূর করার মূল দায়িত্ব রাষ্ট্রের। তবে ব্যক্তি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকেও এক্ষেত্রে দায়িত্ব নিতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

(ক) নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। নিরক্ষরতা দূর করার মূল দায়িত্ব কার?
(ক) ব্যক্তির (খ) রাষ্ট্রের (গ) বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের (ঘ) দাতা সংস্থার।

২। নিরক্ষরতার প্রধান কারণ
(ক) দারিদ্র্য (খ) সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি (গ) অপর্যাপ্ত শিক্ষা ব্যয় (ঘ) অবকাঠামোগত সমস্যা

(খ) রচনামূলক প্রশ্ন

১। নিরক্ষরতার কারণসমূহ ব্যাংখ্যা করুন।

২। নিরক্ষরতা দূরীকরণের উপায়সমূহ আলোচনা করুন।

৩। নিরক্ষরতা দূরীকরণে রাষ্ট্র ও নাগরিকের দায়িত্ব বর্ণনা করুন।

(ক) উত্তরমালা

১। (খ) ২। (ক)

ইউনিট
২১

অপরাধ প্রবণতা

সন্ত্রাস, মাদকাসক্তি, দুর্নীতি ও কিশোর অপরাধ

ভূমিকা

অপরাধ বলতে সাধারণত সমাজ ও আইন নিষিদ্ধ দণ্ডনীয় কাজকে বোঝায়। অপরাধ প্রবণতা মানুষের জন্মগত কোন বিষয় নয়, সমাজ ও পারিপার্শ্বিক কারণে মানুষ অপরাধী হয়ে ওঠে। ধনী-দরিদ্র উভয় রাষ্ট্রেই সরকারকে কতিপয় অপরাধ মোকাবেলা করতে হয়। অপরাধ প্রবণতা সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা বিঘ্নিত করে। শান্তি প্রিয় মানুষ অনেক ক্ষেত্রে অপরাধীর কাছে জিম্মি হয়ে পড়ে। বাংলাদেশে সন্ত্রাস, মাদকাসক্তি, দুর্নীতি, কিশোর অপরাধ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। এসব কারণে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছে। বর্তমান ইউনিটে নিম্নোক্ত পাঠগুলো আলোচনা করা হলো :

পাঠ-১ : অপরাধ প্রবণতার কারণ।
পাঠ-২ : অপরাধ প্রবণতা রোধে নাগরিক ও সরকারের দায়িত্ব।
পাঠ-৩ : সন্ত্রাসের কারণ ও তা প্রতিকারের উপায়।
পাঠ-৪ : বাংলাদেশে মাদকাসক্তি।
পাঠ-৫ : বাংলাদেশে দুর্নীতি।
পাঠ-৬ : বাংলাদেশের কিশোর অপরাধের কারণ।
পাঠ-৭ : কিশোর অপরাধ দূরীকরণের উপায়।

পাঠ-১ : অপরাধ প্রবণতার কারণ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- অপরাধ বলতে কি বুঝায় তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন ।
- আপরাধের কারণ সমূহ বর্ণনা করতে পারবেন ।
- অপরাধ প্রবণতার স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে পারবেন ।

অপরাধের সংজ্ঞা

যে প্রচলতি রীতি ভঙ্গ করলে বা কর্ম সম্পাদন করলে শাস্তি পাবার সম্ভাবনা থাকে তাই অপরাধ ।

- সমাজ বিজ্ঞানী ই.এইচ. সাদমল্যাণ্ড বলেন, 'আইন লঙ্ঘন করাই অপরাধ ।'
- অপরাধ বিজ্ঞানী স্টিফেন বলেন, 'অপরাধ হচ্ছে সেসব কাজ করা, যার জন্য আইনে শাস্তির বিধান আছে ।'
- প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী র‍্যাডক্লিফ ব্রাউন বলেন, 'যে প্রচলিত রীতি-নীতি ভঙ্গ করলে শাস্তির বিধান করা হয়, তা ভঙ্গ করাই অপরাধ ।'
- সমাজবিজ্ঞানী ট্যালকট পারসনের মতে, কোন নির্দিষ্ট সময়ে বিধিবদ্ধ প্রথা বা জনমত লঙ্ঘন করাকে সমাজের দৃষ্টিতে অপরাধ বলে গণ্য করা হয় ।

উপরিউক্ত সংজ্ঞা পর্যালোচনা করে বলা যায়, অপরাধ হচ্ছে আইন ও নৈতিকতা বিরোধী কাজ যা সম্পাদন করলে শাস্তি পেতে হয় ।

বাংলাদেশে অপরাধ প্রবণতার কারণ

অপরাধ বলতে কোনো নির্দিষ্ট সমাজের সেই সব সমাজ বিরোধী কাজকে বোঝায় যেগুলো সেই সমাজের প্রচলিত আইন-কানুন, রীতি-নীতি ও মূল্যবোধের পরিপন্থি । আইন ও নৈতিকতা বিরোধী কাজই হচ্ছে অপরাধ । অপরাধের সাথে মানুষ ও সমাজের সম্পর্ক বিদ্যমান । কোনো এক উৎস বা কারণ অপরাধের জন্য দায়ী নয় । বাংলাদেশে অপরাধের কারণগুলো নিম্নে আলোচনা করা হলো –

(১) **পারিপার্শ্বিক অবস্থা :** স্থান, কাল, পাত্রভেদে অপরাধ প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় । কেননা, বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশে অভাবের তাড়নায় মানুষ অপরাধপ্রবণ হয়ে ওঠে । ধনী দেশগুলোতে অপরাধের কারণ ভিন্ন ।

(২) **সঙ্গ দোষ :** মানুষ অপরাধী হয়ে জন্মগ্রহণ করে না । পরিবেশের প্রভাব, অপরাধীদের সাথে মেলামেশা করায় অপরাধপ্রবণ হয়ে ওঠে ।

(৩) **অর্থনৈতিক অবস্থা :** মানুষ ভালোভাবে বাঁচতে চায় । দারিদ্র্যের আঘাতে মানুষ অপরাধী হয়ে ওঠে । কেননা সমাজে যারা স্বচ্ছল তাদের মত হবার বাসনায় আর্থিক মর্যাদা লাভের জন্য দারিদ্র শ্রেণীর কিছু লোক অপরাধ প্রবণ হয়ে পড়ে । সমাজে বিত্তবানদের টাকা–পয়সার প্রাচুর্য, দামি দামি বিলাস সামগ্রীর রূপ দেশের যুব সমাজকে আকৃষ্ট করে অপরাধপ্রবণ করে তোলে । দরিদ্র্য, বেকারত্ব, আর্থিক মর্যাদা লাভের আকাঙ্ক্ষা, শিল্পায়ন ও শহরায়ন ইত্যাদি অপরাধ প্রবণতার জন্ম দেয় । অনেক ক্ষেত্রেই, মানুষ দারিদ্র্য ও বেকারত্ব থেকে মুক্তি পেতে অপরাধে জড়িয়ে পড়ে ।

(৪) **পাশ্চাত্যের প্রভাব :** পাশ্চাত্য সভ্যতার হাতছানিতে একশ্রেণীর লোক বিভিন্ন অসামাজিক কর্মকাণ্ডে নিজেদের বিলিয়ে দিয়েছে। সামজিকভাবে ক্ষতিকর নগ্ন প্রকাশনা, আমোদ-প্রমোদ, ছায়াছবি প্রভৃতি মানুষকে অপরাধ প্রবণ করেছে।

(৫) **সামাজিক আস্থা :** বাংলাদেশে হতাশা, সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা, নিরক্ষরতা, বস্তি জীবন, নোংরা সামাজিক পরিবেশ ব্যক্তিকে অনেক ক্ষেত্রে অপরাধ কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে ফেলে।

(৬) **প্রচ্ছন্ন প্রকৃতি :** কেউই জন্মগতভাবে সন্ত্রাসী বা অপরাধী নয়। কিন্তু পরিবর্তিতে বিভিন্ন কারণে অপরাধী হয়ে ওঠে। যেমন– দৈহিক অস্বাভাবিক অবস্থা, মানসিক ভারসাম্যহীনতা, অপরাধীর সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক প্রভৃতি অপরাধ প্রবণতা জাগিয়ে তুলতে পারে।

(৭) **সামাজিক অবক্ষয় :** বহুবিধ কারণে সামাজিক অবক্ষয়ের সৃষ্টি হয়েছে। অনৈতিকতার বিস্তার ঘটেছে, যার ফলে সৃষ্টি হচ্ছে সামজিক অবক্ষয়। সামাজিক অবক্ষয় অপরাধের জন্ম দিচ্ছে।

(৮) **রাজনৈতিক প্রশ্রয় :** রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে ক্ষমতায় যাবার লোভে বহুলোক অবৈধ কাজে জড়িয়ে পড়ে। অবৈধ কাজ করলে শাস্তি পেতে হয়। কিন্তু রাজনৈতিক আশ্রয় ও প্রশ্রয়ে অপরাধী আরও অপরাধ প্রবণ হয়ে ওঠে ও অন্যকে উৎসাহিত করে।

(৯) **প্রশাসনিক দুর্বলতা :** বাংলাদেশে প্রশাসনিক দুর্বলতার কারণে অপরাধীকে খুঁজে বের করে অনেক ক্ষেত্রে শাস্তি প্রদান করা সম্ভব হয় না। কেননা রাজনৈতিক হস্তক্ষেপে প্রশাসন নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে। অপরাধী কাজ চালিয়ে যায়, ক্রমেই অপরাধ বেড়ে চলে।

বাংলাদেশের কতিপয় অপরাধ

১। **ঘুষ :** অনিয়ম ও বেআইনি পন্থায় কাজ করে দেবার জন্য যে আর্থিক লেনদেন হয় তাকে ঘুষ বলে। অযথা হয়রানির জন্য নিয়ম বহির্ভূতভাবে ফাইল আটকিয়ে আর্থিক সুবিধা আদায়ের জন্য আর্থিক লেনদেনকে ঘুষ বলা হয়। বাংলাদেশে ঘুষ সমাজের রন্ধে রন্ধে প্রবেশ করেছে। বর্তমানে অনেকে ঘুষ না বলে 'বাড়তি সুবিধা' বলতে চায়। ধর্মীয় বিধান মতে ঘুষ দেওয়া ও নেওয়া অমার্জনীয় অপরাধ। ঘুষ জাতিকে অপরাধের দিকে ধাবিতে করে।

২। **দুর্নীতি :** দুর্নীতি বলতে নীতিবিহীন কাজ করাকে বোঝায়। প্রশাসন বিজ্ঞানে দুর্নীতির অর্থ হল দায়িত্বশীল পদে সমাসীন হয়ে ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে আর্থিক সুবিধা লাভের জন্য স্বজনপ্রীতি ও পক্ষপাতিত্বের আশ্রয় গ্রহণ। ফলে প্রশাসন ব্যবস্থায় নেমে আসে অন্ধকারের ঘনঘটা। দুর্নীতির কারণে প্রশাসন সঠিক পদক্ষেপ নিতে পারে না, ন্যায়বিচার থেকে নিরপরাধ লোক বঞ্চিত হয়, অযথা কাজে বিলম্ব ঘটিয়ে জটিলতা সৃষ্টি করে মিথ্যাচারের আশ্রয় নেয়। দুর্নীতি ভয়াবহভাবে অপরাধ প্রবণতার জন্ম দেয়।

৩। **কর্ম ফাঁকি :** প্রশাসনিক জগতে একজন কর্মকর্তা বা কর্মচারীর জন্য দৈনন্দিন কাজকর্ম বরাদ্দ থাকে। যদি কর্মচারী তার দৈনন্দিন কাজকর্ম না করে ফেলে রেখে দেয় তবে তাকে কর্ম ফাঁকি বলে। কর্ম ফাঁকি এক ধরনের সামাজিক অপরাধ। নিজের কাজ না করে অন্যের সঙ্গে গল্পগুজব করে কাজে ফাঁকি ও অপরের কাজে বিঘ্ন ঘটায়। কর্ম ফাঁকি দিতে যারা অভ্যস্ত তারা শুধু অন্যের কাজে বিঘ্ন ঘটায় না, বরং নিজের দলভারী করার জন্য অন্যকে আকর্ষণ করে। ফাঁকিবাজ কর্মচারীরা এত সংঘবদ্ধ যে, তাদের কিছু বলাও যায় না। তারা অন্যায়ভাবে আর্থিক সুবিধা লাভের জন্য প্রতিষ্ঠানের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। প্রশাসনিক উপায়ে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করে কর্ম ফাঁকি থেকে দেশকে উদ্ধার সরকারের নৈতিক দায়িত্ব।

৪। **মাদকাসক্তি :** মানুষ মাদকদ্রব্য সেবন করলে অল্প দিনের মধ্যে শারীরিক ও মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে মাদক দ্রব্য সংগ্রহ ও ভোগের জন্য পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের তাদের প্রাপ্য হতে বঞ্চিত করে। মাদক দ্রব্য সেবনের পয়সা যোগাড় করার জন্য চুরি, রাহাজানি, ডাকাতি, ছিনতাই ইত্যাদি অপরাধমূলক কার্যকলাপের সাথে জড়িয়ে পড়ে। মাদক-ব্যবসায়ী ও পাচারকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থার

বিধান করা আবশ্যক। এভাবে মাদকাসক্তি সমাজকে কুলষিত করে। দেশকে মাদক দ্রব্যের অন্যায় ব্যবহার থেকে মুক্ত করার তাগিদে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে।

৫। **আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি :** আইন না থাকলে ন্যায়বিচার থাকে না, ন্যায়বিচার না থাকলে মানুষের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা থাকে না। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটলে অপরাধীচক্র সক্রিয় হয়ে ওঠে ও অপরাধের জাল বিস্তার করে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি নিশ্চিত করলে অপরাধী গোষ্ঠী দুর্বল হয়ে পড়বে। অপরাধীর শাস্তির বিধান নিশ্চিত করলে জনগণ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলবে ও ভালোভাবে আশার আলো নিয়ে বেঁচে থাকবে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি রক্ষার জন্য নাগরিক ও সরকারকে যৌথভাবে এগিয়ে আসতে হবে।

সারসংক্ষেপ

অপরাধ প্রবণতার মূল কারণ সামাজিক অবক্ষয় ও নৈতিকতাহীনতা। দেশের আপমর জনগণকে নৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে সৎ পরিশ্রমী ও সৎপথে রোজগারে অভ্যস্ত করে গড়ে তুলতে পারলে সমাজ থেকে অপরাধ দূরে সরে দাঁড়াবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

(ক) নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। অপরাধ বলতে কি বুঝায়?

(ক) আইনগতভাবে নিষিদ্ধ কর্মকাণ্ড (খ) সামাজিকভাবে নিষিদ্ধ কর্মকাণ্ড

(গ) অনৈতিক কর্মকাণ্ড (ঘ) উপরের সবকটি

২। 'আইন লঙ্ঘন করাই অপরাধ' – উক্তিটি কার?

(ক) র‍্যাডক্লিফ ব্রাউন (খ) ই.এইচ. সাদারল্যাণ্ড

(গ) বি. অ্যাচলার (ঘ) কোনটি নয়

৩। অপরাধের মূল কারণ কি?

(ক) নৈতিকতাহীনতা (খ) পারিবারিক শিক্ষা

(গ) আইন-শৃঙ্খলার অবনতি (ঘ) ঘুষ

(খ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। অপরাধপ্রবণতা কাকে বলে?

২। নৈতিকতাহীনতার সঙ্গে অপরাধ প্রবণতার সম্পর্ক কী?

৩। ঘুষ, দুর্নীতি ও কর্ম ফাঁকি কীভাবে প্রতিরোধ করা যায়?

(গ) রচনামূলক প্রশ্ন

১। অপরাধপ্রবণতার কারণসমূহ ব্যাখ্যা করুন।

২। বাংলাদেশের কতিপয় অপরাধ সম্পর্কে আলোচনা করুন।

(ক) উত্তরমালা

১। (ঘ) ২। (খ) ৩। (ক)

পাঠ-২ : অপরাধ প্রবণতা রোধে নাগরিক ও সরকারের দায়িত্ব

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- অপরাধ প্রবণতা রোধে সরকারের দায়িত্ব-কর্তব্য বর্ণনা করতে পারবেন।
- অপরাধ প্রবণতা রোধে নাগরিকের দায়িত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

নাগরিক দায়িত্ব

অপরাধ প্রবণতা সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলা ও রাষ্ট্রীয় স্থিতিশীলতার পরিপন্থী। এর প্রতিরোধ ও প্রতিকার আবশ্যক। সরকারের পাশাপাশি ব্যক্তিরও দায়বদ্ধতা আছে অপরাধ দমনের। কেবলমাত্র আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী দ্বারা অপরাধ দমন ও নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। নিম্নে অপরাধ নিয়ন্ত্রণে নাগরিকের দায়িত্ব বর্ণনা করা হলো :

(১) অপরাধের বিরুদ্ধে জনসচেতনতা গড়ে তুলতে হবে।

(২) অপরাধ সংঘটন হলে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে জানাতে হবে।

(৩) প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের ঘুষ দেয়া থেকে বিরত থাকতে হবে।

(৪) সৎ ও যোগ্য নেতৃত্বকে নির্বাচন করতে হবে যাতে তারা অপরাধীকে প্রশ্রয় না দেয়।

(৫) সংঘবদ্ধভাবে অপরাধীর কাজে বাঁধা দিতে হবে।

(৬) অপরাধীকে সামাজিকভাবে বয়কট করতে হবে।

(৭) অপরাধীকে তার কর্মকাণ্ডের পারিণতি সম্পর্কে বোঝাতে হবে।

(৮) বেসরকারি উদ্যোগে কিশোর অপরাধী, মাদকাসক্তদের সংশোধনের ব্যবস্থা করতে হবে।

(৯) আদালতে সাক্ষ্যদানের প্রয়োজন হলে সাক্ষ্য দিতে হবে। মনে রাখতে হবে, সাক্ষ্যের অভাবে অনেক অপরাধী খালাশ হয়ে যাচ্ছে।

রাষ্ট্র বা সরকারের দায়-দায়িত্ব

ক্রমবর্ধমান অপরাধ প্রবণতা সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা ও জনজীবনের শান্তির শত্রু। এই শত্রুর মূলোৎপাটন করতে হলে নাগরিক ও সরকারকে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে। যেমন–

(১) **পুলিশী তৎপরতা বৃদ্ধি :** পুলিশ বাহিনীকে আধুনিক প্রশিক্ষণ দিয়ে সুসজ্জিত করে অপরাধের বিরুদ্ধে দুর্গ গড়ে তুলতে উৎসাহিত করতে হবে। তাদেরকে সাহসী কাজের জন্য পুরস্কার এবং অসৎ কাজ ও ভীরুতার জন্য তিরস্কার করতে হবে। নাগরিকদের জানমাল, নিরাপত্তা রক্ষার তাগিদে পুলিশ বাহিনীকে সংখ্যায় ও অস্ত্রে শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে হবে, যাতে তারা অতন্দ্র প্রহরীর ন্যায় জনগণকে অপরাধীদের হাত থেকে নিরাপদে রাখতে পারে।

(২) **বিচার ব্যবস্থা :** বিচারকার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নিমিত্তে সৎ, যোগ্য ও নিরপেক্ষ বিচক্ষণ বিচারক নিয়োগ করা প্রয়োজন। এজন্য সরকারকে বিচারকদের মর্যাদা রক্ষার্থে উচ্চতর বেতন-ভাতা দিয়ে নিরপেক্ষ বিচার কাজের নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে। যাতে প্রকৃত অপরাধীরা আইনের ফাঁক দিয়ে বের হতে না পারে। অপরাধীরা শাস্তি ভোগ করলে অপরাধ প্রবণতা হ্রাস পাবে।

(৩) **কারাগার সংগঠন :** অপরাধী অপরাধ করে ধরা পড়লে দ্রুত আদালতে সোপর্দ করে আদালত থেকে কারাগারে পাঠিয়ে দিতে হবে। কারাবাসে অপরাধীদেরকে বিভিন্ন কাজের প্রশিক্ষণ দিয়ে কর্মক্ষম করে গড়ে তুলতে হবে। যাতে তারা কারাভোগের মধ্য দিয়ে সংশোধিত হয়ে সমাজে পুনর্বাসিত হতে পারে।

(৪) **শাস্তিমূলক ব্যবস্থা :** অপরাধ ছোট হোক আর বড় হোক অপরাধ করলে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হওয়া উচিত। শাস্তি যত কঠোর হবে অপরাধ তত কমে যাবে। গুরুতর অপরাধকারীর বিচার করে সরকার মৃত্যুদণ্ড দিতে পারে। দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা অপরাধ রোধ করতে পারে।

(৫) **সংশোধনমূলক :** অপরাধ বিজ্ঞানে অপরাধকে ব্যাধি হিসেবে গণ্য করা হয়। ওষুধ সেবন করলে যেমন ব্যাধি দূর হয় তেমনি অপরাধের চিকিৎসা করলে অপরাধ দূরীভূত হয়। সরকার অপরাধীদের মনোভাব বা দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের লক্ষে মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসা দিয়ে তাদের সমাজে পুনর্বাসন করতে পারে। তাছাড়া অপরাধকে অপরাধ মনে না করে রোগ হিসেবে চিহ্নিত করে নিরাময়ের ব্যবস্থা নিলে অপরাধ হ্রাস পায়।

অপরাধ দমনে পুলিশের ভূমিকা : মানুষ সামাজিক ও রাজনৈতিক জীব। সমাজ থেকে অপরাধের উৎপত্তি ও বিকাশ। অপরাধকে সমাজ থেকে নির্মূল করতে হলে আইন সহায়তাকারী বাহিনী হিসেবে পুলিশের ভূমিকা অপরিহার্য। পুলিশ কথাটির অর্থ সাহায্যকারী। সমাজে নিরীহ জনগণের জানমাল রক্ষার দায়িত্ব আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী হিসেবে পরিচিত পুলিশের হাতে ন্যস্ত। পুলিশ তৎপর হলে অপরাধী চক্র সতর্কতা অবলম্বন করে সাবধান হয়। কিন্তু পুলিশ যদি অবহেলার সাথে দায়িত্ব পালন করে তবে অপরাধ দমন তো দূরের কথা, তা আরও বিস্তার লাভ করে।

আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে সব লোভ-লালসার ঊর্ধ্বে থেকে করার জন্য অভিযান চালাতে হবে। কিন্তু যদি তারা উদাসীন, ঘুষ, দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করে তবে দেশ ও জাতির অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হবে। মূলত পুলিশের তদন্ত রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে বিচারক বিচার কার্য সম্পাদন করেন। পুলিশ যদি দুর্নীতি পরায়ন হয়, তবে তদন্ত কার্যে অপরাধী 'নিরাপরাধ' হিসেবে আবির্ভূত হবে। কাজেই সুষ্ঠু বিচারের স্বার্থেও পুলিশকে সৎ ও দক্ষ হতে হবে।

সারসংক্ষেপ

অপরাধ দমনে সরকারের পাশাপাশি ব্যক্তিরও দায়িত্ব আছে। অপরাধের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলতে না পারলে অপরাধ প্রবণতা রোধ করা সম্ভব নয়। ঘুষ, দুর্নীতি, মাদকাশক্তি, কিশোর অপরাধ প্রভৃতি সম্পর্কে জনগণের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তুলে তা অনেকটাই নিয়ন্ত্রণ করা যায়। তবে অপরাধ প্রবণতা রোধে রাষ্ট্রকে মুখ্য ভূমিকা পালন করতে হবে। অপরাধীকে শাস্তি দেয়ার দায়িত্ব রাষ্ট্রের। অপরাধী দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি পেলে অনেকেই অপরাধ করা থেকে বিরত থাকবে। অপরাধ দমনে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও রাজনৈতিক নেতৃত্বকে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতে হবে। অন্যথায় অপরাধ বেড়েই চলবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

(ক) সত্য-মিথ্যা নির্ণয়

সত্য হলে 'স' মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন ।

১ । অপরাধ দমনে নাগরিকের কোন দায়িত্ব নেই ।

২ । অনেকক্ষেত্রে সাক্ষীর অভাবে অপরাধী মুক্তি পাচ্ছে ।

৩ । অপরাধ প্রবণতা রোধের মূল দায়িত্ব রাষ্ট্রের ।

৪ । মাদকাসক্তি অপরাধ নয় ।

৫ । সামাজিক সচেতনতা গড়ে অপরাধ প্রবণতা মোকাবেলা করা যায় ।

(খ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১ । অপরাধ দমনে নাগরিকের দায়িত্ব বর্ণনা করুন?

২ । পুলিশ বাহিনী কিভাবে অপরাধ দমন করতে পারে?

৩ । সচেতনতা সৃষ্টি করে কিভাবে অপরাধ প্রবণতা রোধ করা যায়?

(গ) রচনামূলক প্রশ্ন

১ । অপরাধ দমনের উপায়সমূহ বর্ণনা করুন ।

২ । অপরাধ প্রবণতা রোধে রাষ্ট্র ও নাগরিকের দায়িত্ব আলোচনা করুন ।

(ক) উত্তরমালা

১ । মি, ২ । স, ৩ । স, ৪ । মি, ৫ । স

পাঠ-৩ : সন্ত্রাসের কারণ ও তা প্রতিকারের উপায়

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- সন্ত্রাস বলতে কি বুঝায় তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন ।
- বাংলাদেশে সন্ত্রাসের কারণ বর্ণনা করতে পারবেন ।
- সন্ত্রাস দমনের উপায়সমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন ।

সন্ত্রাস

সন্ত্রাস বলতে বল প্রয়োগমূলক কার্যকলাপকে বোঝায় । আইনকে উপেক্ষা করে আইন-শৃঙ্খলা পরিপন্থী কাজ করাকে সন্ত্রাস বলে । সাধারণ জনগণের ওপর ভয়-ভীতি প্রদর্শনপূর্বক যে কোন ধরনের আক্রমণ বা হুমকিকে সন্ত্রাস বলে অবিহিত করা হয় । যুক্তরাষ্ট্রের FBI এর মতে, বেসামরিক নাগরিকের ওপর স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে যে কোন ধরনের হামলাকে সন্ত্রাস বলে । সন্ত্রাস আইন বিরোধী জবরদস্তীমূলক কার্যকলাপ । সন্ত্রাসী কার্যকলাপে দেশের আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটে । নাগরিক জীবন বিপন্ন হয় । মানুষের কোন সামাজিক নিরাপত্তা থাকে না । সহজ কথায়, সামাজিক রীতি-নীতি লঙ্ঘন করে পেশী শক্তির জোরে অপরাধ করাকে সন্ত্রাস বলে ।

সন্ত্রাসের কারণসমূহ

সন্ত্রাস এর উৎস একটি নয়, একাধিক । নানা কারণে ও অবস্থাভেদে সন্ত্রাসের জন্ম হয় এবং বিস্তার লাভ করে । আমাদের দেশে সন্ত্রাসের কারণগুলো নিম্নে আলোচনা করা হলো–

(১) **অবস্থানগত ও পারিপার্শ্বিক কারণ :** ভৌগোলিক অবস্থান হেতু বিভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির সন্ত্রাস ঘটে । শীতপ্রধান দেশে তুলনামূলকভাবে সন্ত্রাস কম হয় । গ্রীষ্মপ্রধান দেশে সন্ত্রাস বেশি । সন্ত্রাসের সঙ্গে আবহাওয়ার সম্পর্ক বিদ্যমান । উন্নত দেশে সন্ত্রাস কম কিন্তু উন্নয়নশীল দেশে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ বেশি । উন্নত দেশে অর্থ ও সম্পদের প্রবাহ স্থিতিশীল । কিন্তু উন্নয়নশীল দেশে অর্থ ও সম্পদের প্রবাহ অনিশ্চিত ও অস্থির । এজন্য সন্ত্রাস দানা বেঁধে ওঠে ।

(২) **ব্যক্তির দৈহিক ও মানসিক গঠন :** অস্বাভাবিক দৈহিক বৃদ্ধি ও শক্তি, মানসিক অস্থিরতা ও ঈর্ষাবোধ হতে সন্ত্রাসের জন্ম হয় ।

(৩) **পারিবারিক প্রভাব :** সন্ত্রাসীর সন্তান সন্ত্রাসী হওয়ার ঘটনা বিরল নয় । তাছাড়া অসামাজিক কাজে অভ্যস্ত অপরাধীর ছেলে-মেয়েরা সন্ত্রাসী হয় বেশি ।

(৪) **অর্থনৈতিক অবস্থা :** দারিদ্র্য, বেকারত্ব, আর্থিক মর্যাদা, শহরায়ন ও শিল্পায়নের মধ্য থেকে সন্ত্রাসের জন্ম হয় । ক্ষুধা নিবৃত্ত করতে ও দারিদ্র্য কাটিয়ে ওঠার জন্য অনেকেই সন্ত্রাসের আশ্রয় নিয়ে সম্পদ অর্জনের চেষ্টা করে । বেকারত্ব সন্ত্রাসের জন্ম দেয় । বেশি দিন বেকার থাকার ফলে মানসিক ভারসাম্যের অবনতি ঘটে এবং বেপরোয়া জীবনের চর্চা করতে করতে সন্ত্রাসী হয়ে পড়ে । আর্থিক মর্যাদা অর্জনের মাধ্যমে সম্ভোগের জীবনযাপনের তাগিদে কেউ কেউ সন্ত্রাসী হয়ে পড়ে । শহরায়ন ও শিল্পায়নের ফলে অর্থের সরবরাহ বৃদ্ধি পায় । শহরের বাজারগুলো দামি সামগ্রীতে ভরে ওঠে । কিন্তু যারা তা নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় ভোগ করতে পারে না, তারা সন্ত্রাসের মাধ্যমে তা পেতে চায় । বাংলাদেশে আর্থিক অবস্থার জন্য সন্ত্রাসের প্রবণতা বেশি ।

(৫) **সামাজিক অবস্থা :** বিপর্যস্ত পরিবার, সামাজিক পরিবেশ ও শিক্ষার অভাবে সন্ত্রাস দানা বেঁধে ওঠে । যে পরিবারে ছেলে-মেয়েদের প্রতি বাবা-মার স্নেহ, ভালোবাসা থাকে না, সে পরিবারের ছেলেমেয়েরা মূল্যবোধ বিবর্জিত হয়ে গড়ে ওঠে । ঘিঞ্জি, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ মানুষের দেহ ও মনের ওপর প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি

করে মানুষকে অসহনীয় করে তোলে। ফলে সন্ত্রাসের জন্ম হয়। সুশিক্ষা ও ধর্মীয় মূল্যবোধের অভাব সন্ত্রাসের অন্যতম উৎস। বাংলাদেশে সামাজিক অবস্থা সন্ত্রাসের জন্য দায়ী।

(৬) **রাজনৈতিক অবস্থা :** বাংলাদেশের সন্ত্রাসের অন্যতম প্রধান উৎস হল অনুন্নত রাজনীতি। এখানে রাজনৈতিক দলের নেতা ও কর্মীরা সন্ত্রাস করে এবং সন্ত্রাসীকে সাহস ও সহযোগিতা দান করে। বাংলাদেশের অধিকাংশ সন্ত্রাসী কোনো না কোনো রাজনৈতিক দলের সদস্য ও কর্মী। অবৈধ উপায়ে রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ ও ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য বিরোধী শক্তিকে পর্যুদস্ত করার লক্ষে সন্ত্রাসীদের পোষণ করে এবং প্রয়োজনবোধ তাদেরকে লেলিয়ে দেয়া হয়। বাংলাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিশেষ করে দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে সন্ত্রাসের কারণ হল কিছু সংখ্যক শিক্ষক ও ছাত্রের রাজনৈতিক দলের লেজুরবৃত্তি।

(৭) **প্রশাসনিক দুর্বলতা :** দুর্বল প্রশাসন, মারদাঙ্গা ধরনের সিনেমা, যাত্রা ও নাটকের ছড়াছড়ি, নোংরা ছায়াছবি, মাদকদ্রব্য সেবন, অশ্লীল পত্রিকা ও পুস্তিকার প্রকাশনা, আইন-শৃঙ্খলার অবনতি, ঘুষ, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষের নিষ্ক্রিয়তা এবং প্রশাসনিক কঠোরতার অভাবে বাংলাদেশে সন্ত্রাস ব্যাপক আকার ধারণ করেছে।

সন্ত্রাস প্রতিরোধ ও প্রতিকারের উপায়

বাংলাদেশে সন্ত্রাস একটি সামাজিক ব্যাধি। একে যেমন প্রতিরোধ করা যায় তেমনি নিরাময়ও করা যেতে পারে। সন্ত্রাস যাতে জন্ম নিতে না পারে এবং সন্ত্রাসীরা যাতে নাগরিকবৃন্দের জানমালের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করতে না পারে সেজন্য নিম্নোক্ত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা আবশ্যক।

(১) **সন্ত্রাসবিরোধী আইন প্রণয়ন :** সন্ত্রাস দমনের লক্ষে সন্ত্রাসীদের বিচারের জন্য কঠোর আইন প্রণয়ন করা প্রয়োজন। যারা প্রকাশ্যে আইন-শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে নাগরিকদের জানমালের ক্ষতি সাধন করছে তাদেরকে কোনোভাবে ক্ষমা করা যায় না। সন্ত্রাস দমনের জন্য চরম শাস্তির ব্যবস্থা করলে সন্ত্রাস আপনা থেকে কমে যাবে।

(২) **পুলিশ প্রশাসনের পুনর্গঠন :** সন্ত্রাসীরা মারাত্মক অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে সন্ত্রাস করে। সেখানে পুলিশকে লাঠি ও প্রাচীন রাইফেল, বন্দুক দিয়ে সন্ত্রাস দমন করানো যাবে না। সন্ত্রাস প্রতিরোধের জন্য পুলিশ বাহিনীকে আধুনিক ও স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রে সজ্জিত করতে হবে। তাছাড়া আমাদের দেশে পুলিশ ও জনসংখ্যার অনুপাতে ব্যাপক ব্যবধান বিদ্যমান। এখানে প্রায় ১৪০০ মানুষের জন্য একজন পুলিশ কর্মকর্তা। এ অবস্থার নিরসন হওয়া বাঞ্ছনীয়। পুলিশর সংখ্যা, পুলিশ ফাঁড়ি, থানা ও উপজেলার সংখ্যা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

(৩) **কর্মনিয়োগ বৃদ্ধি ও বেকার ভাতা প্রদান :** দেশে কুটির শিল্প, বৃহদায়তন শিল্প ও কলকারখানা স্থাপন, সকল ক্ষেত্রে শূন্যপদ পূরণ ও নতুন নতুন কর্মক্ষেত্র ওঠে করতে হবে। বেকারত্ব দূরীকরণ সম্ভব হলে সন্ত্রাসী কর্মতৎপরতা অনেকাংশে হ্রাস পাবে। বেকারত্ব দূরীকরণের জন্য অগ্রসর দেশের মতো না হলেও ন্যূনতম জীবনমান বজায় রাখার মতো বেকার ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা করা দরকার। সামাজিক নিরাপত্তা হিসেবে বেকার ভাতা উত্তম ব্যবস্থা।

(৪) **সর্বজনীন শিক্ষা ও মূল্যবোধের জাগরণ :** সকলের জন্য শিক্ষার সুযোগের মাধ্যমে নাগরিকদের মধ্যে সামাজিক ও নৈতিক বোধ জাগ্রত করতে হবে। এ উদ্দেশ্যে বিদ্যালয় এবং বিভিন্ন শিক্ষা কর্মসূচিতে নৈতিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা যায়। এতে সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপের প্রতিরোধ ও প্রতিকার সম্ভব হবে।

(৫) **শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রাজনীতি নিষিদ্ধকরণ :** দেশের কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রাজনীতি করা যাবে না। ছাত্র সমাজের উন্নয়ন ও শিক্ষকের কল্যাণের জন্য কল্যাণ সমিতি গঠন করা যেতে পারে কিন্তু এর সঙ্গে রাজনীতির কোনো সংশ্রব থাকা চলবে না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রাজনীতি নিষিদ্ধ করার জন্য সকল রাজনৈতিক দলকে সম্মিলিতভাবে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এটা করতে পারলে সন্ত্রাসী কার্যকলাপের সিংহভাগ হ্রাস পাবে।

(৬) **রাজনৈতিক দলে সন্ত্রাসীদের আশ্রয় না দেওয়া :** কোনো রাজনৈতিক দলের ক্যাডার থাকা চলবে না। রাজনৈতিক দলে কোনো সন্ত্রাসীকে আশ্রয় দেওয়া যাবে না। কোনো দল সন্ত্রাসীকে আশ্রয় দিলে সে দলের রেজিস্ট্রেশন বতিল করতে হবে।

(৭) **প্রশাসনিক কঠোরতা :** সন্ত্রাস দমন, ঘুষ ও দুর্নীতি বন্ধ, স্বজনপ্রীতি রোধ এবং কঠোর প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। কোনো কারণে কারও কাছে পুলিশ প্রশাসন ও সাধারণ প্রশাসন মাথা নত করবে না এবং দুর্নীতির আশ্রয় নেবে না। এরূপ শক্ত হাতে প্রশাসন গড়ে তুলতে পারলে সন্ত্রাসী আপনা থেকে প্রতিরোধের সম্মুখীন হবে।

(৮) **গণসচেতনতা :** জনগণের সচেতন প্রতিরোধ সন্ত্রাস দমনের মহৌষধ। জনগণ সচেতনভাবে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সোচ্চার ও সংঘবদ্ধ হলে সন্ত্রাস বহুলাংশে হ্রাস পাবে।

সারসংক্ষেপ

বেসামরিক লোকের ওপর যে কোন ধরনের হামলাই সন্ত্রাস। হুমকি কিংবা ভয়-ভীতি প্রদর্শন করাও সন্ত্রাসী কার্যকলাপ। সন্ত্রাস বাংলাদেশের একটি অন্যতম সামাজিক ব্যাধি। সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, পারিপার্শ্বিক প্রভৃতি কারণে সন্ত্রাসের বিস্তার ঘটে। সন্ত্রাস দমনের প্রধান দায়িত্ব সরকার ও পুলিশ প্রশাসনের হলেও নাগরিকদেরও এক্ষেত্রে দায়িত্ব রয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

(ক) নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। সন্ত্রাসব বলতে বুঝায় —

(ক) প্রতারণা (খ) ঘুষ গ্রহণ ও প্রদান (গ) জবরদস্তিমূলক কর্মকাণ্ড (ঘ) কোনটি নয়

২। কোনটি সন্ত্রাসের উদাহরণ —

(ক) হুমকি প্রদান (খ) কর ফাঁকি (গ) ঘুষ গ্রহণ (ঘ) উপরের সবকটি

৩। সন্ত্রাস প্রতিরোধের মহৌষধ কি?

(ক) প্রশাসনিক কঠোরতা (খ) সার্বজনীন শিক্ষা (গ) গণসচেতনতা (ঘ) কঠোর আইন প্রণয়ন

(খ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। সন্ত্রাস বলতে কি বুঝায়?

২। সন্ত্রাসের পাঁচটি কারণ লিখুন?

৩। সন্ত্রাস প্রতিরোধের পাঁচটি উপায় লিখুন।

৪। গণসচেতনতা কিভাবে সন্ত্রাস প্রতিরোধ করতে পারে?

৫। সন্ত্রাস দমনে পুলিশের ভূমিকা কি?

(গ) রচনামূলক প্রশ্ন

১। বাংলাদেশে সন্ত্রাস বিস্তারের কারণসমূহ লিখুন।

২। কিভাবে বাংলাদেশে সন্ত্রাস দমন করা সম্ভব – তা আলোচনা করুন।

(ক) উত্তরমালা

১। (গ) ২। (ক) ৩। (গ)

পাঠ-৪ : বাংলাদেশে মাদকাসক্তি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- বাংলাদেশে মাদকাসক্তির কারণসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।
- মাদকাসক্তি সমস্যা সমাধানের উপায় আলোচনা করতে পারবেন।

ভূমিকা

মাদকাসক্তি বাংলাদেশের অন্যতম এক সামাজিক সমস্যা। মাদকের ভয়াবহ ছোবলে অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে বহু তরুণের তাজা প্রাণ। বিঘ্নিত হচ্ছে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া। কেবল বাংলাদেশ নয়, সমগ্র বিশ্বই ভয়াবহ এ সমস্যার সম্মুখীন।

মাদক দ্রব্য ও মাদকাসক্তি : মাদক দ্রব্য হচ্ছে সে সব নিষিদ্ধ বস্তু যা গ্রহণের ফলে স্নায়ুবিক বৈকল্যসহ নেশার সৃষ্টি হয়। সুনির্দিষ্ট সময় পর পর তা সেবনের দুর্বিনীত আসক্তি অনুভূত হয়। কেবল সেবন দ্বারাই সে তিব্র আসক্তি (সাময়িক) দূরীভূত হয়। এর কু-প্রভাব ও ভয়াবহতা মারাত্মক।

বাংলাদেশে যেসব মাদক দ্রব্যের সেবন সর্বাধিক সেগুলো হলো– গাঁজা, ফেনসিডিল, হেরোইন, মদ, বিয়ার, তাড়ি, পঁচুই, প্যাথেডিন, ঘুমের ওষুধ ইত্যাদি। এসব মাদক দ্রব্য গ্রহণ করে নেশা সৃষ্টি ও অপ্রকৃতিস্থ হওয়াকে মাদকাসক্তি বলা হয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)'র মতে, মাদকাসক্তি হচ্ছে, চিকিৎসায় গ্রহণযোগ্য নয় এমন দ্রব্য অতিরিক্ত পরিমাণে ক্রমাগত বিক্ষিপ্তভাবে গ্রহণ করা এবং এসব দ্রব্যের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

মাদকাসক্তির কারণ

মাদকাসক্তির কারণ বহুবিধ। এ পর্যন্ত সমাজবিজ্ঞানী, গবেষক ও চিকিৎসকরা মাদকাসক্তির অন্তরালে যে কারণগুলো সক্রিয় বলে চিহ্নিত করেছেন সেগুলো হলো :

১. **সঙ্গদোষ :** মাদকাসক্তির জন্য সঙ্গদোষ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ কোনো বন্ধু-বান্ধব বা পরিচিত ব্যক্তি নেশাগ্রস্ত হলে সে তার সঙ্গীদেরও নেশার জগতে আনার আপ্রাণ চেষ্টা চালায়। এক পর্যায়ে সুস্থ সঙ্গীটিও নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। সেজন্য বলা হয়ে থাকে, 'সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ।'

২. **কৌতূহল :** কৌতূহলও মাদকাসক্তির একটি মারাত্মক কারণ। মাদকাসক্তির ভয়াবহতা জেনেও অনেকে কৌতূহলবশত মাদকদ্রব্য গ্রহণ করে। এভাবে একবার দু'বার গ্রহণের ফলে এক পর্যায়ে সে মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে।

৩. **সহজ আনন্দ লাভের বাসনা :** মানুষ অনেক সময় আনন্দ লাভের সহজ উপায় হিসেবে মাদকের প্রতি ঝুঁকে পড়ে এবং ধীরে ধীরে মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে।

৪. **বিদ্রোহী মনোভাব :** কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিক্ষণে ছেলেমেয়েদের বিদ্রোহী মনোভাবের মধ্য দিয়েই তাদের ব্যক্তিত্ব অনেকাংশে গড়ে ওঠে। এই বিদ্রোহী মনোভাবের কারণে তারা ভালো-মন্দ বিচার না করে সামাজিক অনেক নিয়ম-কানুনের সঙ্গে মিশে যেতে চায় অথবা ভাঙ্গতে চায়। এই বিদ্রোহী মনোভাব তাদেরকে অনেক সময় মাদকাসক্ত করে তোলে।

৫. **মনস্তাত্ত্বিক বিশৃঙ্খলা :** তরুণদের মধ্যে মাদকাসক্তি বিস্তৃতির একটা প্রধান কারণ হলো হতাশা। পরীক্ষায় ফেল, পারিবারিক কলহ, প্রেমে ব্যর্থতা, সেশন জট, বেকারত্ব প্রভৃতি কারণে তারা তাদের শোক, বিষাদ ও বঞ্চনার চেতনাকে নেশায় আচ্ছন্ন করতে চায়।

৬. **পারিবারিক কলহ :** প্রতিটি সন্তানই চায় তার পরিবারের অভ্যন্তরে মা ও বাবার মধ্যে সু-সম্পর্ক বজায় থাকুক। কিন্তু অনেক পরিবারে মা ও বাবার মধ্যে সু-সম্পর্কের পরিবর্তে প্রায়শ দ্বন্দ্ব ও কলহ লেগে থাকে, যা অনেক সন্তানই স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে পারে না। ফলে এক পর্যায়ে এসব সন্তান মাদকাসক্ত হয়ে অন্যভাবে মানসিক প্রশান্তি খোঁজার চেষ্টা করে।

৭. **পরিবারের অভ্যন্তরে মাদকের প্রভাব :** এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের অনেকের পিতা-মাতার মধ্যে নেশার অভ্যাস ছিল। পরিবারের অভ্যন্তরে মাদকের প্রভাবে এসব পিতা-মাতার সন্তান সহজেই মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে।

৮. **ধর্মীয় মূল্যবোধের বিচ্যুতি :** ধর্মীয় মূল্যবোধ ও জ্ঞান মানুষের মধ্যে মানবতাবোধ ও ভ্রাতৃত্বের বিকাশ ঘটায় এবং মানুষকে চরিত্রবান করে তুলে সঠিক পথে পরিচালিত করে। কিন্তু সাম্প্রতিককালে ধর্মীয় মূল্যবোধ থেকে বিচ্যুতি মদকাসক্তি বিস্তারে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

৯. **চিকিৎসাসৃষ্ট মাদকাসক্তি :** বহু নেশাগ্রস্ত ব্যক্তি মাদকদ্রব্য প্রথম গ্রহণ করে ডাক্তারের নির্দেশে। তারপর সতর্ক তত্ত্বাবধানের অভাবে ও ঘন ঘন ব্যবহারের কারণে সেই জীবন রক্ষাকারী ওষুধই একদিন তাকে মাদকাসক্ত করে তোলে।

১০. **মাদকদ্রব্যের সহজলভ্যতা :** নেশা জাতীয় বস্তুটি যদি মানুষের হাতের কাছে না থাকে তবে মানুষ নেশা বা মাদকাসক্ত হবার সুযোগ পাবে না। কিন্তু বাংলাদেশের প্রশাসনিক দুর্বলতার কারণে অনেকটা প্রকাশ্যেই মাদকদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় হয়। মাদকদ্রব্যের সহজলভ্যতার কারণে মাদকাসক্তদের সংখ্যাও দিন দিন বাড়ছে।

মাদকাসক্তি সমস্যা সমাধানের উপায়

মাদকাসক্তির জন্য বহুবিধ কারণ দায়ী। তাই এ সমস্যা মোকাবেলা ও প্রতিরোধ করার জন্য বহুমুখী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। এ সমস্যা মোকাবেলায় একই সেঙ্গ প্রতিকারমূলক ও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। নিম্নে এগুলো আলোচনা করা হলো –

ক. প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা

মাদকাসক্তদের শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক অবস্থা বিচার-বিশ্লেষণ করে তাদের সুস্থ করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করাকে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা বলা হয়। এ প্রক্রিয়ায় আসক্ত ব্যক্তিদের প্রথমে তার পরিবেশ থেকে সরিয়ে আনা হয়, যাতে সে আর পুনরায় মাদক গ্রহণ করার সুযোগ না পায়। পরে তাকে সুস্থ ও স্বাভাবিক করার জন্য কোনো চিকিৎসা কেন্দ্রে ভর্তি করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়, যাতে ব্যক্তি পরিপূর্ণরূপে সুস্থ হয়ে তার হারানো ক্ষমতা ফিরে পায় এবং স্বাভাবিকভাবে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। মাদকাসক্তি প্রতিরোধে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে।

খ. প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা

মাদকাসক্তির করাল ছোবল থেকে সমাজ ও সমাজের মানুষকে রক্ষা করার জন্য যেসব প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ বা কার্যক্রম নেয়া হয় তাকেই প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা বলে। মাদকাসক্তি নিয়ন্ত্রণে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হিসেবে যেসব পদক্ষেপ নেয়া হয় সেগুলো নিম্নরূপ :

১. মাদকদ্রব্যের উৎপাদন ও আমদানি নিষিদ্ধকরণের লক্ষে সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর সাথে সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ করে প্রতিরোধ ব্যবস্থা জোরদার করা।

২. স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পাঠ্যসূচিতে মাদকের ক্ষতিকর দিকগুলো অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টির কার্যক্রম চালু করা।

৩. বিভিন্ন সভা, সমিতি, সেমিনার, আলোচনা ও অন্যান্য প্রচার মাধ্যমগুলোতে প্রচারের মাধ্যমে মাদক প্রতিরোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৪. মাদক প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত আইনের বাস্তবায়ন করা।

সারসংক্ষেপ

মাদকাসক্তি বাংলাদেশের সমাজে ধীরে ধীরে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। হতাশা, বেকারত্ব, সঙ্গদোষ, কৌতুহল, পারিবারিক কলহ, মূল্যবোধের অবক্ষয় প্রভৃতি কারণে তরুণ সমাজ মাদকাসক্ত হয়ে পড়েছে। মাদকের ভয়াল ছোবল হতে তরুণ সমাজকে রক্ষা করতে একই সঙ্গে প্রতিকারমূলক ও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

(ক) সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন

১। কৌতুহল মাদকাসক্তির একটি কারণ।

২। মাদকাসক্তি প্রতিরোধে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থার গুরুত্ব নেই।

৩। পাঠ্যপুস্তকে মাদক বিষয়ে আলোচনা অনুচিত।

৪। সমগ্র বিশ্বই মাদক সমস্যা মোকাবেলা করছে।

(খ) রচনামূলক প্রশ্ন

১। বাংলাদেশের মাদকাসক্তির কারণসমূহ আলোচনা করুন।

২। মাদক সমস্যা সমাধানের উপায়সমূহ বর্ণনা করুন।

(ক) উত্তরমালা

১। স, ২। মি, ৩। মি, ৪। স

পাঠ-৫ : বাংলাদেশে দুর্নীতি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- দুর্নীতি বলতে কি বুঝায় তা আলোচনা করতে পারবেন ।
- বাংলাদেশে দুর্নীতির কারণসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন ।
- দুর্নীতি দমনের উপায় সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন ।

ভূমিকা

দুর্নীতি বাংলাদেশের এক ভয়াবহ সমাজিক ব্যাধি । দেশের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক প্রতিটি ক্ষেত্রে দুর্নীতি জেঁকে বসেছে । বিশ্ব দরবারে দুর্নীতি ও বাংলাদেশ যেন সমর্থক শব্দ হয়ে গেছে । দুর্নীতির ভয়াবহ সর্বগ্রাসী অবস্থার কারণে দেশের সাধারণ মানুষের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে ।

দুর্নীতির সংজ্ঞায়ন

দুর্নীতি হলো 'নীতি' বহির্ভূত কাজ । যেসব কাজ মানুষের নৈতিক অবক্ষয়ের পরিচয় বহন এবং সামাজিক জীবনে শান্তি-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটিয়ে সমাজের সংহতি ও সামাজিক সম্পর্ক নষ্ট করে তাকে দুর্নীতি বলে । দুর্নীতি রাষ্টীয় তথা জাতীয় জীবনের জন্য অভিশাপ । রাষ্ট্রযন্ত্রের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করে রাষ্ট্র কাঠামোকে বিকল করে দেয় । আক্ষরিক অর্থে, দুর্নীতির বিশ্লেষণ করলে দাঁড়ায় দুষ্টনীতি । অর্থাৎ দুষ্টজন যে নীতি অবলম্বন করে অথবা নৈতিকতার পরিপন্থী যে ধরনের কাজ করে তা-ই দুর্নীতি । তাছাড়া পারিভাষিক অর্থের দিক বিবেচনায় দুর্নীতি হলো যখন ব্যক্তিস্বার্থ বা গোষ্ঠীস্বার্থ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে অবৈধ উপায়ে সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, কর্মচারী কাজ করে অথবা তাদের কোনো প্রভাবশালী ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ তেমনি কাজ করাতে রাজি বা বাধ্য করায় সেই পরিস্থিতিকে দুর্নীতি বলে । দুর্নীতি হলো এমন এক ধরনের বিচ্যুতিমূলক আচরণ, যা মানুষকে নিকৃষ্ট প্রাণীর কাতারে দাঁড় করিয়ে দেয় ।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের ভাষ্য অনুযায়ী দুর্নীতি হলো– "Corruption is the abuse of public office for private gains."

Oxford Dictionary তে বলা হয়েছে, Corruption means anything doing in unusal way." অর্থাৎ, "অবৈধ পথে কিছু করাকেই দুর্নীতি বলে ।

বাংলাদেশে দুর্নীতির প্রধান ক্ষেত্রসমূহ

বাংলাদেশে দুর্নীতি এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছেছে, যা একটা সংস্কৃতি হয়ে দাঁড়িয়েছে । দেশের এমন কোনো ক্ষেত্র নেই যেখানে দুর্নীতি দ্বারা আক্রান্ত হয়নি । দেশে দুর্নীতি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করেছে । বিগত বছরগুলোর দিকে তাকালে দেখা যাবে বিশ্বে দুর্নীতিতে বাংলাদেশের অবস্থান শীর্ষস্থানে । ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের সমীক্ষায় বাংলাদেশ পর পর পাঁচবার দুর্নীতিতে শীর্ষস্থান দখল করেছে । দুর্নীতির এমন ভয়াবহ অবস্থা দেশের অবকাঠামোকে নড়বড়ে করে দিয়েছে । বাংলাদেশের যে ক্ষেত্রে দুর্নীতি অধিক হারে ঘটে থাকে সেগুলো হচ্ছে–

১. রাজনৈতিক;
২. প্রশাসনিক;
৩. সেবা খাত: স্বাস্থ্যসেবা ও চিকিৎসা, পুলিশি সেবা, বিচার বিভাগ, শিক্ষা;
৪. অর্থনৈতিক ক্ষেত্র: উন্নয়ন কর্মকাণ্ড, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি, শুল্ক, কর ও ভ্যাট, বিনিয়োগ ও শিল্পায়ন;
৫. বেসরকারি ও অন্যান্য ক্ষেত্র ।

বাংলাদেশের দুর্নীতির কারণ

বাংলাদেশের দুর্নীতি এমন ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করেছে যে, এ নিয়ে গভীরভাবে ভাববার সময় এসেছে। তাই সমাজবিজ্ঞানী ও অর্থনীতিবিদগণ গবেষণা করে দুর্নীতিরে কারণ উৎঘাটনে তৎপর হয়েছেন। গবেষণার আলোকে দুর্নীতির যেসব কারণ উদঘাটিত হয়েছে তা হলো–

১. প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও জনাবদিহিতার অভাব

গণতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থায় প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা না থাকলে প্রশাসনযন্ত্র দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে অবৈধ লেনদেনের মাধ্যমে অনৈতিক কাজ করা, স্বজনপ্রীতি ও দলীয়করণের মাধ্যমে প্রশাসনকে যথেচ্ছা ব্যবহার করে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষা করা হয়। এতে দেশের বৃহৎ স্বার্থ উপেক্ষিত থাকে। দুর্বল, দরিদ্র ও অসহায় মানুষ ক্ষতির সম্মুখীন হয়।

২. সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্রে অসামঞ্জস্যপূর্ণ বেতন কাঠামো

বাংলাদেশের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে মানুষের দৈনন্দিন জীবন প্রণালী ও জীবিকা নির্বাহের মান ও চাহিদা অনুযায়ী সরকারি এবং বেসরকারি বেতন কাঠামো গঠন করা হনি। সুতরাং যথার্থ বেতন কাঠামো করা প্রয়োজন।

৩. নৈতিক মূল্যবোধের অভাব

যে জাতির নৈতিক অবক্ষয় ঘটবে, সে জাতি চরম হতাশা, বিশৃঙ্খলা ও ধ্বংসের মাঝে নিমজ্জিত হবে। তাছাড়া নৈতিক মূল্যবোধের অভাব হলেই মানুষ অনৈতিক কার্যকলাপ করতে দ্বিধা করে না। বাংলাদেশের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সামাজিক পরিবেশে নৈতিকতার চর্চা কমে যাওয়ায় দেশের দুর্নীতি দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৪. রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন, স্বজনপ্রীতি ও দলীয়করণ

বাংলাদেশের রাজনীতিতে কালো টাকা, পেশি শক্তির প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছে। তাছাড়া স্বজনপ্রীতি ও দলীয়করণ এখানে একটি স্বাভাবিক বিষয় হিসেবে গণ্য। নির্বাচনের সময় টাকার ছড়াছড়ি হয় এবং নির্বাচনের পরে সরকারি কোষাগারের টাকা লুটপাট করে নির্বাচনী ব্যয় ওঠানো হয়। টাকাকে সাদা করারও ব্যবস্থা করা হয়। ফলত সাম্প্রতিককালে দুর্নীতি লাগাম ছাড়া দৃষ্ট হয়।

৫. মূল্যস্ফীতি ও দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি

অর্থ বছরে (২০০৭-০৮) সর্বোচ্চ মূল্যস্ফীতি ছিল ১১.৯২ শতাংশ এবং বিগত পাঁচ বছরে গড়ে ৬ শতাংশ। মূল্যস্ফীতি দিন দিন বাড়ছে। পাল্লা দিয়ে বাড়ছে দ্রব্যমূল্য। জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় দুর্নীতি বৃদ্ধি পেয়েছে বলে অনেকে মনে করেন।

৬. আইন-শৃঙ্খলার অবনতি

আইন-শৃঙ্খলা একটি দেশের রক্ষাকবচের ভূমিকা পালন করে। আইন-শৃঙ্খলার অবনতি হলে দেশ অস্থিতিশীল হয়ে পড়ে। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের মতে বাংলাদেশের আইন-শৃঙ্খলার অবনতির কারণে এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়ার কারণে ৯০ শতাংশ দুর্নীতি হয়ে থাকে।

৭. দুর্নীতি দমনে বলিষ্ঠ পদক্ষেপের অভাব

দেশে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ প্রণয়ন করা হলেও দুর্নীতি দমন কমিশন এখনও স্বাধীনভাবে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিতে পারছেন। দুর্নীতি দমন কমিশন সরকারের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে কাজ করতে পারছে না বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা। দুর্নীতি দমন কমিশনের বলিষ্ঠ পদক্ষেপের অভাবেই মূলত দুর্নীতি ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

দুর্নীতি দমনের উপায়

বাংলাদেশে দুর্নীতির শিকড় অনেক গভীরে গ্রথিত। একদিনে তা উপড়ে ফেলা সম্ভব নয়। তবে দুর্নীতিকে বিভিন্নভাবে দমন করা যেতে পারে। পরবর্তী পৃষ্ঠায় তা আলোচনা করা হলো–

(১) দুর্নীতি দমন কমিশনের স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করতে হবে।

(২) দুর্নীতি দমন কমিশনের ক্ষমতা ও কার্যবিধি বিস্তৃত করতে হবে।

(৩) সরকার ও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ থেকে দুর্নীতি দমন কমিশন এবং এর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মুক্ত রাখতে হবে;

(৪) দলমত নির্বিশেষে দুর্নীতিবাজদের চিহ্নিত করে আইনের মখোমুখি দাঁড় করাতে হবে।

(৫) সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ বিভিন্ন আধা সরকারি এবং এনজিও কর্মীদের বেতন-ভাতা বৃদ্ধি করতে হবে।

(৬) দুর্নীতি প্রতিরোধকল্পে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

(৭) আইনের মাধ্যমে দুর্নীতিবাজদের কঠোর শাস্তি প্রদান করে দুর্নীতি সম্পর্কে জনমনে ভীতির সঞ্চার করতে হবে।

(৮) নৈতিক শিক্ষা ও ধর্মীয় মূল্যবোধ বৃদ্ধির লক্ষে কাজ করতে হবে।

(৯) রাজনৈতিক অঙ্গণে দুর্নীতিবাজদের বয়কট করতে হবে। কোনো দলে যাতে দুর্নীতিবাজরা প্রবেশ করতে না পারে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

(১০) দুর্নীতি দমন কার্যক্রম যাতে কোনো বিশেষ মহলের চাপে বন্ধ বা ভিন্নপথে পরিচালিত না হয় সেদিকে সরকারকে সতর্ক থাকতে হবে।

(১১) ঘুষ দেয়া ও নেয়া সম-অপরাধী এবং উভয়ই দুর্নীতিবাজ হিসেবে চিহ্নিত হবে। আইন ও সমাজের দৃষ্টিতে উভয়কে দুর্নীতিবাজ হিসেবে গণ্য করে শাস্তি প্রদান বা সামাজিকভাবে বয়কট করার ব্যবস্থা করতে হবে।

(১২) দুর্নীতি বিরোধী সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়াকে সম্পৃক্ত করতে হবে।

(১৩) সরকারের সকল কাজে জনগণের সম্পৃক্ততার লক্ষে জবাবদিহিতামূলক কার্যক্রম চালু করতে হবে। এতে দুর্নীতি নির্মূল না হলেও আশানুরূপ হ্রাস পাবে।

সার-সংক্ষেপ

দুর্নীতি বাংলাদেশের অন্যতম জাতীয় সমস্যা। দুর্নীতির কারণে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। দুর্নীতি একদিকে আমাদের নৈতিক শক্তিকে খর্ব করছে, অনদিকে বেকারত্ব, দারিদ্র্য, সামাজিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে। দুর্নীতির কারণে আন্তর্জাতিক অঙ্গণে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি নষ্ট হচ্ছে। এতে বিদেশী বিনিয়োগ কমে যাচ্ছে। কেবল আইন করে দেশে দুর্নীতি দমন করা যাবে না। এর বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

(ক) শূন্যস্থান পূরণ করুন–

১। ঘুষ দেয়া ও নেয়া ---------- ।

২। দুর্নীতির বিরুদ্ধে---------- আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

৩। দুর্নীতির কারণে বিদেশে বাংলাদেশের---------- নষ্ট হচ্ছে।

৪। ---------- কোন কিছু করাকেই দুর্নীতি বলে।

৫। প্রশাসনিক ---------- না থাকলে দুর্নীতি বৃদ্ধি পায়।

(খ) রচনামূলক প্রশ্ন

১। দুর্নীতি বলতে কি বুঝায়? বাংলাদেশে দুর্নীতির কারণসমূহ আলোচনা করুন।

২। বাংলাদেশে দুর্নীতির কারণসহ দুর্নীতি দমনের উপায় বর্ণনা করুন।

(ক) উত্তরমালা

১। অপরাধ, ২। সামাজিক, ৩। ভাবমূর্তি, ৪। নীতিবর্জিত, ৫। জবাবদিহিতা

পাঠ-৬ : বাংলাদেশের কিশোর অপরাধের কারণ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- কিশোর অপরাধ বলতে কি বুঝায় তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বাংলাদেশে কিশোর অপরাধের কারণ বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

কিশোর অপরাধ

আধুনিক সমাজব্যবস্থার একটি ভয়াবহ সমস্যা হলো কিশোর অপরাধ। দ্রুত নগরায়ন ও শিল্পায়নের ফল হচ্ছে কিশোর অপরাধ, যার বিস্তার শুরু হয় শিল্প-বিপ্লবের পরবর্তী সময়ে। শিল্পায়ন ও নগরায়ন প্রক্রিয়ার প্রভাবে পারিবারিক কাঠামোর ধরন দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে, যা কিশোর অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধির সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করে। ব্যাপকহারে গ্রামীণ জনপদ হতে শহরের দিকে শিশু-কিশোরদের স্থানান্তর এবং বস্তিতে বসবাসের প্রভাবে কিশোর অপরাধ বৃদ্ধি পাচ্ছে। শহর ও বস্তির ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশ কিশোর অপরাধ প্রবণতার উর্বরক্ষেত্র। দারিদ্র্য পীড়িত বাংলাদেশের বহুমুখী সামাজিক সমস্যাগুলোর তালিকায় কিশোর অপরাধ হচ্ছে অন্যতম। প্রতিটি শিশু ভবিষ্যৎ জীবনের একটি বড় সম্ভাবনা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু সামাজিক প্রতিকূল পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিক চাপে সে সম্ভাবনা অকালে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। মোটকথা, কিশোর অপরাধ প্রবণতা দেশের সামগ্রিক কল্যাণের অন্যতম প্রতিবন্ধক। আধুনিক শিল্প সমাজের উপজাত হলো কিশোর অপরাধ।

কিশোর অপরাধের সংজ্ঞা

কিশোর অপরাধের সঠিক সংজ্ঞা নিরূপণ বেশ কষ্টসাধ্য। সাধারণভাবে বলা হয়ে থাকে কিশোর বয়সীদের দ্বারা সংগঠিত সামাজিক মূল্যবোধ এবং নিয়ম পদ্ধতির বরখেলাপমূলক কাজই কিশোর অপরাধ। কিশোর অপরাধ ধারণাটি একটি জটিল বিষয়। এর সংজ্ঞা প্রদান করতে গিয়ে বিভিন্ন অপরাধবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানী তাদের মতবাদ ব্যক্ত করেছেন। নিচে তাদের প্রদত্ত কয়েকটি সংজ্ঞা প্রদান করা হলো–

অপরাধ বিজ্ঞানী Bisller-এর মতে, 'কিশোর অপরাধ হলো প্রচলিত সমাজিক নিয়মকানুনের ওপর অপ্রাপ্তবয়স্ক কিশোরদের অবৈধ হস্তক্ষেপ।'

A. V. John-এর মতে, 'কিশোর অপরাধী হলো নির্দিষ্ট বয়ঃসীমার মধ্যে দেশে প্রচলিত আইন ভঙ্গকারী ও সামাজিক নিয়ম লঙ্ঘনকারী, যার চরিত্র সংশোধনের কিংবা পুনর্বাসনের জন্য কোনো বিশেষ কর্তৃপক্ষ বা বিচারকের সামনে হাজির করা হয়।

সমাজবিজ্ঞানী BURT-এর মতে, 'কোনো শিশুকে তখনই অপরাধী বলে মনে করতে হবে, যখন তার অপরাধ বা অসামাজিক কাজের প্রবণতার জন্য আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন হয়ে পড়ে।'

অপরাধ বিজ্ঞানী Cavan ও Ferdinand-এর মতে, 'Juvenile delinquency consists of misbehavior by children and adolescents that leads to referral to the juvenile court.' অপরাধ বিজ্ঞানী Shulman অপ্রাপ্তবয়স্ক জনগোষ্ঠীর ওপর পরিবার ও সমাজের নিয়ন্ত্রণহীনতাকে কিশোর অপরাধ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

সুতরাং বলা যায় যে, কিশোর অপরাধ হলো বিশেষ ধরনের অস্বাভাবিক বা সমাজবিরোধী আচরণ, যা আইন কর্তৃক নির্ধারিত বয়সসীমার নিচের কিশোর-কিশোরী দ্বারা হয়ে থাকে।

উপরিউক্ত সংজ্ঞাগুলো বিশ্লেষণ করে কিশোর অপরাধের পরবর্তী পৃষ্ঠার বৈশিষ্ট্যগুলো দৃশ্যমান হয়–

– কিশোরদের দ্বারা সংঘটিত অপরাধ ।

– পারিপার্শ্বিক ও সামাজিক সংগঠনগুলোর সাথে তাল মেলাতে না পেরে সমাজবিরোধী কাজে অংশগ্রহণ ।

– সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের পরিপন্থী আচরণে লিপ্ত হওয়া ।

বস্তুত কিশোর কর্তৃক অপরাধ আইন বিরোধী সব ধরনের অসামাজিক আচরণই কিশোর অপরাধ । যথাসময়ে তা সংশোধন করা না হলে, বয়ঃপ্রাপ্তির পর তা ক্রমাগত অপরাধ প্রবণতায় রূপ নিতে পারে ।

কিশোর অপরাধের প্রকৃতি

কিশোর অপরাধের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য বৈচিত্রে পরিপূর্ণ । কিশোর-কিশোরীরা পারিপার্শ্বিক অবস্থা দ্বারা অতি সহজে এবং স্বল্প সময়ে প্রভাবিত হয়ে উদ্দেশ্যহীনভাবে কৌতূহলবশত অথবা নিজেকে জনসম্মুখে প্রকাশ করার জন্য অপরাধ করে থাকে । আবেগের বশবর্তী হয়ে অপ্রাপ্তবয়স্করা চিন্তাভাবনা না করে অপরাধে জড়িয়ে পড়ে ।

বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে দারিদ্র্য, বেকারত্ব, মাদকাসক্তি, বস্তি, শিশুশ্রম প্রভৃতি বৈচিত্রময় সামাজিক সমস্যাগুলোতে কিশোর অপরাধ অপেক্ষাকৃত একটি নবতর সংযোজন । তবে নবতর সংযোজন হলেও এ সমস্যাটি ক্রমব্যাপ্তিশীল । যদিও গ্রামাঞ্চলের তুলনায় শহর এলাকাতেই সমস্যাটির ব্যাপকতা ও গভীরতা তথা প্রকোপ বেশি । সামগ্রিক দিক দিয়ে বাংলাদেশের কিশোর অপরাধীদের চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায় । এগুলো হলো–

- শহর এলাকার কিশোর অপরাধী;
- গ্রাম এলাকার কিশোর অপরাধী;
- উচ্চবিত্ত পরিবারের কিশোর অপরাধী;
- নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত পরিবারের কিশোর অপরাধী ।

উল্লিখিত চার শ্রেণীর কিশোর অপরাধীদের মাঝে যেসব অপরাধ প্রবণতা দেখা যায় তা মূলত সামাজিক মূল্যবোধের পরিপন্থী কর্মকাণ্ড । তবে, সাধারণত যেসব কিশোর অপরাধ সচরাচর দেখা যায় তা নিম্নরূপ :

- পিতামাতা ও শিক্ষকদের অবাধ্যতা ও তাদের অনুমতি ছাড়া গৃহত্যাগ ।
- বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন না করা ।
- স্কুলগামী মেয়েদের উত্যক্ত করা ।
- রাস্তায় বা লোকালয়ে চরম উচ্ছৃঙ্খলতা প্রদর্শন করা ।
- বাস বা ট্রেনে বিনা টিকিটে ভ্রমণ ।
- রাস্তাঘাটে মারপিট, ছিনতাই, হয়রানি করা ।
- স্কুল পালানো, পরীক্ষায় নকল করা ও বিনা কারণে হৈ-হুল্লা করা ।
- অসঙ্গত দৈহিক সম্পর্ক ।
- খেলার মাঠে মারামারি, অসামাজিক কথাবার্তা ইত্যাদি ।

কিশোর অপরাধের কারণ

কিশোর অপরাধের স্বরূপ ও প্রকৃতি যেমন বহুমুখী ও বিচিত্র, তেমনি কিশোর অপরাধ সংশ্লিষ্ট কারণ ও উপাদানসমূহও বহুমুখী । অর্থাৎ অপরাধের ধরনের প্রেক্ষিত বিবেচনা করলে দেখা যাবে যে, ভিন্ন ভিন্ন ধরনের অপরাধের জন্য ভিন্ন ভিন্ন কারণ বা উপাদানের প্রভাব রয়েছে । সমাজবিজ্ঞানী ও অপরাধ বিজ্ঞানীগণ তাই ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে কিশোর অপরাধের কারণ ব্যাখ্যা করেছেন ।

Bertrand Russell (বারট্র্যান্ড রাসেল)-এর মতে, 'বেশিরভাগ নিষ্ঠুরতার জন্ম হয় শৈশবকালীন নিপীড়ন থেকে, এর ফলে পরবর্তীতে সে কিশোর অপরাধী হয় ।'

Karl Marx এর মতে, 'কিশোর অপরাধসহ সকল অপরাধের মূল কারণ হচ্ছে অর্থনৈতিক প্রভাব ।'

Dr. Paul Chowduhry-তার 'A Handbook of Social Welfare' গ্রন্থে কিশোর অপরাধের বেশ কিছু সুনির্দিষ্ট কারণের কথা উল্লেখ করেছেন –

১. ভগ্ন পরিবার – যেখানে আবেগ, ভালোবাসা ও নিরাপত্তার অভাব রয়েছে।

২. যথাযথ চিত্তবিনোদনের অভাব।

৩. চরম দারিদ্র্য ও পিতামাতার অবহেলা।

৪. শিশুশ্রম ও শিশুকে জোরপূর্বক কাজে নিয়োগ দান।

৫. কর্মজীবী মা, বাসায় শিশুযত্নের অভাব।

৬. স্কুল, কর্মক্ষেত্র এবং পারিপার্শ্বিক অবাঞ্ছিত সঙ্গী।

৭. সিনেমা, অনাকাঙ্ক্ষিত সাহিত্য।

৮. বংশগত ও জৈবিক উপাদান।

সমাজবিজ্ঞানীরা মত পোষণ করেন যে, বাংলাদেশের গ্রামীণ এলাকার অপরাধের মূল কারণ দারিদ্র্য আর শহর এলাকার অপরাধের কারণ কলাকৌশলগত আধুনিকতা। নিম্নে সামগ্রিকভাবে কিশোর অপরাধের সাধারণ কারণগুলো বর্ণনা করা হলো :

১। **বংশগত কারণ :** বংশগত কারণ সাধারণ অপরাধের পাশাপাশি কিশোর অপরাধেরও অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ। সাধারণত দেখা যায় যে, কোনো পরিবারের পিতা বা মাতা অথবা পিতা-মাতা উভয়ই যদি অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত থাকে তবে ঐ পরিবারের কিশোর সন্তানদের মাঝেও এক ধরনের অপরাধ প্রবণতা গড়ে ওঠে।

২। **জৈবিক কারণ :** ত্রুটিপূর্ণ দৈহিক আকার ও গঠন, শৈশবে স্নায়ুতন্ত্রের অসামঞ্জস্যতা প্রভৃতি বিষয়গুলো শিশুদের মধ্যে অস্বাভাবিক আচরণ তৈরি করে। সমবয়সী সঙ্গীদের অপেক্ষা কোনো কিশোর যদি অধিক লম্বা বা খাঁটো কিংবা অন্য কোনো শারীরিক খুঁত সম্পন্ন হয় তবে তার মাঝে এক ধরনের হীনমন্যতা দেখা দিতে পারে, যা থেকে অপরাধমূলক আচরণ সৃষ্টি হয়।

৩। **ভৌগোলিক কারণ** : বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকার ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য ও ঋতুচক্রের সাথে অপরাধ প্রবণতার বেশ গভীর সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়। শহরের ঘনবসতি এলাকায় শিশু-কিশোররা অপরাধ করে সহজেই পালিয়ে যেতে পারে। আবার পাহাড়ি এলাকায় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর উপস্থিতি কম থাকে বলে অপরাধ প্রবণতা বেশি।

৪। **অর্থনৈতিক কারণ** : দারিদ্র্য, আর্থিক অসচ্ছলতা বা সম্পদের অপ্রতুলতা প্রভৃতি বিষয়গুলো বাংলাদেশের প্রায় সকল সামাজিক সমস্যার সাথেই গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট যা থেকে কিশোর অপরাধও ব্যতিক্রম নয়। সাধারণ অথবা পারিবারিক দারিদ্র্যের পাশাপাশি বর্তমানে কিশোর বয়সীদের এক উল্লেখযোগ্য অংশ তাদের নেশাদ্রব্যের জন্য অর্থের যোগাড় করতে ছিনতাই, চুরি, ঘরের জিনিস বিক্রয়, অপহরণ, মুক্তিপণ আদায় প্রভৃতি ধরনের কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িয়ে পড়েছে।

৫। **পরিবেশের প্রভাব** : শিশু-কিশোররা যে পরিবেশে বসবাস করে সেই পরিবেশও অনেকক্ষেত্রে তাদের অপরাধী হয়ে ওঠার পিছনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। খারাপ পরিবেশের প্রভাবে শিশু-কিশোররা অসামাজিক, অবৈধ ও অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড প্রত্যক্ষ করে এক সময় নিজেরাই অপরাধের সাথে জড়িয়ে পড়ে।

৬। **পারিবারিক পরিবেশ** : সাধারণত দেখা যায় যেসব পরিবারের পারিবারিক সদস্যদের মাঝে সমঝোতাপূর্ণ সম্পর্ক বজায় থাকে না সেসব পরিবারের ছেলেমেয়েদের মধ্যে অপরাধ প্রবণতার হার স্বাভাবিক ও সুন্দর সম্পর্ক বজায় আছে এমন পরিবারের ছেলেমেয়েদের তুলনায় বেশি। এক্ষেত্রে পিতামাতার দাম্পত্ত কলহ,

বিবাহবিচ্ছেদ, সন্তানদের অতিরিক্ত শাসন অথবা স্বাধীনতা, সন্তানদের প্রতি অসম দৃষ্টিভঙ্গি, চিত্তবিনোদনের অভাব প্রভৃতি কারণেও ছেলেমেয়েদের মধ্যে অপরাধ প্রবণতা সৃষ্টি হতে পারে ।

৭। **মনস্তাত্ত্বিক কারণ :** Bowely তার The Nature of Development of the Children' গ্রন্থে বলেছেন 'শিশুমনে মৌলিক স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষাগুলো যখন সহজে পরিতৃপ্তির পথ পায় না, তখন অস্বাভাবিক পথে সে তৃপ্তি পাওয়ার আশা করে ।' মূলত পিতা-মাতা কর্তৃক স্নেহ, ভালোবাসার অভাব, অতিরিক্ত শাসন, নির্যাতন, অতিরিক্ত আদায়, নিরাপত্তাবোধের অভাব প্রভৃতি বিষয়গুলো এবং এরই সাথে সাথে মানসিক হতাশা, বঞ্চনা, ব্যর্থতা, হীনমন্যতা, নিরাশা, ঘৃণা, প্রতিশোধ স্পৃহা প্রভৃতি বিষয়গুলো কিশোরদের অপরাধ প্রবণ করে তোলে ।

৮। **রাজনৈতিক কারণ :** বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ক্রমবর্ধনশীল কিশোর অপরাধ সমস্যার গুরুত্বপূর্ণ একটি উপাদান । রাজনৈতিক দলগুলো তাদের সংকীর্ণ স্বার্থ উদ্ধারে শিশু-কিশোর অপরাধের সাথে নিজেদের জড়িয়ে ফেলে ।

৯। **প্রশাসনিক কারণ :** কিশোর অপরাধীদের সুষ্ঠু বিচারের ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রতা, সংশোধন ব্যবস্থার অব্যবস্থাপনা, বয়স্ক অপরাধীদের সাথে একসাথে কারাবাস প্রভৃতি কারণে কিশোর অপরাধীরা আরও বেশি অপরাধপ্রবণ হয়ে পড়ে ।

বাংলাদেশে কিশোর অপরাধের উপরিউক্ত কারণ ছাড়াও আরো যেসব কারণ রয়েছে তার মধ্যে রয়েছে –

- সামাজিক বন্ধন লোপ ।
- সুষ্ঠু সামাজিকীকরণের অভাব ।
- সামাজিক, ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার অভাব ।
- সামাজিক অনাচার ।
- দুর্নীতি ।
- অনুকরণপ্রিয়তা ।
- অপসংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ।
- শিল্পায়ন ও নগরায়ন ।
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সুষ্ঠু পরিবেশের অভাব ।
- ধনী-দরিদ্রের অসম জীবনযাপন ।
- সুষ্ঠু বিনোদনের অভাব ।
- আইনের অপপ্রয়োগ ।

সারসংক্ষেপ

আধুনিকতার নেতিবাচক ফল হচ্ছে কিশোর অপরাধ । কিশোর অপরাধ প্রবণতা দেশের সামগ্রিক কল্যাণের অন্যতম প্রতিবন্ধক । পারিবারিক কলহ, ত্রুটিপূর্ণ সামাজিকীকরণ, সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, দারিদ্র্য, সঙ্গদোষ, সামাজিক বিশৃঙ্খলা, যথাযথ চিত্তবিনোদনের অভাব, শিশুশ্রম প্রভৃতি কিশোর অপরাধের জন্য দায়ী ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

(ক) শূন্যস্থান পূরণ করুন

১। কিশোর অপরাধ আধুনিকতার —— ফল।

২। কিশোরদের সামাজিক —— পরিপন্থী কাজ হলো কিশোর অপরাধ।

৩। —— বসবাসের প্রভাব কিশোর অপরাধ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৪। শিল্পায়ন ও —— কিশোর অপরাধের দুটি বড় কারণ।

৫। গ্রামীণ এলাকার অপরাধের মূল কারণ ——।

(খ) রচনামূলক প্রশ্ন

১। বাংলাদেশে কিশোর অপরাধের কারণগুলো লিখুন।

২। বাংলাদেশে কিশোর অপরাধের প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করুন।

(ক) উত্তরমালা

১। নেতিবাচক, ২। শৃঙ্খলা, ৩। বস্তিতে, ৪। নগরায়ন, ৫। দারিদ্র্য।

পাঠ-৭ : কিশোর অপরাধ দূরীকরণের উপায়

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- বাংলাদেশে কিশোর অপরাধ দূরীকরণের উপায়সমূহ আলোচনা করতে পারবেন।
- বাংলাদেশে কিশোর অপরাধ সংশোধনমূলক কার্যক্রম সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

ভূমিকা

বর্তমানে কিশোর অপরাধ শুধু সনাতনী অপরাধের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং বহু নতুন ধরনের কর্মে এর শাখা-প্রশাখা বিস্তার লাভ করেছে। সমাজবিরোধী কাজের সাথে কিশোর অপরাধের বর্তমান পরিস্থিতি অত্যন্ত উদ্বেগজনক। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করা যায় যে, এ সমস্যার জন্য কিশোররা নিজেরা দায়ী নয়। এজন্য দায়ী পরিবর্তিত সামজিক প্রেক্ষাপট, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা। এর ফলে কিশোরদের মধ্যে অপরাধ প্রবণতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। কিন্তু এখনই এ অপরাধ মোকাবিলায় যথাযথ ব্যবস্থা না নিলে অচিরেই তা ভয়াবহ রূপ ধারণ করবে। কিশোর অপরাধ মোকাবিলায় নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনায় নেয়া যেতে পারে–

কিশোর অপরাধ দূরীকরণের উপায়

১. পারিবারিক পরিবেশকে শিশু-কিশোরদের সুষ্ঠু ব্যক্তিত্ব বিকাশের উপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে।

২. পিতা-মাতাকে শিশু-কিশোরদের মৌলিক চাহিদার প্রতি নজর দিতে হবে।

৩. দেশের সকল অশ্লীল বই, ছায়াছবি, ডিস এন্টিনা ও ভিসিআর-এ ছবি প্রদর্শন কঠোর আইনের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

৪. শিশুদের নির্মল আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করতে হবে।

৫. সঙ্গদোষে যাতে শিশুরা খারাপ হতে না পারে, সেই দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

৬. বিদ্যালয়গুলোতে নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

৭. দরিদ্র কিশোরদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

৮. কিশোরদের চরিত্র গঠনের জন্য শিক্ষক ও অভিভাবকদের আদর্শ ভূমিকা পালন করতে হবে।

৯. শিশু শ্রমের ব্যবহার ও বিক্রি বন্ধ করতে হবে, সে স্থলে তাদের উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

১০. জনবসতি যেন নোংরা ও ঘনবসতিতে পূর্ণ না হয় সেই দিকে লক্ষ্য রেখে উপযুক্ত পরিকল্পনা ভিত্তিক আবাসিক পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

১১. শিশুরা যাতে নিত্য নতুন পরিবেশে খাপ খাইয়ে চলতে পারে সেই দিকে অভিভাবকদের মনোযোগী হতে হবে। ঘন ঘন স্থান পরিবর্তনের ফলে কিশোররা সমস্যার সম্মুখীন হয়।

১২. অপরাধীদের বিচারের জন্য যে শাস্তিমূলক ও সংশোধনমূলক ব্যবস্থা রয়েছে, প্রয়োজনিয় তার পরিবর্তন এনে বিচার ব্যবস্থার উন্নতি করতে হবে।

১৩. অপরাধীদের গ্রেফতারের জন্য পুলিশ ব্যবস্থাকে ত্রুটিমুক্ত করা এবং বিনা অপরাধে ও বিনা বিচারে যাতে কেউ দীর্ঘদিন জেলখানায় না থাকে সেই দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

১৪. পরিত্যক্ত, অবহেলিত শিশু-কিশোরদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা।

বাংলাদেশে কিশোর অপরাধ সংশোধনমূলক কার্যক্রম

১৯৪৯ সালে ঢাকার অদূরে মুড়াপাড়া নামক স্থানে একটি ÔBrostal School' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এদেশে কিশোর অপরাধ সংশোধনমূলক কার্যক্রমের যাত্রা শুরু হয়। বর্তমানে দেশে কিশোর অপরাধীদের সংশোধনের জন্য যেসব কর্মকাণ্ড ও কার্যক্রম চালু রয়েছে সেগুলোর ওপর নিচে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো–

১। **কিশোর আদালত :** ১৯৭৪ সালে শিশু আইনের ৩ নং ধারা অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত আদালতই কিশোর আদালত। এ আদালত কিশোর অপরাধীদের বিচারের জন্য গঠিত এক বিশেষ আদালত যেটি একজন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে গঠিত। এ আদালতে ঘরোয়া পরিবেশে কিশোর অপরাধীদের সংশোধনের চেষ্টা করা হয়।

২। **কিশোর সংশোধনী প্রতিষ্ঠান :** দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে দেশব্যাপী অপরাধপ্রবণ শিশু-কিশোরের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় তাদের আচরণ সংশোধন, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের লক্ষে ১৯৭৪ সালের শিশু আইনের অধীনে টঙ্গীতে 'কিশোর অপরাধ সংশোধনী প্রতিষ্ঠান' স্থাপিত হয় এবং ১৯৭৮ সাল থেকে প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম শুরু হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে ৩টি কিশোর বিকাশ কেন্দ্র রয়েছে- গাজীপুর, টঙ্গী ও যশোরে। শাস্তির পরিবর্তে সংশোধনের ওপর গুরুত্বারোপ করে আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে কিশোরদের সংশোধনের ব্যবস্থা করাই এসব প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য।

৩। **কিশোর হাজত :** অপরাধের প্রকৃত কারণসমূহ নির্ণয়ের জন্য কিশোর অপরাধীদের বিচারের পূর্বে বা বিচারকালীন সময়ে কিংবা বিচারের পর সংশোধনের জন্য নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানে প্রেরণের পূর্ব পর্যন্ত তাদেরকে যে আলাদা ব্যবস্থায় রাখা হয় সেটিই হলো কিশোর হাজত।

৪। **প্রশিক্ষণ কেন্দ্র :** অপরাধী কিশোর-কিশোরীদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান ও সংশোধনী প্রতিষ্ঠানগুলোর গুরুত্বপূর্ণ কাজ। সাধারণ শিক্ষার আওতায় এসএসসি পর্যন্ত লেখাপড়ার ব্যবস্থা রয়েছে। তাছাড়া প্রতিষ্ঠানে অবস্থানকারী কিশোরদের শারীরিক গঠন, বুদ্ধিমত্তা ও তাদের মননশীলতা অনুযায়ী বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে যাতে করে তারা ভবিষ্যতে সমাজে পুনর্বাসিত ও স্বনির্ভর হয়ে উঠতে পারে। বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মধ্যে রয়েছে– দর্জি বিদ্যা, কার্পেন্টারি, ওয়েল্ডিং, অটোমোবাইল প্রভৃতি। এগুলো ছাড়াও এ প্রতিষ্ঠানগুলোতে নিয়মিত শরীর চর্চা, খেলাধুলা ও চিত্তবিনোদনের মাধ্যমে মানসিক উৎকর্ষ সাধনের ব্যবস্থা রয়েছে।

৫। **প্রবেশন :** প্রবেশন কিশোর অপরাধীদের সংশোধনের এক বিশেষ ব্যবস্থা। এটা মূলত এক পরীক্ষাকাল। আদালতে দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তির চূড়ান্ত শাস্তি বা দণ্ড স্থগিত রেখে কতিপয় শর্তসাপেক্ষে প্রবেশন অফিসারের তত্ত্বাবধানে সমাজে স্বাভাবিকভাবে বসবাসের সুযোগ প্রদানে এক বিশেষ ব্যবস্থাই হলো প্রবেশন।

প্রকৃতপক্ষে, অপরাধীর একান্ত আপনজন হয়ে তথা তার ঘনিষ্ঠ হয়ে অপরাধের মূল কারণসমূহ নির্ণয় ও সে অনুযায়ী সংশোধনের পদক্ষেপ গ্রহণ এবং অপরাধীকে প্রথম বারের মতো আত্মশুদ্ধির একটা সুযোগ প্রদান করাই প্রবেশনের মূল লক্ষ্য।

৭। **প্যারোল :** প্রবেশনের ন্যায় প্যারোলও অপরাধী ও কিশোর অপরাধীদের এক নিরীক্ষা কাল। তবে প্রবেশনে যেখানে শাস্তি বা দণ্ড স্থগিত রেখে এ নিরীক্ষা পর্যায়ে আনা হয়, সেক্ষেত্রে প্যারোলের বেলায় কিছুদিন শাস্তি ভোগ করার পর দণ্ডের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই অপরাধীকে শর্তসাপেক্ষে মুক্তি দিয়ে একজন তত্ত্বাবধায়কের অধীনে স্বাভাবিক জীবন যাপনের সুযোগ প্রদান করা হয়। ভবিষ্যতে আর অপরাধ করবে না, বিনা অনুমতিতে বাসস্থান পরিবর্তন করবে না, প্যারোল অফিসারের নিকট নিয়মিত দেখা করবে এরূপ শর্তে অপরাধীকে প্যারোলে মুক্তি দিয়ে সংশোধনের সুযোগ প্রদান করা হয়।

সারসংক্ষেপ

কিশোর অপরাত্বের বর্তমান পরিস্থিতি অত্যন্ত উদ্বেগজনক। শাস্তির পরিবর্তে সংশোধনের ওপর গুরুত্বারোপ করে কিশোর অপরাধীদের সমাজের মূল স্রোতে মিশতে দিতে হবে। কিশোর অপরাধ প্রবণতা রোধের ক্ষেত্রে আইন প্রণয়ন কোন সমাধান নয়। তাদেরকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে, ভালবাসা-আদর-মমতা দিয়ে লালন-পালন করতে হবে। সেই সঙ্গে কিশোরদের জন্য সুষ্ঠু মনোরম চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা করতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

(ক) নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

(খ) সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বাংলা দেশে কয়টি কিশোর বিকাশকেন্দ্র রয়েছে

(ক) ২টি (খ) ৩টি (গ) ৪টি (ঘ) ৫টি।

২। শিশু আইন প্রণয়ন করা হয় –

(ক) ১৯৭৪ সালে (খ) ১৯৮৪ সালে (গ) ১৯৯৪ সালে (ঘ) ১৯৭৮ সালে

(খ) রচনামূলক প্রশ্ন

১। কিশোর অপরাধ নিয়ন্ত্রণের উপায়সমূহ আলোচনা করুন।

২। বাংলাদেশ কিশোর অপরাধ সংশোধনমূলক কার্যক্রম বর্ণনা করুন।

(ক) উত্তরমালা

১। খ, ২। ক

ইউনিট
২২

দারিদ্র্য ও কৃষি সমস্যা

ভূমিকা

দারিদ্র্য সমগ্র মানবজাতির জন্যই একটি ভয়াবহ অভিশাপ। বাংলাদেশের অসংখ্য অর্থ-সামাজিক সমস্যার মূলে রয়েছে দারিদ্র্য। দেশের সার্বিক উন্নয়নে দারিদ্র্য বিমোচনের কোন বিকল্প নেই। তবে দারিদ্র্য দূর করা সহজ নয়। কেননা একটি দুষ্টচক্রের মতো দারিদ্র্য গণ-সমাজে ঘুরপাক খায়। বাংলাদেশে দারিদ্র্য বিমোচন সন্তোষজনক নয়। এ ইউনিটে নিম্নোক্ত পাঠগুলো আলোচনা করা হলো:

পাঠ-১ : বাংলাদেশে দারিদ্র্যের কারণ।
পাঠ-২ : দারিদ্র্য নিরসনের উপায়ে।
পাঠ-৩ : বাংলাদেশের কৃষি সমস্যা।
পাঠ-৪ : কৃষির বহুমুখীকরণ ও সরকারি নীতি।
পাঠ-৫ : খাদ্যাভাব ও পুষ্টিহীনতা।
পাঠ-৬ : খাদ্যাভাব ও পুষ্টিহীনতা দূর করার উপায়।

পাঠ-১ : বাংলাদেশে দারিদ্র্যের কারণ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- বাংলাদেশের দারিদ্র্যের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবেন ।
- বাংলাদেশের দারিদ্র্য পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন ।

বাংলাদেশ দারিদ্র্যের কারণ

বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম দরিদ্র দেশ । এখানে সম্পদের স্বল্পতা রয়েছে আর এটিই দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ । দারিদ্র্যের কারণ নিয়ে অর্থনীতিবিদ, গবেষক পরিকল্পনাবিদদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে । নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ ড. অমর্ত্য সেনের মতে, মানবসমাজে দারিদ্র্য ও অনুন্নয়নের মূল কারণ সামাজিক বৈষম্য । অর্থনীতিবিদ সেলিম জাহানের মতে, আয়ের অসম বণ্টন দারিদ্র্যের কারণ । আবার বাংলাদেশের পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় নিম্ন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, আয়ের অসম বণ্টন, উৎপাদনের অসম বণ্টন, বেকারত্ব ও অর্ধ-বেকারত্ব, জনসংখ্যা বৃদ্ধির উচ্চহার, মানবসম্পদ উন্নয়নের নিম্নহার, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদিকে দারিদ্র্যের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে । বাংলাদেশে দারিদ্র্যের প্রধান কারণগুলো নিম্নে আলোচনা করা হলো :

১. ভূমির অপ্রতুলতা

বাংলাদেশে মাত্র ১,৪৭,৫৭০ বর্গ মিলোমিটার ভূখণ্ডে প্রায় ১৬ কোটি লোকের বাস । ফলে স্বাভাবিক কারণেই মাথাপিছু জমির পরিমাণ কম । তদুপরি এ স্বল্প পরিমাণ জমিও সমভাবে বণ্টিত নয় । দেশের অধিকাংশ জমির মালিকানা স্বল্প সংখ্যক জোতদারের হাতে রয়েছে । এতে করে প্রকৃত কৃষকগণ কৃষি জমি থেকে বঞ্চিত হয়ে কর্মহীন ও আয়হীন অবস্থায় দিন দিন দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হচ্ছে ।

২. দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি

এটিও বাংলাদেশের দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ । স্বাধীনতার পর মাত্র ৪০ বছর ব্যবধানে জনসংখ্যা দ্বিগুণের চেয়েও বেশি হয়েছে । কিন্তু কৃষিজমি একটুকুও বাড়েনি, বরং কমেছে । জমি প্রতিবছরই খণ্ড-বিখণ্ড হচ্ছে । মাথাপিছু জমির পরিমাণ কমছে, উৎপাদন কমছে । সৃষ্টি হচ্ছে নতুন নতুন দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ।

৩. নিম্ন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির নিম্নহার দারিদ্র্যের আর একটি কারণ । নব্বইয়ের দশকে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ছিল ৩.৫ শতাংশ । ২০০৭-২০০৮ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধির হার ৬.২১ শতাংশ । জনসংখ্যার প্রবৃদ্ধির তুলনায় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি আশানুরূপ হয়নি । এতে দারিদ্র্য বেড়েছে ।

৪. সম্পদের স্বল্পতা

সম্পদের স্বল্পতা বাংলাদেশে দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ । জমি থেকে শুরু করে প্রাকৃতিক সম্পদ কোনোটাই আমাদের অফুরন্ত নয় । রংপুরে সামান্য কিছু কয়লা, সিলেটের শাহজীর বাজারের কিছু চিনামাটি ও কাঁচাবালি, আর অন্যান্য স্থানে রয়েছে কিছু চুনাপাথর । এই হচ্ছে আমাদের প্রধান প্রাকৃতিক সম্পদ । বনজ সম্পদ অত্যন্ত কম । সম্পদের স্বল্পতার কারণ আমাদের দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ ।

৫. উৎপাদন উপকরণ ও সম্পদের উপর প্রবেশাধিকার না থাকা

আমাদের দেশের অধিকাংশ জনগণের আর্থিক অবস্থা খারাপ । কারণ দেশের মাথাপিছু বার্ষিক আয় মাত্র ৫৯৯ মার্কিন ডলার । ফলে উৎপাদনের জন্য উপকরণ সংগ্রহ করার সামর্থ্য তাদের নেই । এছাড়া তাদের অনেকের বাড়ি-ঘরসহ তেমন কোনো সম্পদ নেই । ফলে তারা উৎপাদন প্রক্রিয়ায় কার্যকরভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে না । এতে দরিদ্র ব্যক্তি আরো দরিদ্র হচ্ছে এবং বছর বছর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সৃষ্টি হচ্ছে ।

৬. বেকারত্ব

দেশের উৎপাদনক্ষম জনসংখ্যার এক বিরাট অংশ বেকার। তারা কোনো কাজ পাচ্ছে না। ফলে কর্মহীন অবস্থায় তাদের মূল্যবান সময় নষ্ট হচ্ছে। দেশ বঞ্চিত হচ্ছে তাদের সেবা থেকে। এতে মোট উৎপাদন বাড়ছে না, বরং মাথাপিছু উৎপাদন হ্রাস পাচ্ছে। ফলে তারা ধীরে ধীরে দারিদ্র্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

৭. ঔপনিবেশিকতা ও নব্য-ঔপনিবেশিকতা

ব্রিটিশ আমলের দীর্ঘ দু'শ বছরের ঔপনিবেশিক শাসন এবং পাকিস্তান আমলের অর্থনৈতিক বৈষম্যের কারণে এ দেশের অর্থনীতি শক্তিশালী হয়নি। ঔপনিবেশিক শাসকদের উদাসীনতা ও বৈষম্য নীতির কারণে গড়ে ওঠেনি কোনো কল-কারখানা। ফলে দেশের অর্থনীতি সামনের দিকে এগোনোর পরিবর্তে বরং পিছিয়ে পড়েছে। এ প্রেক্ষিতে সৃষ্টি হয়েছে দারিদ্র্য।

৮. সম্পদের অসম বণ্টন

বাংলাদেশে সম্পদের পরিমাণ এমনিতেই কম। তদুপরি এ সম্পদের বিরাট অংশ অল্প কিছু লোকের হাতে আটকা পড়ে আছে। এর ফলে কিছুসংখ্যক লোক যেমন সম্পদের পাহাড় গড়ে ভোগ বিলাসে মত্ত, তেমনি জনগোষ্ঠীর অন্যরা সম্পদের অভাবে মানবেতর জীবনযাপন করতে বাধ্য হচ্ছে। বাংলাদেশে বর্তমানে কোটিপতির সংখ্যা বাইশ হাজার। এ থেকেই দেশে সম্পদের অসম বণ্টনের এক ভয়াবহ চিত্র ফুটে ওঠে। আর সম্পদের অসম বণ্টন জন্ম দিচ্ছে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর।

৯. কর্মসংস্থানের অভাব

অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০৮ অনুযায়ী ২০০৭-২০০৮ অর্থবছরে দেশে কর্মক্ষম জনসংখ্যা প্রায় ৪.৯৫ কোটি। এ বিশাল কর্মীবাহিনীর প্রায় ৪০ ভাগ হচ্ছে বেকার। অর্থাৎ এদের জন্য কোন কাজ নেই। অন্য এক হিসাব মতে, দেশে বর্তমানে উচ্চ শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা ৮০ লক্ষাধিক। ফলে কর্মসংস্থানের অভাবে তারা তাদের শ্রম সম্পদ হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়ছে। যার ফলাফল হচ্ছে নতুন দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সৃষ্টি।

১০. প্রাকৃতিক দুর্যোগ

প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন নদী ভাঙ্গন, বন্যা, ঝড়, সাইক্লোন, টর্নেডো, খরা ইত্যাদি আমাদের দেশে একটি নিয়মিত ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। নদী ভাঙ্গনের ফলে বিভিন্ন নদী তীরবর্তী লোকেরা তাদের চাষযোগ্য জমি, বসতবাড়ি ইত্যাদি হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে পথে নামতে বাধ্য হচ্ছে। আবার সাইক্লোন, টর্নেডোর মতো দুর্যোগগুলো জনগণের জানমালের অপূরণীয় ক্ষতি করছে। খরার ফলে ফসল হারিয়ে প্রান্তিক কৃষকেরা দিশেহারা হয়ে পড়ছে। আর এসব দুর্যোগের চূড়ান্ত পরিণতিতে সৃষ্টি হচ্ছে দারিদ্র্য।

১১. শিক্ষার অভাব

দেশের অধিকাংশ মানুষ এখনো নিরক্ষর। বর্তমানে শিক্ষার হার প্রায় ৬৫ ভাগ বলা হলেও এদের একটা বড় অংশ কেবল নাম স্বাক্ষর করতে পারে। শিক্ষাজ্ঞান না থাকায় এরা কায়িক শ্রম দেয়া ছাড়া অন্য কোন কাজ পাচ্ছে না। ফলে এরা অধিকাংশই কৃষি শ্রমিক। বাংলাদেশের স্বল্প পরিমাণ কৃষি জমি এত বিরাট জনসংখ্যার কাজের যোগান দিতে অক্ষম। ফলশ্রুতিতে এরা কেউ আংশিক বেকার, কেউবা পুরোপুরি বেকার। কর্মসংস্থান না হওয়ায় দেশের জনগোষ্ঠী দারিদ্র্যে নিপাতিত হয়।

১২. দক্ষতার অভাব

বর্তমান পৃথিবীতে দক্ষতা ব্যতীত কোনো কাজেই চাহিদা নেই। হোক সেটি কল-কারখানা, অফিস-আদালত বা কৃষি খামার। কর্মদক্ষতার অভাবে অনেক শিক্ষিত যুবকও কাজ পাচ্ছে না। আর যারা কাজ পাচ্ছে তারা উৎপাদন কার্যে আশানুরূপ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হচ্ছে না। তাছাড়া দক্ষ লোক না থাকায় সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা ও দারিদ্র্য বিমোচনের মতো কর্মসূচির সফল বাস্তবায়ন সম্ভব হয় না। ফলে দেখা যাচ্ছে দক্ষতার অভাবও আমাদের দারিদ্র্যের জন্য অনেকখানি দায়ী।

১৩. অপুষ্টি

অপুষ্টি বাংলাদেশের দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ। বিশ্বব্যাংকের এক তথ্যানুযায়ী বর্তমানে দেশের দশজন শিশুর মধ্যে সাতজনই অপুষ্টির শিকার। এদের অর্ধেকের বৃদ্ধি অস্বাভাবিক। দুঃখজনক হলেও সত্য যে এর ফলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের দৈহিক ও মানসিক গঠন ব্যাহত হচ্ছে, যা কোনোক্রমেই একটি উন্নত জাতি গঠনের সহায়ক

নয়। এর ফলে জনগোষ্ঠীর এক বিশাল অংশ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সঠিক ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হচ্ছে। অর্থাৎ দারিদ্র্যের কারণে অপুষ্টি, আবার অপুষ্টির কারণে দারিদ্র্য সৃষ্টি হচ্ছে।

১৪. প্রযুক্তির নিম্ন ব্যবহার

বর্তমান বিশ্বকে শাসন করছে প্রযুক্তি। তথ্যপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে ইতোমধ্যেই বিপ্লব ঘটে গেছে। কিন্তু আমরা প্রযুক্তিকে আমাদের দরিদ্র অবস্থা উন্নয়নে কাজে লাগাতে পারিনি। প্রযুক্তি ব্যবহারে আমরা অনেক পিছিয়ে রয়েছি। অথবা প্রযুক্তি ব্যবহারে আমাদের অনীহা। যেহেতু আমাদের জমির পরিমাণ নির্দিষ্ট এবং লোকসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে প্রতি বছর এর পরিমাণ ধীরে ধীরে হ্রাস পাচ্ছে, তাই আধুনিক প্রযুক্তির সর্বাত্মক ব্যবহার আমাদের জন্য অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে।

১৫. নিরাপত্তার অভাব তথা আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি

নিরাপত্তার অভাবে তথা আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির কারণে অনেককে নিজস্ব ভিটে-মাটি ছেড়ে যেতে হচ্ছে। অথবা জোর করে ক্ষমতাশালীরা দখল করে নিচ্ছে। আবার অনেক সময় জীবনের নিরাপত্তার অভাবে এলাকা ছাড়তে হচ্ছে। তাছাড়া আইন-শৃঙ্খলা অবনতির কারণে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে শিল্প-কারখানা গড়ে না ওঠায় কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়নি। ফলে জনসংখ্যার একটি অংশ বাড়ি-ঘর বিক্রি করে অন্যত্র অভিবাসন করছে কাজের আশায়। এভাবে একটা অংশ জমি হারিয়ে দরিদ্র হয়ে পড়ছে।

১৬. নারী উন্নয়ন

দেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক হচ্ছে নারী। নারীদের জন্য সরকারের সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত না হওয়ায় তারা অনেকটা কর্মহীন হয়ে আছে। তাই নারী উৎপাদনকর্মে সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ না পাওয়ায় পরিবারের প্রয়োজনীয় আয় বাড়ছে না। ফলে পরিবারের ভরণপোষণ তথা জীবিকা নির্বাহ কঠিন হয়ে পড়েছে। এভাবে এক সময় তারা দারিদ্র্যের করাল গ্রাসে হারিয়ে যাচ্ছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

(ক) শূন্যস্থান পূরণ করুন

১। বাংলাদেশে দারিদ্র্যের হার---------- ভাগ।

২। মানবসমাজে দারিদ্র্যের মূল করণ---------- বৈষম্য।

৩। প্রতিবছরেই কৃষিজাত---------- হচ্ছে।

৪। ---------- স্বল্পতা বাংলাদেশে দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ।

(খ) রচনামূলক প্রশ্ন

(ক) বাংলাদেশে দারিদ্র্যের কারণসমূহ আলোচনা কারুন।

(ক) উত্তরমালা

১। ৪০, ২। সামাজিক, ৩। খণ্ডিত, ৪। সম্পদ।

পাঠ-২ : দারিদ্র্য নিরসনের উপায়

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- বাংলাদেশে দারিদ্র্য নিরসনের উপায় সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।
- কিভাবে দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

দারিদ্র্য একটি বহুমাত্রিক ও জটিল সমস্যা। এর আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক রয়েছে। তাই দারিদ্র্য-বিমোচনে সামগ্রিকভাবে কাজ করতে হবে। দারিদ্র্য বিমোচনের কোন তাৎক্ষণিক সমাধান নেই। মানব সমাজেই এর উদ্ভব। তাই সমগ্র মানব সমাজকে দারিদ্র্য বিমোচনে আন্তরিক হতে হবে। এক্ষেত্রে সরকারি বেসরকারি উভয় প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব রয়েছে। নিম্নে দারিদ্র্য বিমোচনের উপায় সমূহ ব্যাখ্যা করা হলো।

১। শিক্ষার প্রসার : দারিদ্র্য বিমোচনের সঙ্গে শিক্ষার প্রসারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। অন্যকথায়, দারিদ্র্যের সঙ্গে নিরক্ষরতার সম্পর্ক রয়েছে। দারিদ্র্য জনগোষ্ঠীর প্রায় সবাই নিরক্ষর কিংবা স্বল্প শিক্ষিত। একজন শিক্ষিত ব্যক্তি অশিক্ষিত ব্যক্তি অপেক্ষা অনেক সচেতন। শিক্ষিত ব্যক্তি স্বাবলম্বী হতে পারেন অল্প সময়ে। কাজেই দারিদ্র্য বিমোচনে শিক্ষাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে।

২। **কৃষি উন্নয়ন :** বাংলাদেশের এখনও প্রায় ৭০ ভাগ মানুষ কৃষির ওপর নির্ভরশীল। জাতীয় আয়ের প্রায় ২৯ ভাগ আসে কৃষি থেকে। কৃষিনির্ভর জনগোষ্ঠী মূলত গ্রামে বাস করে। আবার গ্রামেই দারিদ্র্যের হার শহরের তুলনায় বেশি। বিপুল জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক উন্নয়ন নির্ভর করে কৃষি উৎপাদনের ওপর। কাজেই কৃষির উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামীণ সমাজ তথা বাংলাদেশের দারিদ্র্যের চিত্র পাল্টে দেয়া সম্ভব।

৩। **অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি :** ১৯৮০ থেকে' ১৯৯০ পর্যন্ত বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গড় ছিল ১.৫ শতাংশ যা ১৯৯০-২০০০ দশকে বৃদ্ধি পেয়ে ৩ শতাংশের বেশি হয়েছে। যদিও বিশ্বের নিম্ন আয়ের দেশগুলোর তুলনায় বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি তুলনামূলকভাবে ভালো। কিন্তু তা দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য যথেষ্ট নয়। বিশ্ব ব্যাংকের সহায়তায় বাংলাদেশ ২০২০ শীর্ষক রিপোর্ট অনুযায়ী, আগামী দু'দশকে বাংলাদেশের বিদ্যমান দারিদ্র্য উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস করতে হলে কমপক্ষে ৭-৮% বার্ষিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে হবে। রিপোর্টের বক্তব্য অনুযায়ী আমলাতান্ত্রিক অদক্ষতা ও দুর্নীতি হ্রাস, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি ও অন্যান্য অন্তরায়সমূহ দূরীকরণ করা সম্ভব হলে উল্লিখিত প্রবৃদ্ধির হার অর্জন করে দেশের দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব।

৪। **মানবসম্পদ উন্নয়ন :** মানবসম্পদ উন্নয়নে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করলেও দেশের বিদ্যমান দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য তা যথেষ্ট নয়। পোলিও এবং কুষ্ঠ (Leprosey) রোগের দূরীকরণ ও প্রত্যাশিত গড় আয়ু বৃদ্ধি পেলেও বাংলাদেশে শিশু মৃত্যুসহ মাতৃমৃত্যুর হার এখানো অনেক বেশি। মাতৃমৃত্যুর হার এখনো শ্রীলংকার চেয়ে প্রায় ৬ গুণ বেশি। তদুপরি রয়েছে এইডস ও আর্সেনিকের মতো মারাত্মক স্বাস্থ্য সমস্যা। তাছাড়া বাংলাদেশে দক্ষ জনসংখ্যার যথেষ্ট অভাব রয়েছে। শিক্ষার হার বাড়লেও শিক্ষার গুণগত মান আশাতীতভাবে কমেছে। এর সবগুলোই মানবসম্পদ উন্নয়নের পথে বিরাট অন্তরায়। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টিকে প্রাধান্য দিয়ে মানব সম্পদ উন্নয়নে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারলে দারিদ্র্য আপনা থেকেই হ্রাস পাবে।

৫। **অবকাঠামো উন্নয়ন :** অবকাঠামো বিশেষ করে গ্রামীণ অবকাঠামোর উন্নয়ন দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য অত্যাবশ্যক। গ্রামীণ অবকাঠামোর মধ্যে রয়েছে– হাট-বাজার, রাস্তা-ঘাট, কালভার্ট, পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা, পাবলিক টয়লেট, নলকূপ, ছাউনি ঘর ইত্যাদি। বিদ্যুতায়ন, কৃষির জন্য সেচ ও নিকাশ নালা, ছোটখাট বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধও এর মধ্যে পড়ে। এসব অবকাঠামোর উন্নয়ন করে গ্রামীণ এলাকায় কৃষির উন্নয়ন, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, অর্থনৈতিক ও ব্যবসায়িক কার্যক্রম বৃদ্ধি ঘটানো সক্ষম, যা পল্লী জনগণের আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে।

৬। **ভূমির সংস্কার :** বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে মানুষ ও ভূমির মধ্যকার সম্পর্ক অন্যন্ত নিবিড়। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে সীমিত জাতীয় ভূ-সম্পদের উপর চাপ ক্রমাগত বাড়ছে। প্রাকৃতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে ভূমিহীন লোকের সংখ্যার বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৮৩-৮৪ সালের কৃষি শুমারি অনুযায়ী গ্রামীণ

পরিবারের মধ্যে ১.২ মিলিয়ন পরিবারের বাড়ি ও জমি কিছুই নেই। আরো ২.৮ মিলিয়ন পরিবারের কেবল বাড়ি আছে, কোন জমি নেই এবং ৩.৮ মিলিয়ন পরিবারের একটি বাড়ি আছে কিন্তু জমির পরিমাণ অর্ধ একরের কম। বিআইডিএস কর্তৃক পরিচালিত এক জরিপের তথ্যানুযায়ী বাংলাদেশে ভূমিহীন পরিবারের সংখ্যা প্রতি বছর ২ শতাংশ হারে বাড়ছে। এসব লোক দারিদ্র্যের সর্বনিম্ন পর্যায়ে রয়েছে। এদের কোন বাড়ি নেই, আশ্রয় নেই, নেই আয়ের কোন সুনির্দিষ্ট উৎস বা বাঁচার জন্য খাদ্যের নিশ্চয়তা। এরা সাধারণত বিত্তশালী লোকের দয়ার উপর নির্ভর করে বেঁচে আছে। গ্রামের এই বিশাল সুযোগ-সুবিধা বঞ্চিত ও অবহেলিত জনগণকে রক্ষা করতে হলে ভূমির সংস্কার দরকার। ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে ভূমি মালিকানার সর্বোচ্চ সীমানা পুনঃনির্ধারণ করে অতিরিক্ত জমি উদ্ধার করে এসব ভূমিহীনদের মধ্যে বিতরণ করতে হবে। তাছাড়া সরকারের খাস জমিসহ নদী সিকস্তি থেকে প্রাপ্ত জমি, চর ইত্যাদি ভূমিহীনদের জন্য নির্ধারণ করে দিতে হবে। এভাবে ব্যবস্থা গ্রহণে সক্ষম হলে তা দারিদ্র্য দূরীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

৭। **ভূমিহীনদের পূনর্বাসন :** পল্লী বাংলায় যে বিশাল ভূমিহীন জনগোষ্ঠী রয়েছে তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। এজন্য সরকারিভাবে খাস জমি বিতরণ করা যেতে পারে। এসব জমি বাড়ি নির্মাণ ও খামারের জন্য ব্যবহার করা যাবে। সম্ভব হলে চাষাবাদের জন্য খাস জমি বিতরণসহ অন্যান্য সামাজিক সুযোগ-সুবিধা (যেমন– টিউবওয়েল স্থাপন, কমিউনিটি সেন্টার স্থাপন) এবং ঋণের ব্যবস্থাকরণ, প্রশিক্ষণ প্রদান প্রভৃতির মাধ্যমে আয় বৃদ্ধিকারী কার্যক্রম বৃদ্ধি করা যেতে পারে। ভূমিহীনরা পুনর্বাসিত হলে তাদের আয়ের ব্যবস্থা হবে এবং ধীরে ধীরে আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র্যের কবল থেকে তারা রেহাই পাবে।

৮। **গ্রামীণ উন্নয়ন :** কৃষিভিত্তিক বাংলাদেশে ৭০ শতাংশের বেশি লোক কৃষির সাথে জড়িত। কৃষি বা কৃষকের ভাগ্যের উন্নয়ন না ঘটলে সার্বিক উন্নতি সম্ভব নয়। গ্রামীণ দরিদ্ররা শহরে আসে। তাই গ্রামীণ দারিদ্র্য রোধ করা গেলে স্বাভাবিকভাবে শহরের দারিদ্র্য নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

৯। **রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা :** দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য প্রয়োজন অর্থনৈতিক উন্নয়ন। আর রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ছাড়া অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। রাষ্ট্রীয় মূলধারার রাজনীতি থেকে হরতাল, সংঘাত ও রক্তপাত রাজনীতি পরিহার করতে হবে।

১০। **আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা :** দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে গণমুখী ও দৃঢ় করার জন্য দেশ থেকে সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, ঘুষ, সস্তা রাজনীতি দূর করতে হবে এবং প্রশাসন ও অন্যান্য খাত থেকে অবৈধ লেনদেন বন্ধ করতে হবে। অন্যথায় ব্যক্তি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে না, যা দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য অত্যন্ত জরুরি।

১১। **বেসরকারি খাতের সম্প্রসারণ :** গ্রামীণ অর্থনীতিসহ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বেসরকারি খাতের ভূমিকা সম্প্রসারণ করতে হবে। সরকারি সংস্থাগুলো প্রতিবছর হাজার হাজার কোটি টাকা লোকসান দিচ্ছে যা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে অন্যতম প্রধান অন্তরায়। তাই যত তাড়াতাড়ি বেসরকারিকরণ করা যায় ততই ভালো। কল-কারখানা, বিশেষ করে কুটির শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও উৎপাদন বৃদ্ধি করার ব্যবস্থা নিতে হবে। গ্রামীণ অঞ্চলে কৃষিভিত্তিক শিল্প স্থাপনে অগ্রাধিকার দিতে হবে। এসব পদক্ষেপ গ্রামের দরিদ্র জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধিসহ উন্নত জীবনযাপনে আগ্রহী করে তুলবে, যা দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য অপরিহার্য।

১২। **চরম দরিদ্রদের জন্য বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ :** দরিদ্রের মধ্যে বসবাসকারী দুঃস্থ মানুষের জন্য বিশেষ ধরনের প্রকল্প বা কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে যাতে তারা সম্পদ সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্যে দুষ্টচক্র থেকে বের হয়ে আসতে পারে। তাদের জন্য লাভজনক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাসহ পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। তাছাড়া গ্রামের চরম দরিদ্রদের নিকট পৌঁছানোর জন্য বিশেষ নজর দিতে হবে। কেননা তারা হচ্ছে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর সবচেয়ে দুর্বল অংশ এবং এদের নিকট পৌঁছানো খুবই কঠিন।

১৩। **নারী উন্নয়ন ও নারীর দারিদ্র্য বিমোচন :** দেশের প্রায় অর্ধেক জনগোষ্ঠী নারী। তাছাড়া প্রায় শতকরা ২২ ভাগ পরিবার নারীপ্রধান এবং তাদের বেশির ভাগই আবার হতদরিদ্র। দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে নারী-পুরুষ হিসেবে বিভাজন করলে দরিদ্র নারীর পাল্লাই ভারী হবে। তাই নারীর দারিদ্র্য দূরীকরণে বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের সাথে দারিদ্র্য বিমোচন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সেজন্য নারী উন্নয়নে

প্রয়োজনীয় কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে। এ লক্ষে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা একযোগে কাজ করতে হবে।

১৪। প্রশাসনিক সংস্কার : দেশের বিদ্যমান প্রশাসন ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে এবং একে আরো বেশি গরিববান্ধব হতে হবে। জনগণের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী স্থানীয় ও জাতীয় উন্নয়নের অগ্রাধিকার পুনর্নির্ধারণ করতে হবে। অংশগ্রহণমূলক শাসন ব্যবস্থাই কেবল এ ধরনের অগ্রাধিকার পুনর্নির্ধারণে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে।

১৫। বিবিধ : দারিদ্র্য বিমোচনে অন্যান্য আরো যেসব ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে সেগুলো হলো–

(ক) ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচির প্রসার ঘটানো।
(খ) তথ্যপ্রযুক্তি প্রসার।
(গ) কৃষিভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠান গঠন।
(ঘ) গ্রাম বাংলায় 'ক্ষুদ্র শহর' তৈরি।
(ঙ) অর্থ ছাড়াও সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা সম্পদের উপর গরিবদের অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।
(চ) প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় বেসরকারিভাবে সামাজিক শক্তি বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

সারসংক্ষেপ

দারিদ্র্য বিমোচনের কোন তাৎক্ষণিক সমাধান নেই। দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষে সুপরিকল্পিত কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। দারিদ্র্য বিমোচনে রাষ্ট্র তথা সরকারকেই মুখ্য ভূমিকা পালন করতে হবে।

দারিদ্র্য বিমোচনে কৃষি উন্নয়ন, শিক্ষার প্রসার, মানবসম্পদ উন্নয়ন, অবকাঠামো উন্নয়ন, ভূমি সংস্কারসহ গ্রামীণ উন্নয়নকে গুরুত্ব দিতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

(ক) সত্য-মিথ্যা নির্ণয় : সত্য হলে 'স' মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

১। দারিদ্র্য বিমোচনে কোন ম্যাজিক সমাধান নেই।
২। দেশে দক্ষ জনসংখ্যার তেমন কোন অভাব নেই।
৩। দারিদ্র্য বিমোচনে শিক্ষার ভূমিকা নেই।
৪। দেশে ভূমিহীন লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

(খ) রচনামূলক প্রশ্ন

১। দারিদ্র্য বিমোচনের উপায় সমূহ আলোচনা করুন।
২। কিভাবে দারিদ্র্য বিমোচন করা সম্ভব তা বর্ণনা করুন।

(ক) উত্তর মালা

১। স, ২। মি, ৩। মি, ৪। স।

পাঠ-৩ : বাংলাদেশের কৃষি সমস্যা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- বাংলাদেশের কৃষি সমস্যার প্রকৃতি সম্পর্ক আলোচনা করতে পারবেন।
- বাংলাদেশের কৃষিতে বিদ্যমান সমস্যা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

বাংলাদেশের কৃষি

বাংলাদেশ একটি কৃষিপ্রধান দেশ হওয়া সত্ত্বেও আমাদের কৃষি ব্যবস্থা খুবই অনুন্নত। অনুন্নত চাষ পদ্ধতি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, সার, বীজ, মূলধনের অভাব, জনসংখ্যার অতিরিক্ত চাপ, ভূমির উর্বরতা হ্রাস ইত্যাদি বহুবিধ ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণে এদেশের একর প্রতি ফলন খুব বেশি নয়। উন্নত দেশে যেখানে গড়ে একর প্রতি ৫০ হতে ৬০ মণ ধান উৎপন্ন হয়, সেখানে বাংলাদেশে একর প্রতি গড়ে মাত্র ১৩ থেকে ১৪ মণ ধান উৎপন্ন হয়। তাই বাংলাদেশে প্রত্যেক বছর বিপুল পরিমাণ খাদ্য ঘাটতি দেখা দেয়।

বাংলাদেশে কৃষি সমস্যা

নিম্নে বাংলাদেশে কৃষির সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করা হলো–

১. **প্রকৃতি নির্ভরতা :** বাংলাদেশে কৃষির অন্যতম সমস্যা হলো এর প্রকৃতি নির্ভরতা। কারণ আমাদের দেশের সেচ ব্যবস্থা অত্যন্ত অনুন্নত বলে মৌসুমী বৃষ্টিপাতের উপর কৃষি অত্যন্ত নির্ভরশীল। সময়মত ও পরিমিত বৃষ্টিপাত হলে ফসল ভাল হয়। কিন্তু অধিকাংশ সময়ই মৌসুমী বায়ুর খামখেয়ালির জন্য বৃষ্টিপাত অনিয়মিত হয়। এজন্য বলা হয়– 'Agriculture system of Bangladesh is a gamble of the Monson'. যা কৃষিকার্যের পক্ষে বিশেষ অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

২. **প্রাচীন পদ্ধতির চাষাবাদ :** বাংলাদেশে কৃষির অনগ্রসরতার অন্যতম কারণ প্রাচীন পদ্ধতির চাষাবাদ। বিভিন্ন প্রকার অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণে এখনো আমাদের দেশে আধুনিক পদ্ধতির চাষাবাদ ব্যবস্থা চালু করা সম্ভব হয়নি। ফলে কৃষিযোগ্য প্রচুর উর্বর জমি থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশে একর প্রতি ফলন অত্যন্ত কম এবং ফসলের মান ও গুণ নিম্নমানের।

৩. **কৃষি ভূমির খণ্ড-বিখণ্ডতা ও বিচ্ছিন্নতা :** বিভিন্ন প্রকার পারিবারিক, ধর্মীয় ও সামাজিক কারণে বাংলাদেশের কৃষকদের ভূমিগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত এবং বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত। কৃষি ভূমির খণ্ড-বিখণ্ডতা ও বিচ্ছিন্নতার কারণে একদিকে যেমন আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ করা সম্ভব হয় না তেমনি কৃষকদের সময় এবং অর্থেরও যথেষ্ট অপচয় ঘটে।

৪. **পানি সেচের অভাব :** বাংলাদেশের কৃষি ব্যবস্থার অনুন্নতির অন্যতম কারণ হলো পানি সেচের অভাব। বিশেষ করে খরা বা শুষ্ক মৌসুমে বৃষ্টির পানির উপর নির্ভর করে জমি চাষাবাদ করা সব সময় সম্ভব হয়ে ওঠে না। ফলে পানি সেচের অভাবে অনেক জমির ফসল নষ্ট হয়ে যায় এবং বেশ কিছু পরিমাণ জমিতে ফসল ফলানো সম্ভব হয় না।

৫. **প্রয়োজনীয় মৌসুমী মূলধনের অভাব :** বাংলাদেশে কৃষি অনুন্নতির অন্যতম বাধা হলো মৌসুমী মূলধনের অভাব। চাষের মৌসুমে প্রয়োজনীয় মূলধনের অভাবে কৃষকেরা লাঙ্গল, গরু, বীজ, সার, কীটনাশক ওষুধ ইত্যাদি সময়মত যোগান দিতে পারে না। ফলে কৃষিকার্য বাধাপ্রাপ্ত হয়।

৬. **অশিক্ষিত ও দরিদ্র কৃষক :** বাংলাদেশের কৃষকগণ একদিকে দরিদ্র এবং অপর দিকে অশিক্ষিত। তাছাড়া তারা সহজেই নানা রকম গোঁড়ামি, কুসংস্কার আর অদৃষ্টবাদিতায় বিশ্বাস করে। তাই আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি সম্বন্ধে এরা অজ্ঞ থাকে। ফলে সরকারি প্রচেষ্টা থাকা সত্ত্বেও কৃষির আধুনিকীকরণ সম্ভব হয়ে উঠছে না।

৭. **জলাবদ্ধতা ও লবণাক্ততা :** বাংলাদেশের কৃষির উন্নতির মূলে জলাবদ্ধতা ও লবণাক্ততা অন্যতম বাধা হিসেবে কাজ করে। বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় প্রায় ২ হাজার ৪৬৪টি হাওর ও বিলে ৭ লক্ষ ২৪ হাজার একর জমি জলাবদ্ধতার কারণে অনাবাদী অবস্থায় রয়েছে। তাছাড়া বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলীয় বিস্তৃর্ণ এলাকার কৃষিযোগ্য ভূমির ফসল প্রায় প্রতি বছরই সমুদ্রের লোনা পানি ঢুকে নষ্ট করে ফেলে।

৮. **ভূমির ক্ষয় :** ভূমির ক্ষয়ের কারণে বাংলাদেশের মৃত্তিকার উপরিভাগের পলিমাটি অপসারিত হয়। ফলে ভূমি অনুর্বর ও লবণাক্ত হয়ে পড়ে। এটি একর প্রতি ফসল কম হবার অন্যতম কারণ।

৯. **কীটপতঙ্গের আক্রমণ ও ফসলের বিভিন্ন রোগ :** প্রতি বছর বাংলাদেশে ফসল ধ্বংসকারী কীটপতঙ্গ ও প্রাণীর আক্রমণে প্রচুর ফসল বিনষ্ট হয়। যেমন– লেদা পোকা, মাজরা পোকা, ইঁদুর ইত্যাদি। তাছাড়া বিভিন্ন রোগের আক্রমণে একর প্রতি ফসল কম হয়।

১০. **ভাল সার ও উন্নত বীজের অভাব :** বাংলাদেশে কৃষির উন্নতির অন্যতম বাধা হলো ভাল সার ও উন্নত বীজের অভাব। বাংলাদেশের কৃষকেরা অশিক্ষিত এবং দরিদ্র। ফলে তারা উৎকৃষ্ট সার ও বীজ যোগাড় করতে পারে না এবং এগুলোর সঠিক ব্যবহার সম্বন্ধে তাদের জ্ঞান সীমিত।

১১. **কীটনাশক ওষুধের অভাব :** ক্ষেতের ফসল বিনষ্টকারী কীটপতঙ্গকে ধ্বংস করার মত প্রয়োজনীয় কীটনাশক ওষুধ আমাদের কৃষকের চাহিদা অনুযায়ী পাওয়া যায় না। অবশ্য বাজারে কিছু কিছু কীটনাশক ওষুধ পাওয়া গেলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা ভেজাল মিশ্রিত এবং নিম্নমানের।

১২. **মৌসুমী বেকারত্ব :** বাংলাদেশের কৃষির অনুন্নতির এটিও একটি অন্যতম কারণ। কেননা বর্ষা মৌসুমে ফসল উঠিয়ে নেবার পর পরবর্তী ফসল আসা পর্যন্ত কৃষকগণ তিন মাস বেকার থাকে। ফলে পূর্বের অর্জিত আয় নিঃশেষ হয়ে যায় এবং গরিব কৃষক গরিবই থেকে যায়।

১৩. **ত্রুটিপূর্ণ বাজার ব্যবস্থা :** ত্রুটিপূর্ণ বাজার ব্যবস্থাও বাংলাদেশের কৃষি অনগ্রসরতার আর একটি অন্যতম কারণ। অনুন্নত পরিবহন ব্যবস্থা, পণ্য সংরক্ষণের অভাব, অধিক মধ্যস্বত্ব কারবারি উপস্থিতি, সংগঠিত বাজারের অভাব বিদ্যমান। ফলে কৃষকগণ ফসলের ন্যায্য মূল্য পায় না।

১৪. **কৃষি ঋণের অভাব :** আমাদের দেশের কৃষকেরা অত্যন্ত গরিব। প্রয়োজনীয় কৃষি উপকরণ ক্রয় ও কৃষি কাজ পরিচালনার জন্য যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন তা অধিকাংশ কৃষকের নেই। ফলে তাদেরকে ঋণ করতে হয়। কিন্তু পর্যাপ্ত পরিমাণ কৃষি ঋণের অভাবে কৃষকেরা তাদের চাহিদা অনুযায়ী ঋণ পায় না। কৃষি ঋণের অভাবে কৃষকেরা ভালভাবে জমি চাষাবাদ করতে পারে না।

১৫. **প্রাকৃতিক দুর্যোগ :** বাংলাদেশের কৃষির আরো একটি সমস্যা হলো বিভিন্ন প্রকার প্রাকৃতিক দুর্যোগ। যেমন– অতি বৃষ্টের জন্য বন্যা ও জলাবদ্ধতা, অনাবৃষ্টির জন্য খরা, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস, ঘূর্ণিঝড়, কালবৈশাখী ইত্যাদি। ফলে প্রায় প্রতি বছরই প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে বিভিন্ন সময়ে কোটি কোটি টাকার ফসল নষ্ট হয় এবং কৃষকগণ ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

১৬. **ভূমির মালিকানা :** বাংলাদেশে কৃষি ব্যবস্থার উন্নতির অন্যতম অন্তরায় হলো ভূমির মালিকানা। কারণ প্রকৃত কৃষকদের অধিকাংশই ভূমিহীন এবং অন্যের জমি বর্গা প্রথায় চাষ করে।

১৭. **ত্রুটিপূর্ণ ভূমি ব্যবস্থা :** বাংলাদেশের কৃষিতে ত্রুটিপূর্ণ ভূমি ব্যবস্থা বিদ্যমান। অনেক কৃষকই ভূমিহীন। অনেক বর্গাচাষির জমি নেই। অন্যদিকে ধনীরা অনেক জমির মালিক।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের কৃষিতে অসংখ্য সমস্যা বিদ্যমান। প্রাচীন পদ্ধতির চাষাবাদ, প্রকৃতি নির্ভরতা, প্রযুক্তির স্বল্প ব্যবহার, সেচের অভাব, উন্নত সার–বীজের অভাব ও এসব সমস্যা হলো অন্যতম। কৃষি সমস্যা দূর করা সম্ভব না হলে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন করা অসম্ভব।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

(ক) শূন্যস্থান পূরণ করুন

১। বাংলাদেশের কৃষিতে ত্রুটিপূর্ণ ভূমি ব্যবস্থা —।

২। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে — হয়।

৩। কৃষির অন্যতম সমস্যা প্রকৃতি —।

(খ) রচনামূলক প্রশ্ন

১। বাংলাদেশের কৃষি সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করুন।

(ক) উত্তরমালা

১। বিদ্যমান, ২। দারিদ্র্যের সৃষ্টি, ৩। নির্ভরতা।

পাঠ-৪ : কৃষির বহুমুখীকরণ ও সরকারি নীতি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- বাংলাদেশে কৃষির বহুমুখীকরণের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করতে পারবেন।
- বাংলাদেশে কৃষি বহুমুখীকরণের সরকারি নীতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

কৃষি বহুমুখীকরণ

বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। কৃষির ওপর এদেশের অর্থনীতি নির্ভরশীল। কিন্তু এদেশের কৃষিতে বহুমুখিতার ছোঁয়া লাগেনি। কৃষির বহুমুখীকরণের মাধ্যমে কৃষির দুরবস্থা কাটিয়ে ওঠা যায়। কৃষির বহুমুখীকরণ হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কৃষিক্ষেত্রে প্রাচীন চাষ পদ্ধতির পরিবর্তে আধুনিক ও উন্নত পদ্ধতি এবং উপকরণের প্রয়োগ ঘটে। বহুমুখীকরণের ফলে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ কৃষিক্ষেত্রে প্রাচীন চাষ পদ্ধতির পরিবর্তে আধুনিক তথা বৈজ্ঞানিক চাষাবাদ প্রবর্তন করাই হলো কৃষির বহুমুখীকরণ। জাতিসংঘের মতে, 'কৃষির বহুমুখীকরণ হল উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আধুনিক যন্ত্রপাতি ও উপকরণের ব্যবহার।'

কৃষি বহুমুখীকরণের গুরুত্ব অপরিসীম। কৃষিপ্রধান দেশ হয়েও খাদ্য ঘাটতির কারণে বিদেশ থেকে বাংলাদেশকে খাদ্যশস্য আমদানি করতে হয়। সুতরাং উপযুক্ত ব্যবহার করে অবিলম্বে এদেশের কৃষির ফলন বৃদ্ধি করা দরকার। কৃষি বহুমুখীকরণে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন–

(১) **অনাবাদী জমি চাষ :** বাংলাদেশের পাহাড়ি অঞ্চল ও হাওড় এলাকায় বহু জমি পতিত রয়েছে। তাছাড়া ভিটেমাটি, পুকুরের পাড়, বাড়ির আশেপাশে অনাবাদী জমিতে তরকারি, শাকসব্জি, বৃক্ষরোপণ ও ফল–মূলের চাষ করা প্রয়োজন। কেননা কোনো প্রকার জমি পতিত রাখা যাবে না। গ্রামাঞ্চলে খাস পুকুর ও হাজামজা পুকুরগুলোকে সংস্কার করে মাছের চাষ করা প্রয়োজন।

(২) **শুষ্ক মৌসুমে পানি সেচ :** উপযুক্ত জল সেচের অভাবে আমাদের দেশে প্রচুর পরিমাণ জমি অনাবাদী থাকছে। প্রকৃতির খেয়ালখুশির ওপর নির্ভর না করে গভীর নলকূপ স্থাপন, খাল-খনন, নদী সংস্কার ইত্যাদির মাধ্যমে শুষ্ক মৌসুমে পর্যাপ্ত পানি সেচের ব্যবস্থা করে জমিতে বিভিন্ন ধরনের ফসলের চাষ করতে হবে।

(৩) **বিকল্প ফসল উৎপাদন :** আমাদের দেশে প্রতি বছর একই জমিতে একই প্রকার ফসল উৎপাদনের জন্য জমির উর্বরতা হ্রাস পায়। উচ্চফলনশীল বীজ ও সার ব্যবহার করে একই জমিতে বছরে তিন-চার ধরনের ফসল ফলানো যায়।

(৪) **জলাবদ্ধ ও নিচু জমি চাষ :** জলাবদ্ধতা দূরীকরণের মাধ্যমে কৃষির বহুমুখীকরণ সম্ভব। শক্তিশালী পাম্পের সাহায্যে পানি নিষ্কাশন করে নিচু জলাবদ্ধ জমিকে চাষের আওতায় আনতে হবে।

(৫) **সমবায় খামার গঠন :** বাংলাদেশে উত্তরাধিকার আইনের ফলে কৃষিজমি বহুখণ্ডে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। জমির খণ্ডিতকরণ রোধ ও অধিক ফসল ফলানোর জন্য সমবায় চাষ পদ্ধতি প্রবর্তন করা প্রয়োজন। এতে পরিকল্পিত উপায়ে বিভিন্ন জাতের ফসল উৎপাদন করা সম্ভব হবে।

কৃষি বহুমুখীকরণের সরকারি নীতি

কৃষি বাংলাদেশের অর্থনীতির সঞ্জীবনী শক্তির আধার। আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন কৃষি উন্নয়নের ওপর নির্ভরশীল। কৃষির গুরুত্ব উপলব্ধি করে সরকার ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন। পরবর্তী পৃষ্ঠায় কৃষি বহুমুখীকরণে সরকারের কার্যক্রম উল্লেখ করা হলো :

(১) **ভূমি সংস্কার :** ভূমি সংস্কার বাংলাদেশ সরকারের কৃষি উন্নয়নের বাস্তব পদক্ষেপ। কৃষকদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি ও ভূমির উন্নয়নের জন্য সরকার ২৫ বিঘা জমির খাজনা মওকুফ করেছে। খাস জমিগুলো ভূমিহীন কৃষকদের মাঝে বিতরণের ব্যবস্থা করেছে। এ সব কারণে কৃষকদের মাঝে উৎসাহ ও উদ্দীপনা বেড়েছে।

(২) **কৃষি ব্যাংক স্থাপন :** সরকার মাঝারি ও ক্ষুদ্র কৃষকদের মাঝে ঋণ বিতরণের উদ্দেশ্যে ঋণদান কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এই কর্মসূচির আওতায় কৃষকেরা অনায়াসে সার, বীজ, কীটনাশক, সেচ সুবিধাদি গ্রহণ করে। তাছাড়া সরকার অক্ষম কৃষকদের পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত ঋণ মওকুফ করেছে।

(৩) **কৃষিপণ্য সংরক্ষণ :** সরকার কৃষিজাত পণ্য সংরক্ষণের জন্য গুদাম, সাইলো ও হিমাগার নির্মাণ করেছে।

(৪) **কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন :** সরকার কৃষি উন্নয়নের জন্য মাধ্যমিক পর্যায়ে কৃষি শিক্ষাকে পৃথক বিষয় হিসেবে চালু করেছেন। তাছাড়া কৃষি উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণের জন্য কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন করেছে।

(৫) **কৃষি উন্নয়নের ব্যয় বরাদ্দ :** সরকার কৃষির সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য কৃষি বহুমুখীকরণের লক্ষে কৃষিখাতের বাজেটে যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ রাখে। তাছাড়া সরকার কৃষি ব্যস্থার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জন্য কৃষিনীতি চালু করেছে।

(৬) **ভর্তুকী কর্মসূচি :** সরকার কৃষি উন্নয়নে ভর্তুকী চালু করেছে। ভর্তুকীর মাধ্যমে কৃষিক্ষেত্রে ফসল বৃদ্ধি সম্ভব।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ। কৃষিই এদেশের প্রাণ। কৃষিকে উপেক্ষা করে অর্থনৈতিক উন্নয়ন অসম্ভব। জাতীয় অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি হলো কৃষি। তাই কৃষি বিশেষজ্ঞদের মতে", কৃষি উন্নয়ন ব্যতীত শিল্প উন্নয়ন সম্ভব নয়। সরকার ও নাগরিকবৃন্দ একযোগে আন্তরিকতার সাথে কাজ করলে কৃষি উন্নয়নে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটবে। কৃষি বহুমুখীকরণের ক্ষেত্রে ব্যাপক ভূমি সংস্কার করা হলে কৃষি উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

(ক) রচনামূলক প্রশ্ন

১। কৃষি বহুমুখীকরণ বলতে কী বোঝেন? কৃষির বহুমুখীকরণে সরকারি নীতির ইতিবাচক প্রভাব কীভাবে পাওয়া যেতে পারে?

(খ) সত্য-মিথ্যা : সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন

১। সরকার কৃষি উন্নয়নে ভর্তুকী ব্যবস্থা চালু করেছে।

২। ২৫ বিঘা জমি থাকলে খাজনা দিতে হয়।

৩। বাংলাদেশকে খাদ্যশস্য আমদানি করতে হয়।

(খ) উত্তরমালা

১। স, ২। মি, ৩। স।

পাঠ-৫ : খাদ্যাভাব ও পুষ্টিহীনতা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- খাদ্যাভাব ও পুষ্টিহীনতা বলতে কি বুঝায় তা বর্ণনা করতে পারবেন ।
- বাংলাদেশে খাদ্যাভাব ও পুষ্টিহীনতার কারণসমূহ আলোচনা করতে পারবেন ।

দক্ষ জনশক্তি যে কোন দেশের অমূল্য সম্পদ । তবে দক্ষ জনশক্তি আপনা আপনি গড়ে ওঠে না । এর জন্য সবার আগে দরকার জনস্বাস্থ্যের মান উন্নয়ন । দুঃখজনক হলেও সত্য বাংলাদেশে জনস্বাস্থ্যের মান অত্যন্ত নিম্ন । এর প্রধান কারণ খাদ্যভাব ও পুষ্টিহীনতা । সাধারণভাবে বলা হয়ে থাকে, দেশের প্রায় অর্ধেক মানুষ খাদ্যাভাব ও পুষ্টিহীনতার শিকার । তারা তাদের প্রয়োজনীয় ক্যালরি নিয়মিত গ্রহণ করতে পারে না । দারিদ্র্য এর প্রধান কারণ হলেও একমাত্র কারণ নয় । জনসচেতনতা ও স্বাস্থ্যজ্ঞানের অভাবও খাদ্যাভাব ও পুষ্টিহীনতার কারণ ।

বাংলাদেশের মানুষের আয় কম । এজন্য সঞ্চয় কম । সঞ্চয় কম বলে বিনিয়োগ কম । আবার বিনিয়োগ কম বলে আয় কম । দারিদ্র্যের এই দুষ্টচক্রে শত শত বছর বন্দি বাংলাদেশ । ভয়াবহ দারিদ্র্যের কারণে দেশের ৪০ ভাগ মানুষ তিনবেলা ঠিকমতো খেতে পারে না । অথচ 'খাদ্য' পাঁচটি মৌলিক অধিকারের প্রধানতম অধিকার । দারিদ্র্যের সাথে যুক্ত হয়েছে উচ্চ বেকারত্ব হার ও জনসংখ্যা বৃদ্ধি । তদুপরি রাষ্ট্রের উদাসীনতাও বিদ্যমান । আর এ কারণে খাদ্য সাহায্য অনেক ক্ষেত্রেই সঠিকভাবে বণ্টন হয় না । নদী ভাঙ্গন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, চাষাবাদের জমির স্বল্পতা প্রভৃতি কারণে প্রতিনিয়ত শহরে ছুটছে ছিন্নমূল মানুষ । এদের অধিকাংশই বস্তিতে, রেল স্টেশনে, ফুটপাতে বাস করে । বাস্তুচ্যুত এই লোকদের খাদ্য নিরাপত্তা অত্যন্ত ভঙ্গুর । কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি করে বাংলাদেশ খাদ্য সমস্যা মোকাবেলার চেষ্টা করছে । তবে বাংলাদেশ এখনও খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয় । বাংলাদেশকে বছরে প্রায় ৩০ লাখ টন খাদ্যশস্য বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয় ।

পুষ্টিহীনতা জনস্বাস্থ্যের জন্য সবচে বড় হুমকি । মূলত খাদ্যাভাবের কারণেই দেশের জনগণের একটি বড় অংশ পুষ্টিহীন । পুষ্টিহীনতা সবচে বেশি দেখা যায় মা ও শিশুর ক্ষেত্রে । আবার অনেক ক্ষেত্রে খাদ্যাভাব না থাকলেও পুষ্টিহীনতা থাকতে পারে । পুষ্টিহীনতা দূর করার জন্য দরকার সুষম খাদ্যের অভ্যাস ।

খাদ্যপ্রাণ ও ভিটামিনের অভাবে পুষ্টিহীনতা ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করেছে । এ প্রেক্ষাপটেই পুষ্টিহীনতা একটি জাতীয় সমস্যায় পরিণত হয়েছে । সচেতনতার অভাবও পুষ্টিহীনতার আরেকটি বড় কারণ । ময়লা, আবর্জনা, দূষিত পরিবেশে খাদ্য গ্রহণের কারণে পেটের পীড়া, অসুখ-বিসুখ লেগেই আছে । অনেক ক্ষেত্রেই বিশুদ্ধ পানির অভাবে মানুষ ডায়রিয়া, কলেরা, আমাশয়, টাইফয়েডে আক্রান্ত হচ্ছে ।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশে খাদ্যাভাব ও পুষ্টিহীনতা ব্যাপকভাবে বিরাজমান । দারিদ্র্য ছাড়াও এর কারণ শিক্ষা ও জনসচেতনতার অভাব । প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও সরকারের উদাসীনতা খাদ্যাভাব ও পুষ্টিহীনতাকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে । কৃষির বহুমুখীকরণ ও আধুনিকীকরণের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদন বাড়িয়ে খাদ্যাভাব ও পুষ্টিহীনতার সমস্যা কার্যকরভাবে মোকাবেলা করা যায় ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

(ক) নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও।

১। বাংলাদেশের কত ভাগ মানুষ প্রয়োজনীয় খাদ্য পায় না?

(ক) ৪০ ভাগ (খ) ৫০ ভাগ

(গ) ৬০ ভাগ (ঘ) কোনটি নয়

২। কাদের খাদ্য নিরাপত্তা অত্যন্ত ভঙ্গুর?

(ক) শ্রমিকদের (খ) কৃষকদের

(গ) বাস্তুচ্যুতদের (ঘ) বস্তিবাসীদের

৩। জনস্বাস্থ্যের জন্য সবচে বড় হুমকি–

(ক) পুষ্টিহীনতা (খ) ডাক্তারদের অভাব

(গ) সরকারের উদাসীনতা (ঘ) রাজনৈতিক অস্থিরতা

৪। বাংলাদেশকে বছরে কত টন খাদ্যশস্য আমদানি করতে হয়?

(ক) এক লাখ টন (খ) ২০ লাখ টন

(গ) ২৫ লাখ টন (ঘ) ৩০ লাখ টন

(খ) রচনামূলক প্রশ্ন

১। বাংলাদেশের খাদ্যাভাব ও পুষ্টিহীনতার বিবরণ দিন।

২। বাংলাদেশে খাদ্যাভাব ও পুষ্টিহীনতার কারণসমূহ লিখুন।

(ক) উত্তরমালা

১। (ক) ২। (গ) ৩। (ক) ৪। (ঘ)

পাঠ -৬ : খাদ্যাভাব ও পুষ্টিহীনতা দূর করার উপায়

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

➡ বাংলাদেশের খাদ্যাভাব ও পুষ্টিহীনতা দূর করার উপায় বর্ণনা করতে পাবেন।

ভূমিকা

খাদ্যাভাব বর্তমানে জাতীয় সমস্যায় পরিণত হয়েছে। গত ৪০ বছরে দেশের খাদ্য উৎপাদন তিনগুণ বাড়লেও এখনও প্রায় ৩ কোটি মানুষ খাদ্য নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার সঙ্গে পুষ্টিহীনতার যোগসূত্র অত্যন্ত নিবিড়। তবে জনসচেতনতার অভাবও পুষ্টিহীনতার আরেকটি বড় কারণ।

নিম্নে খাদ্যভাব ও পুষ্টিহীনতা দূর করার উপায় বর্ণনা করা হলো–

১. **কৃষির আধুনিকীকরণ** : কৃষির আধুনিকীকরণের মাধ্যমে বেশি পরিমাণ খাদ্যশস্যের উৎপাদন করতে হবে। বাংলার মাটি অনেক উর্বর হলেও এ কথা সত্য যে ভারত, চীন বা থাইল্যাণ্ডের তুলনায় আমাদের একর প্রতি উৎপাদন অনেক কম। কৃষির আধুনিকীকরণের মাধ্যমে দেশে খাদ্য উৎপাদন বাড়াতে হবে। পর্যাপ্ত খাদ্য থাকলে ব্যক্তির ক্রয়ক্ষমতা কম থাকলেও তার পক্ষে খাদ্য কেনা সম্ভব।

২. **বিকল্প খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি :** শুধু প্রধান খাদ্যশস্য চাল, গম নয়; মৌসুমী ফল-মূল, শাক-সব্জি, তরকারি ও মাছ-মাংসের বৃদ্ধির ব্যবস্থা নিতে হবে। বিকল্প খাদ্যের মজুদ গড়ে তুলে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

৩. **খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি** : পতিত ভূমি, জলাশয়, বাড়ির পাশের আঙ্গিনা, খাল-বিল, মহাসড়কের দু'পাশ কৃষিপণ্য ও মাছের জন্য ব্যবহার করে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বাড়াতে হবে। এসব এলাকায় খাদ্যশস্যের উৎপাদন নিশ্চিত করা গেলে তা কৃষক সমাজ তথা গ্রামীণ এলাকায় খাদ্যাভাব ও পুষ্টিহীনতা দূরীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

৪. **সরকারি সহায়তা :** খাদ্যাভাব ও পুষ্টিহীনতা দূরীকরণে সরকারি সহায়তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, প্রতিবন্ধী, উদ্বাস্তু, বিধবা মহিলা, ছিন্নমূল জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা বরাবরই হুমকির মুখে থাকে। ভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে বাস্তুচ্যুত, প্রতিবন্ধী ও অতি দরিদ্রের দ্বারে যাতে সঠিক সময়ে খাদ্য পৌঁছায়ে সেদিকে সরকারের সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। একই সঙ্গে এসব কর্মসূচির সঠিক তদারকি করতে হবে।

৫. **উন্নত রেশনিং ব্যবস্থা :** উন্নত রেশনিং ব্যবস্থাসহ 'কাজের বিনিময় খাদ্য' কর্মসূচির বিস্তার করতে হবে। উন্নত রেশনিং ব্যবস্থা কেবল সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে এর আওতায় আনতে হবে।

৬. **সচেতনতা বৃদ্ধি:** খাদ্যাভাব ও পুষ্টিহীনতা দূরীকরণে জনগণকে ব্যাপকভাবে সচেতন করে তুলতে হবে। সচেতনতার অভাবও পুষ্টিহীনতার একটি বড় কারণ। ময়লা, আবর্জনা, দূষিত পরিবেশে খাদ্য গ্রহণের কারণে পেটের পীড়া, অসুখ-বিসুখ লেগেই আছে। অনেক ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ পানির অভাবে মানুষ ডায়রিয়া, কলেরা, আমাশয়, টাইফয়েডে আক্রান্ত হচ্ছে। এসব বিষয়ে জনগণকে সচেতন করে তুলতে হবে। গণমাধ্যম ও রাষ্ট্রকে এজন্য বিশেষ ভূমিকা পালন করতে হবে। শিক্ষার বিস্তারও জরুরি। মনে রাখতে হবে– শিক্ষার বিস্তার ছাড়া দক্ষ জনশক্তি গড়া সম্ভব নয়।

৭. **তৃণমূল স্বাস্থ্যসেবা** : গ্রামীণ জনগোষ্ঠী বিভিন্ন ধরনের অসুখ-বিসুখে আক্রান্ত। গ্রামে সুচিকিৎসার বড়ই অভাব। অবকাঠামো সমস্যা ছাড়াও চিকিৎসকদের শহরগামী মানসিকতা এজন্য অনেকাংশে দায়ী।

অভিযোগ রয়েছে, গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ডাক্তাররা বসতে পছন্দ করে না। সরকারকে এদিকটায় বিশেষভাবে মনোযোগ দিতে হবে। কেননা গ্রামীণ পর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা না গেলে দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য সমস্যা দূর হবে না। এজন্য তৃণমূল পর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

(ক) নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বাংলাদেশে কয় কোটি মানুষ খাদ্য ঝুঁকিতে রয়েছে-

(ক) এক কোটি (খ) দুই কোটি

(গ) তিন কোটি (ঘ) চার কোটি

২। গত ৪০ বছরে দেশের খাদ্য উৎপাদন কতগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে?

(ক) দ্বিগুণ (খ) তিন গুণ

(গ) চার গুণ (ঘ) পাঁচ গুণ

(খ) রচনামূলক প্রশ্ন

১। বাংলাদেশের খাদ্যাভাব ও পুষ্টিহীনতা দূর করার উপায়সমূহ লিখুন।

(ক) উত্তরমালা

১। (গ) ২। (খ)